বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)

বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী, মেদিনীপুরে বৌদ্ধধর্ম,
বাংলা সাহিত্যের পরিচয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন ॥
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ॥
বিন্দু পাল

ফটো তুলেছেন ॥
সুনীল জানা, ১০, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা
ট্রেড কর্নার স্টুডিও, কলিকাতা
রবি প্রামাণিক, তমলুক ও
গ্রন্থকার স্বয়ং

ছেপেছেন ॥
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই করেছেন ॥
নিউ ইণ্ডিয়া বুক বাইণ্ডিং হাউস
৬০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ॥
১৩৭১ ফাল্গুন

দাম ঃ দশ টাকা মাত্র

॥ নিবেদন ॥

তমলুক তথা তাম্রলিপ্তের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য জীবনের পুরো দশটি বছর কাটিয়েছি। দশবছর পরে আজ এই ইতিহাস লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে, কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। যেটুকু সংগ্রহ করেছি তা' বিরাট গৌরবদীপ্ত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের পক্ষে নগণ্য। তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথি-পত্রে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ বর্ণনা পাই, সে তুলনায় তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হয়েছে। তমলুকই সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর এ সত্য সর্ববাদিসম্মত হলেও তবু মনে প্রশ্ন জাগে আজকের ছোট তমলুক সহরটুকুই কি সেই প্রাচীন বিরাট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত ?

এই পুস্তকে যে সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাচাই করে তবেই স্থান দেওয়া হয়েছে, তাই বলে কোন লোককথা, প্রবাদ বা কিংবদন্তীকে অবহেলা করা হয়নি। ভাবাবেশ বা উচ্ছ্বাস যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছি। তমলুকের রাজবংশ সম্পর্কে নতুনভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিভিন্ন রূপে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে তবেই লিখেছি। জিষ্ণুহরির মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, আই-সিং, দাঁতন প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে বহুদিন ধরে অনুসন্ধান করে তবেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে সাহসী হয়েছি। বিরুলিয়ার জানা বংশের কোর্ষিনামায় অনেক নতুন তথ্যের ইঙ্গিত আছে, সেইসব তথ্য যাচাই করে দেখা ও বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আবিষ্কার অমূল্য সন্দেহ নাই, তবে এ সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলী আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে ভাল হয়। দাশগুপ্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র ও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত বস্তুর ক্রমিক সংখ্যা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, বিভিন্ন কারণে তা দেওয়া সম্ভব হলো না।

তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক মাননীয় রামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য করেছেন। বস্তুত এঁর উৎসাহ না পেলে এবং কলিকাতা পুস্তকালয়ের কর্ণধার মাননীয় শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অকাতরে অর্থব্যয় না করলে এত শীঘ্র এরূপ একটি ব্যয়বহুল পুস্তক প্রকাশ কোন মতেই সম্ভব হোত না। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহ আমায় অনেক প্রেরণা যোগিয়েছে। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানা পুঁথির আলোক-চিত্রগুলি বিনামুল্যে তুলে দিয়েছেন। তাঁকে আমার অন্তরের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি। উড়িষ্যাযাত্রী অজিত ও চিত্ত ভাই-এর নাম বহুদিন মনে থাকবে।

আমার নিজের সংগ্রহ থেকেই অধিকাংশ পুরাবস্তুর আলোকচিত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হোল। অন্য দু'একজনের সংগৃহীত যে দু'একটি আলোকচিত্র এতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা সংগ্রাহকদের অনুমতি নিয়ে তবেই প্রকাশ করা হোল।

চেষ্টা করেছিলাম অনেক কিন্তু তবুও এই পুস্তককে নির্ভুলভাবে ছাপা গেল না। মারাত্মক ভুল না হলেও কতকগুলি বানান ভুল থেকে গেল। এজন্য আমরা সত্যি দুঃখিত ও লজ্জিত। সহৃদয় সুধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক সম্পর্কে যদি কিছু উপদেশ, মতামত, তথ্য আমায় জানান এবং যে সব ভুল তাঁদের চোখে পড়বে তা জ্ঞাত করান, তা'হলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁদের সে ঋণের কথা স্বীকার করব।

দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক কথাপ্রসংগে বলেছিলেন—"তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনি কিন্তু এ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য পুস্তক নাই, যদি আপনি লিখেন, তা'হলে দেশ অনেক উপকৃত হবে।" মাননীয় বিবেকানন্দ বাবুর একথা সত্য হলেও আমি যে দেশবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছি একথা মনে হয় না, তবে পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক যদি এইসব মাল-মসলা নিয়ে ও আরো অনুসন্ধান করে বই লিখেন, তা'হলে একদিন তাম্রলিপ্তের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়ত সম্ভব হতে পারে।

বরগোদা পোঃ—শ্রীরামপুর
ভায়া—ময়না, মেদিনীপুর
ফাল্গুন, ১৩৭১

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)

বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস প্রণয়ণে যে সব পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি

১। মহাভারতম্ (মূল ও অনুবাদ) ২। ভারতকোষ ৩। ত্রিকাণ্ড-শেষঃ ৪। অভিধান চিন্তামণি ৫। শব্দরত্নাবলী ৬। শব্দকল্পদ্রুমঃ ৭। ভবিষ্যপুরাণ ৮। বাচস্পত্য ৯। প্রকৃতিবাদ অভিধান ১০। শব্দার্থ প্রকাশিকা ১১। বিষ্ণুপুরাণ ১২। পাণ্ডববিজয় ১৩। বায়ুপুরাণ ১৪। জন্মভূমি ১৫। বিশ্বকোষ ১৭। দ্বিগ্বিজয় প্রকাশঃ ১৮। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১৯। ·জৈমিনি ভারত ২০। তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ ২২। আর্যদর্শন ২৩। বৃহৎ সংহিতা ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত ২৫। খিল হরিবংশ ২৬। পদ্মপুরাণ ২৭। ব্রহ্মপুরাণ ২৮। রহস্য-সন্দর্ভ ২৯। মৎস্য পুরাণ ৩০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩১। সিদ্ধজামল তন্ত্র ৩২। প্রাণতোষিণী তন্ত্র ৩৩। রঘুবংশ ৩৪। বঙ্গদর্শন ৩৫। ভারতী ৩৬। মহাবংশ ৩৭। দাতবংশ ৩৮। জ্ঞানাঙ্কুর ৩৯। শ্রীদারুব্রহ্ম ৪০। দশকুমারচরিত ৪১। কথা-সরিৎ-সাগর ৪২। মনুসংহিতা ৪৩। পরশুরাম সংহিতা ৪৪। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪৫। এডুকেশন গেজেট ৪৬। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৪৭। সময় ৪৮। রামায়ণ ৪৯। তমোলুক পত্রিকা ৫০। নব্য ভারত ৫১। চৈতন্যমঙ্গল ৫২। সম্বন্ধনির্ণয় ৫৩। বান্ধব ৫৪। মেদিনীপুর ইতিহাস ৫৫। তমোলুক ইতিহাস —ত্রৈলক্য রক্ষিত ৫৬। তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী ৫৭। মাতঙ্গিনী হাজরা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ ৫৮। শহীদ যুগল—নগেন গুহরায় ৫৯। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ৬০। বঙ্গীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ-পরিচয়—সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী ৬১। ভ্রান্তিবিজয়—হরীশ চক্রবর্তী ৬২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন ৬৩। ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৬৬। বাংলার ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৬৫। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ৬৬। বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী—'মালীবুড়ো' ৬৭। বঙ্গ-প্রসংগ—সুশীল রায় সম্পাদিত ৬৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ বসু ৬৯। শ্রীকৃষ্ণচরিত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭০। রাঢ়-বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ৭১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিল রায় ৭২। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র ৭৩। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৭৪। বাংলা বাঙ্গালীর ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার ৭৫। বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ৭৬। মেদিনীপুর কাহিনী —প্রবোধ ভৌমিক ৭৭। বিপ্লবী মেদিনীপুর—সু-মো-দে ৭৮। হিজলীর

মস্‌নদী-ই-আলা—মহেন্দ্র করণ ৭৯। সত্যার্থ প্রকাশ—দয়ানন্দ সরস্বতী ৮০। আই-সিং—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৮১। বঙ্গ-সাহিত্যে মেদিনীপুর —যোগেশচন্দ্র বসু ৮২। বৃহৎ বঙ্গ—ডাঃ দীনেশ সেন ৮৩। জ্ঞান ভারতী—প্রভাত মুখোঃ ৮৪। প্রবাসী, ১৩৩৮ ৮৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৩৮ ৮৬। মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা, ১৩৬৩ ৮৭। বাংলা সাহিত্যের কথা—সুকুমার সেন ৮৮। সাহিত্য, ১৩০৪ ৮৯। প্রলাপ, ১৯৬০, ৯০। মেদিনীপুর পত্রিকা, ১৩৬২, ৯১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭০, ৯২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—যোগেন্দ্রনাথ বসু ৯৩। তমলুক মঙ্গল—গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ৯৪। কালিদাস গ্রন্থাবলী —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৯৫। যুগান্তর, ১৩৬০, ৯৬। ভারতবর্ষ, ১৩৬৩, ৯৭। হিমাদ্রী ও নীহার, ১৩৬২, ৯৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২, ৯৯। বিক্ষনী ১০০। দেশ, ১৩৬১, ১০১। কবি-দীপিকা—সত্যেন জানা ১০২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

ইংরেজী পুস্তক সমূহ ঃ—103. Ancient India as described, by Megasthenes and Arrin, J. W. Mc. crindle. 104. Si-yu-ki. by Samuel Beal. 105. Hunter's Orissa 106 H. H. Wilson's Sanskrit and English Dietionary 107, Indian Antiquities 108. Ancient India as desbribed by Ptolemy by J. W. Mc crindle 109. Asiatic Researches 110. R. C, Dutt's History of civilization in Ancient India 111. Imperial Gazetteer of India. 112. Journal of the Royal Asiatic Society 113. Cuuningham's Ancient Geography of India 114. Documents Geographiques 115. Julien's Hiouen Thsang 116. East India Gazetteer 117. A Statistical Account of Bengal 118. A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal 119. Muir's Sanskrit texts 120. Elphinstone's History of India 121. Hunter's Brief History of the Indian People 122. Geographical Dictionary of ancient and Meidiaeval India by Nanda Lal Dey 123. Proceedings of Asiatic Society of Bengal 124. Moakerjee's Magazine 125. Pilgrimage of Fa-Hian 126. Marshman's History of Bengal 127. R C. Dutt's Rambles in India 128. Report on the census of the District of Midnapur. 129. A Short Geography of Bengal by W. H. Arden Wood 130. Cunningham's Archædogical Survey of India 131. Ain-i-Akbari 132. J. C. Price's History of Midnapore 133. Sratesman. ১৩৪। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহার রায় ১৩৫। বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম —ডাঃ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ১৩৬। নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত—অধর ঘটক।

এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহের জন্য যে সব জায়গায় গিয়েছি

১। বালেশ্বর (উড়িষ্যা) ২। দাঁতন ৩। মেদিনীপুর ৪। ঘাটাল ৫। শান্তিপুর বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ (নদীয়া) ৬। গড়বেতা ৭। বিষ্ণুপুর ৮। ঝাড়গ্রাম ৯। বহিচাড় ১০। বিরুলিয়া ১১। মহিষাদল ১২। রঘুনাথ বাড়ী ১৩। সুন্দরনগর ১৪। চাঁচিয়াড়া ১৫। ডিমারীহাট ১৬। নন্দকুমার ১৭। খঞ্চি ১৮। কল্যাণচক ১৯। গুমাই ২০। ময়নাগড় ২১। তিলদা ২২। হাওড়া ২৫। ক্ষেপুত ২৪। মামুদপুর ২৫। পাঁশকুড়া ২৬। নন্দপুর ২৭। কাঁথি ২৮। কলিকাতা ২৯। সুতাহাটা ৩০। খয়রা-কানাইচক ৩১। বৈষ্ণবচক ৩২। দেউলিয়া ৩৩। নারান্দা (পট্টগ্রাম) ৩৪। কেলোমাল ৩৫। শালিকা ৩৬। সিঙ্গি (বর্ধমান) ৩৭। মোহনপুর দাঁতুনিয়া ৩৮। বাঁকাকুল ৩৯। অষ্টবাটিকা ৪০। পাকুড়িয়া ৪১। তমলুক অঞ্চল।

ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা বই, তথ্য ও উৎসাহাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

১। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগারিক, তমলুক ২। কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানা, তমলুক ৩। বিধুভূষণ জানা, বিরুলিয়া ৪। সুব্রতকুমার রায়, তমলুক ৫। হরেকৃষ্ণ পট্টনায়ক, পাঁশকুড়া ৬। পণ্ডিত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য, মহিষাদল ৭। অধ্যাপক নিরঞ্জনকুমার মিশ্র, মহিষাদল ৮। চন্দ্রমোহন রাজ, পিঁয়াজবেড়্যা ৯। চণ্ডীচরণ সামন্ত, ডিমারীহাট ১০। বিল্বপদ জানা, সম্পাদক শহীদ পাঠাগার, সুতাহাটা ১১। দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, আটবেড়িয়া ১২। মদনমোহন অধিকারী, পাকুড়িয়া ১৩। প্রবোধকুমার নায়ক, উকিল, তমলুক ১৪। পণ্ডিত অক্ষয়কুমার কয়াল, বড়ুল, ২৪ পরগণা ১৫। মণীন্দ্রনাথ মাইতি. বি-এ, ওসমানপুর ১৬। অজিতকুমার ব্যানার্জী ও চিত্তরঞ্জন রায় (রাইমণি কেল্লার সহযাত্রী), দাঁতন ১৭। রামেন্দুশেখর দাস, আসনান ১৮। অধ্যাপক নিশিকান্ত ভৌমিক, তমলুক ১৯। গণেশ দাস, বি-কম, কাঁথি ২৭। বিভূতিভূষণ জানা, তমলুক ২১। দাঁতন পাবলিক লাইব্রেরী ২২। বিভূতিভূষণ সী, বি-এস-সি ২৩। সুধীরকুমার মল্লিক, এম-এ, বি-টি ২৪। রাধিকারঞ্জন দাস মহাপাত্র, বালেশ্বর ২৫। তৃপ্তিরাণী মাইতি, ওসমানপুর ২৬। নিরদবরণ পাণিগ্রাহী ও চণ্ডীচরণ পাণিগ্রাহী, দাঁতন ২৭। পণ্ডিত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, সম্পাদক, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর।

॥ সূচীপত্র ॥

কূর্মমূর্তি ও বিষ্ণুপদ

ব্যাখ্যান বুদ্ধ

একটি মূর্তি (ময়না)
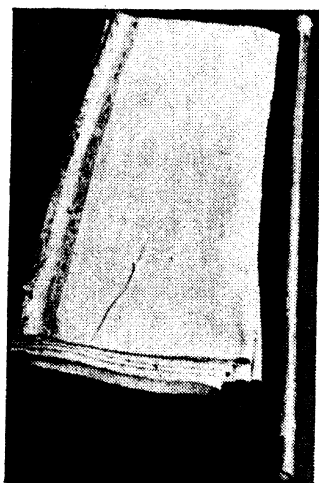
বিদ্যাসাগরের উড়ানি ও লাঠি

জিষ্ণুহরির মন্দির

জৈনমূর্তি (দাঁতন)

বৃহত্তর

তাম্রলিপ্তের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

অবস্থান ও সীমা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সদর সহর তমলুক। এই তমলুকই প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত। বর্তমান তমলুক মেদিনীপুর জেলার পূর্ব রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে চেপে তমলুকে আসতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। মেচেদা স্টেশনে নেমে তমলুক সোজা বাসে বা ট্যাক্সিতে চড়ে আসা যায়। ভাড়া লাগে মাত্র ১.৭৮ ন.প.। এর অক্ষাংশ ২২°১৭'৫০" উত্তর, এবং দ্রাঘিমাংশ ৭৮°৫৭'৩০" পূর্ব।[১]

বর্তমান কালের তমলুকই যে প্রাচীন কালের বিশ্ববিশ্রুত তাম্রলিপ্ত এবার আমরা সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হবো।। মোগল শাসনের পূর্বে বাংলা বলে কোন রাজ্য ছিল না। অখণ্ড বাংলা ছিল তখন কয়েকটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য। এই সকল স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে তাম্রলিপ্তও একটি।

'মহাভারতে মগধ, মেদোগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ ও ওড্র প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়, এখনকার বাংলা দেশ তৎসমুদয় রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্রাটগণের

১ Vide Statistical Account of Bengal, Vol. II, P. 29.

শাসনকালেও বাংলা দেশের পাঁচটি প্রধান হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—তাম্রলিপ্ত রাজ্য তাহার অন্যতম'।[১]

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে তাম্রলিপ্ত[২], তাম্রলিপ্তী[৩], বেলাকূলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা[৪], দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং,[৫], তমোলিপ্ত[৬] ও তমোলিপ্তী[৭] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাম্রলিপ্তের আরো কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই বন্দরের নাম তমোলিতি[৮] ও তম্মোলিতি[৯] বলেও উল্লেখ আছে। তবে তম্মোলিতি শব্দটি পালি সংস্কৃতের তাম্রলিপ্ত কথার হীনপরিণতি বলে মনে হয়। মুসোঁ জুলিয়েন সাহেব ও জেনারেল কানিংহাম এই যুক্তির পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন।[১০]

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত ছিল কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত। রামায়ণের যুগে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।[১১] সুদূর অতীত কালে অঙ্গদেশ থেকে চারজন ঔপনিবেশিক যথাক্রমে পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ) সুহ্ম[১২] (তাম্রলিপ্ত ও রাঢ়) বঙ্গ (পূর্ব বাংলা) এবং কলিঙ্গ

১ তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী। পৃঃ ২।

২ মহাভারতম ৩ ভারতকোষ ৪ ত্রিকাণ্ডশেষঃ ৫ হেমচন্দ্রঃ ৬ শব্দরত্নাবলী ৭ শব্দকল্পদ্রুমঃ।

৮ "In the writings of the Puddhists of Ceylon the name appears as 'Tamolitti,' corresponding to the Tamluk of the present day."

See—"Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" by J. W. Mc. Crindle, M. A., P. 138.

৯ Vide Si-Yu-Ki, by Samuel Beal, Vol. II, P, 200.

১০ Vide Hunter's Orissa, Vol. I. P. 311.

১১ Indian Antiquary Vol. XIII. P. 363.

১২ "অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী"—দশকুমারচরিত। এখানে তাম্রলিপ্তের অন্য নাম দামলিপ্তী বলে অভিহিত হয়েছে।

(উড়িষ্যা) দেশে যেয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই অতীত যুগে বঙ্গদেশবাসিগণ তা'হলে "কলিঙ্গ" নামে অভিহিত ছিলেন। বর্তমান কালের মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম তখন ছিল কলিঙ্গের অন্তর্গত।

এখন বিচার্য হচ্ছে এই তাম্রলিপ্ত পুরাকালে কোথায় অবস্থিত ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের ৬৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

অর্থঃ—"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।"

এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্ত ছিল রূপনারায়ণ নদের তীরে। কিন্তু এই বিশাল নদের তীরে বললেই ত আর আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানতে হবে বর্তমান তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত কিনা। ভবিষ্য-পুরাণ—ব্রাহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্ত-প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে॥ ৯॥"

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বর্গভীমা দেবী তাম্রলিপ্তে বিরাজ করেন। সে তাম্রলিপ্ত গোবিন্দপুরের শেষ সীমায় সুরধনীর তীরে। বর্গভীমা দেবী রূপ-নারায়ণ নদীর ধারে তমলুক ছাড়া আর অন্য কোথাও আছে বলে আজো জানা যায়নি। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বর্তমানের তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাটনা কলেজের তৎকালিন অধ্যক্ষ জে. ডব্‌লিউ. মাক্রিণ্ডেল সাহেবের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে "তাম্রলিপ্ত" বা তমোলুক বলে লেখা আছে। এ ছাড়া এচ্. এচ্. উইলসন সাহেব, জেনারেল কানিংহাম

সাহেব, মাননীয় এম. এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব, ডাক্তার ডব্‌লিউ. ডবলিউ. হন্টার সাহেব, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই বলেছেন বর্তমানের তমলুকই প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত।

"Tamalities, moreover, which has been satisfactorily identified with Tamluk."[১] এবং "Tamalities represents the Sanskrit Tamralipti, the modern Tamluk."[২]

॥ সীমা ॥

তাম্রলিপ্ত বন্দর যে পুরাকালে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ভৌগোলিক বিবরণ বলতে যা বুঝায় তখন সেরকম কোন গ্রন্থ লিখিত হয়নি। তবে বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে যতদূর জানা যায় তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

"মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও খুলনার দক্ষিণার্ধ সুন্দরবন —অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রায় পশ্চিম সীমাস্থিত সুবর্ণরেখার মুখ হইতে সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সমগ্র দেশ এবং সমগ্র বঙ্গোপসাগর তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।"[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের[৪] রাজার প্রিয় কবি রামচন্দ্র 'পাণ্ডব দিগ্বিজয়' নামে একটি সংস্কৃত ভৌগোলিক

১ Vide Indian Antiquities, Vol. XIII, P. 364.

২ Vide, Ancient India as described by P'tolemy' by J. W. Mc. Crindle, P. 169.

৩ তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী পৃঃ ৮।

৪ ব্লকম্যান সাহেবের মতে শেখরভূমির বর্তমান নাম শেরগড়— "Sikharbhum or Sergarh, the mahall to which Raniganj belongs" Blochmann's contributions to the Geography and History of Bengal, P. 16.

সাওতাল পরগণার অন্তর্গত পচেট্ রাজ্য পঞ্চকোটের অপভ্রংশ।

গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং বিক্রমবিজ্জলের "বিক্রমসাগর" নামক দেশ-বিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রবর্ধিত সংস্করণ।[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই "দেশাবলী বিবৃতি" উদ্ধার করেন। এই পুস্তকে লিখিত আছে—"তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে 'তমলুক' বলিত। তদনুসারে বেহালা, বঁড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত ছিল।"[২]

এ ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থ অংশে লিখিত আছে—

—তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি॥ ১৮

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।[৩]

বায়ু পুরাণেও লিখিত আছে—

"ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ।

এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্॥ ৪৯

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।[৪]

পূর্বে গঙ্গা নদী তমলুকের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হোত। 'জন্মভূমি' প্রথম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভাগীরথী-স্রোতঃ হুগলী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত, পূর্ব্বে কিন্তু এই মহাকায় স্রোতস্বতী সপ্তগ্রামপদ বিধৌত করিয়া আদমপুর, আমতা, আন্দুল এবং তমোলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ কল্লোলে বহমানা ছিল।"

১ বিদ্যাপতি ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক, তৎপরে বিক্রমবিজ্জল; জগমোহন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, ৫৩৯ পৃঃ।

২ বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশ সেন, পৃঃ ১০২৯।

৩ বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৪ বায়ুপুরাণম্, Published by the Asiatic Society of Bengal. Edited by Rajendra Lal Mitra L L. D, C. I. E., Vol. I, P. 362.

জেনারেল কানিংহাম সাহেব-এর বিবরণ থেকে জানা যায়—

"Tamralipti—country lying to the Westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north."

তাম্রলিপ্তা—হুগলী নদীর পশ্চিম দিকে এবং উত্তরে বর্ধমান ও কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন—তমলুক রাজ্য পূর্বে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং সমুদ্রও তৎকালে তমলুকের নিকটবর্তী ছিল। এখন সমুদ্র তমলুক হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়াছে। অতএব তমলুকের পশ্চিমস্থ ময়নাগড়ের রাজগণের পুরাতন রাজ্যাংশ —সবঙ্গদেশ বা সবং পরগণা—বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট করিতে হইলে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মাতলা সহর পর্যন্ত সীমা ধরিতে হয়।"[১]

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বাংলা দেশের পূর্বতন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের একতম "সমগ্র দক্ষিণ-বাঙ্গলা-ব্যাপী" বলে নির্দেশ করেছেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে যখন ভারত পরিভ্রমণ করতে আসেন, তখন তাঁর বিবরণীতে তাম্রলিপ্তের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"এই রাজ্যের পরিধি ১৪০০ 'লি' (২৮০ মাইল) এবং উহার রাজধানী ১০ 'লি'র (দুই ক্রোশ) অধিক বিস্তৃত।"—মেদিনীপুরের ইতিহাস।

এইসব থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্তের একদিকে ছিল কলিঙ্গ দেশ। উত্তরে—বর্ধমান ও কালনা, দক্ষিণে—সমুদ্র ও পশ্চিম-দক্ষিণে—

১ Vide General Cunningham's Ancient Geography of India P. 504.

২ তমলুকের ইতিহাস- সেবানন্দ ভারতী, পৃঃ ১০।

কলিঙ্গরাজ্য, পূর্বে—গঙ্গা। ফলতঃ তাৎকালিক 'ইহার পরিধি প্রায় ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ ছিল।'[১]

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। গয়া-জেলাস্থিত কোলাহল পর্বতের সম্মুখস্থ সরোবরের উত্তর-পশ্চিম গহ্বরের শিলালিপি পাঠ করলে মনে হয় এককালে তথায়ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

এতক্ষণ আমরা তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলাম, প্রায় তার সবগুলোই প্রাচীন পুঁথি-পত্তর ও বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অভিমত থেকে। তবুও মনে জাগে সংশয়। এই তমলুকই কি সেই তাম্রলিপ্ত? প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না পেলে যেন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না তমলুকের প্রাচীনতাকে।

কিন্তু এই সংশয়ও আজ বিদূরিত হয়েছে। সম্প্রতি এমন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দেখিয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলা যায়, এই তমলুকই সেই সুপ্রাচীন কালের বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্র কর্তৃক তমলুকে অনুষ্ঠিত খনন কার্যের ফলে একটি লিপি খোদাই করা মৃৎপাত্রের অংশ পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, এই লিপিটির এতদিন পর্যন্ত কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি, অন্তত এই লিপির কোন পাঠোদ্ধার প্রকাশিত হয় নি। সাধারণ ভাবে পণ্ডিতরা এই লিপি দেখে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী লিপি। লিপির একটি আলোকচিত্র ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বার্ষিক বিবরণীতে ছাপা হয়।

১ "The Kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference."

See—Documents Geographiques, P. 450, and Julien's "Hiauen Thsang," Vol. III, P. 83.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর অধ্যাপক পরেশ দাশগুপ্ত (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান অধিকর্তা) উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেন। খরোষ্ঠী লিপিতে ঐ মৃৎপাত্রে লেখা ছিল—তমুলিপ্তস্। অর্থাৎ তাম্রলিপ্তের নীচে একটি অস্পষ্ট স্বাক্ষর। হয়ত বা সেকালের কোন মৃৎশিল্পীর।

আজকাল যেমন কোন জিনিসের নীচে থাকে প্রস্তুতকারী দেশের নাম। যেমন "মেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া, মেড্ ইন গ্রেটবৃটেন, 'মেড্ ইন ইউ. এস. এ." ইত্যাদি। তেমনি হয়ত বা কোন মৃৎশিল্পী লিখেছিল তমুলিপ্তস্ বা তাম্রলিপ্তের। 'তমুলিপ্তস্' শব্দটি খুব সম্ভবত পালি বা প্রাকৃতের ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ। আজকের তমলুককে আর তাম্রলিপ্ত বলে চেনা যায় না। একদা এই নগরী ছিল বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান।

নব্য প্রস্তর যুগ থেকে এখানে সভ্যতার উজ্জ্বল প্রসার। আর তখন তাম্রলিপ্ত ছিল পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ। শক, যবন, গ্রীকদের সঙ্গে ছিল এই নগরীর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এবং আজ তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করেছে ঐ মৃৎশিল্পের নিদর্শন।

প্রায় চার বছর আগে ঐ লিপিটির এনলার্জ করা ফটোটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের হস্তগত হয়। অধ্যাপক পরেশ দাশগুপ্ত লিপিটি পুনরায় পরীক্ষা করেন। হ্যাঁ, ঐ লিপিটির অর্থ—'তাম্রলিপ্তের', এ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না। অধ্যাপক দাশগুপ্তকে সমর্থন করলেন পণ্ডিত সরসীকুমার সরস্বতী। অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে এই নিদর্শনটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিককার। ইতিপুর্বে খরোষ্ঠী লিপি ভারতের পূর্বদিকে এক মথুরা পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। বড়জোর বিহারের কুমরাজারে (পাটনার কাছাকাছি) একটি মন্দিরের চিত্রযুক্ত ফলকে

খরোষ্ঠী লিপিযুক্ত মৃৎপাত্র ও শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। চন্দ্রকেতু-গড়ে প্রাপ্ত শীলমোহরের একটিতে লেখা ধনমিত্রেণ (ধনমিত্র সম্ভবত কোন মিত্র উপাধিধারী রাজা) এটি সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের পূর্বেকার। এ ছাড়া পাওয়া গিয়েছে কুশান আমলের লোনভিস, দ্রোণভিস্ নামাঙ্কিত নিদর্শন। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, বাংলাদেশে যে একাধিক খরোষ্ঠী লিপি (প্রাচীন পারসিক লিপি থেকে উদ্ভূত এই লিপি, ডানদিক থেকে বামদিকে লেখার রীতি) আবিষ্কৃত হচ্ছে তাতে ভাষাতত্ত্ববিদদের চিন্তা করতে হবে যে, বাংলা হরফের সৃষ্টিতে এর দান কতটুকু। এ পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে যে মৌর্য ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় হরফের সৃষ্টি।

(প্রলাপ, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৮ই জুন ১৯৬০।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামোৎপত্তির বিবরণ

তাম্রলিপ্ত নগরের জন্ম কতকাল পূর্বে হয়েছিল, তা নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। মহাভারতের যুগ থেকে তাম্রলিপ্ত নগরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পরে তাম্রলিপ্তের নিকটে কয়েকটি ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই ব-দ্বীপগুলি ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয়ে যথাক্রমে মহিষাদল, গুমগড়, দোরো, কেওড়ামাল ও হিজলী প্রভৃতি পরগণার সৃষ্টি করেছিল।[১]

হাজার হাজার বছর পূর্বে তাম্রলিপ্তও খুব সম্ভবত একটি দ্বীপ-রূপে বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছিল।[২] তারপর মূল ভূখণ্ডের সাথে কালক্রমে মিলিত হয়েছে। সেই সুপ্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটেই গঙ্গাসাগর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ গঙ্গা এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলেই নির্দিষ্ট হয়েছিল সাগর তীর্থ। এখন বহুদূরে সাগর দ্বীপে বসে এই সুপ্রাচীন তীর্থমেলা।

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk."[৩]

"গঙ্গাসাগরসঙ্গোমোপকূলে স্থিত তাম্রলিপ্ত নামের সহিত বর্তমান তমোলুক নামের বিশেষরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায়, তাহা একই স্থান বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।"[৪]

---

১ মহিষাদলের ইতিহাস—ভগবতী চরণ প্রধান।

২ Vide Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. V. P. 135.

৩ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত, পৃঃ ৮।

৪ ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায়, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরবর্তী, ও একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল, ইহার দক্ষিণে ও বামে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপপুঞ্জ বর্তমান ছিল। হিজলীর মসনদ-ই-আলা, পৃঃ ২৯।

তবে এই স্থানের নাম কেন তাম্রলিপ্ত হয়েছিল, নিশ্চয় করে তা' কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে কয়েকটি উপাখ্যান শোনা যায়। তারই উপরে ভিত্তি করে এর নামোৎপত্তির কারণ নির্দেশ করার প্রয়াস পাব।

'দ্বিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বৃন্দাবনে বাসুদেব যখন করছিলেন রাসলীলা তখন স্তম্ভন হয়েছিল চন্দ্র-সূর্যের তাঁরি ইচ্ছায়। পরে সূর্যদেব বললেন, ভারতে আমি প্রকাশিত হবো। অর্থাৎ সৃষ্টি করব দিন। তুমি শীঘ্র এসো উদয়াচলে। তখন রশ্মিজাল নিয়ে উত্থিত হলেন সারথি। তাতে পতিত হোল জ্যোৎস্না। (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হয়ে সমুদ্রপ্রান্তে হোলেন লিপ্ত। যে-স্থানে লিপ্ত হয়েছিলেন সূর্যদেব, সে-স্থানই তাম্রলিপ্ত নামে হলো কীর্তিত।[১]

এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাকালে "দামল" নামে এক জাতির লোক বাস করত তাম্রলিপ্তে। এই দামল জাতির নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয় তাম্রলিপ্ত। আর এই দামল জাতিই দক্ষিণ ভারতে সৃষ্টি করেন তামিল দেশ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরাই তামিল

১ "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতো হি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ॥ ৫৬
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ববাসিনঃ॥ ৫৭"
দ্বিগ্বিজয়প্রকাশঃ।

অর্থ—"যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃষ্ঠা

দেশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃহৎ বঙ্গে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এ মত সমর্থন করেছেন। পৃঃ ১১০০।

খুব সম্ভবত তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ বা পালিভাষার তামলিট্টি (তাম্রলিপ্তি) শব্দ থেকেই 'তামিল' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পণ্ডিত কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁর "The Tamils Eighteen Hundred Years Ago" নামক পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য তা' এস্থানে উদ্ধৃত করছি—"Most of these Mongolian tribes emigrated to Southern India from Tamalitti,[১] the great emporium of trade at the mouth of the Ganges, and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the more ancient inhabitants of the Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras, as inhabitants of Bengal and adjoining seacoasts in the Vayu and Vishnu Puranas."

উক্ত পুস্তকের উপসংহারে ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—They were known as Tamils, most probably because they had emigrated from Tamilitti (Tamralipti) the great Sea-Port at the mouth of the Ganges.[২]

১ The Pali form of Sanskrit Tamralipti. It is now known as Tamluk, and lies on a bay of the Rupnarayan river 12 miles above its junction with the Hughly Mouth of the Ganges, Mc. Crindle's Ptolemy : 170

২ The Modern Tamluk on the Rupnarayan Branch of the Hoogly, 35 miles South-West of Calcutta. The Tamilittis or Tamraliptas are also mentioned as a separate nation inhabiting Lower Bengal in the Matsya, and Vishnu, and other Purans.

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) প্রতিভা।' পত্রিকায় শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গলা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সঙ্গে তামিল ভাষার সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রাচীনকালে তাম্র-লিপ্তবাসীগণই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তামিল দেশের। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

"কনকসভৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গলায় তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্তি এবং পালিভাষায় তামলিট্টি নামে বিদিত ছিল। তামিল শব্দ উক্ত তামলিট্টি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে তাম্রলিপ্‌টি হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গলা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাঁড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুঁড়ি প্রভৃতি তৎসমুদয়ের অবশেষ।"

ইহা ছাড়া আবার কেহ কেহ বলেন তমোলিপ্ত অর্থে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত (তমঃ darkness or sin and লিপ্ত soiled) এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এই নামকরণ কারা করেছেন আজ পর্যন্ত তা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। সম্ভবতঃ "যখন তাম্রলিপ্তি হিন্দুদিগের হস্ত বিচ্যুত হইয়া বৌদ্ধদিগের আয়ত্তাধীনে আসে, সেই সময়ে হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তি শব্দকে বিকৃত করিয়া ঘৃণাসূচক নাম 'তমোলিপ্তে' পরিণত করিয়া থাকিবেন।—পরে যখন তাম্রলিপ্ত ব্রাহ্মণদিগের ধর্মশাস্ত্রান্তর্গত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্র অর্থসূচক নাম 'তমোলিপ্তে'র ও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।"[১]

---

১ প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ৪৪৭ ও ৪৪৮ (৩৪৭ ও ৩৪৮ ?) পৃষ্ঠা।

আর একস্থানে লেখা আছে—বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি অবিশ্রান্তভাবে অসুরগণকে ধ্বংস করে চলেন। তাঁর এই বিশ্রামহীন সংগ্রামের ফলে পূত-অঙ্গ থেকে নির্গত হতে থাকে স্বেদরাশি। এই পূত-অঙ্গের ঘর্মরাশি পতিত হয় এই পুণ্যস্থানে। দেব-শরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।[১]

"তমলুক মঙ্গল" রচয়িতা পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ভট্টাচার্য তাঁর পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"তাম্রধ্বজ রাজা লুপ্ত হইলে তাঁহার নামানুসারে এই স্থান তাম্রলিপ্তী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।"

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এখানে পূর্বকালে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেত এবং তামার ব্যবসা বেশ ভালই চলত, তাই কালক্রমে এইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে পরিচিত হয়।

"কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটি জনশ্রুতি অনুসারে ইহা ময়ূরভঞ্জের রাজা কর্তৃক সংস্থাপিত।"[২]

ওই জনশ্রুতির মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলে মনে হয় না। কারণ তাম্রলিপ্তের নাম প্রাচীন সাহিত্যাদিতে যেরূপ অধিক পরিমাণে উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা মনে হয় ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে পূর্বে তমলুক ও ময়ুরভঞ্জ এই উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ সংস্রব ছিল বলে মনে হয়।

এই সমস্ত বিভিন্ন মত থেকে তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কারণ নির্ণয় করা বড় কষ্টকর। এই বন্দর এত প্রাচীন যে এ বিষয়ে কোন অনুমান করাও অসম্ভব। তবে প্রাচীন বিভিন্ন

১ "—That it took its name from the fact that Vishnu, in the form of Kalki (?), having got very hot in destroying the demons dropped perspiration at this fortunate spot which accordingly became stained with the holy sweat (for dirt) of the God."

—Hunter's Orissa Vol. I. P. 311.

২ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত, পৃঃ ১২।

ভ্রমণ কাহিনী সমূহ পাঠ করে মনে হয় তাম্রলিপ্তবাসীগণ খুব রণ-নিপুণ, দুর্দান্ত সাহসী নাবিক ও শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। এই 'দুর্দান্ত' শব্দটিই হয়ত ক্রমে অপভ্রংশ হয়ে হয়ে 'দামল' রূপে হীন পরিণতি লাভ করেছে তাই বা কে জানে। চলতি বাংলায় আমরা যাকে বলি 'দামাল' তারই শেষ পরিণতি এই দামল। তাম্রলিপ্তের নাম থেকেই যে 'তামিল' জাতির উৎপত্তি এবং দামল জাতি থেকেই যে তাম্রলিপ্ত নামেব উৎপত্তি পণ্ডিত কনকস্‌ভাই পিলে মহাশয়ের এই যুক্তি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারতীয় কাল

তাম্রলিপ্তের নাম আমরা মহাভারতে অনেক জায়গায় পাই। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় মহাভারতীয় যুগে তাম্রলিপ্তের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহাভারত কত বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হয়েছিল, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। আজো সে বিরোধের সুমীমাংসা হয়নি। তবে বিদেশী এবং দেশী পণ্ডিতদের মতামত পড়ে যতদূর মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আজ থেকে কম করে হলেও ৩৩৮০ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।[১] এবং তাম্রলিপ্ত অন্ততঃ তার অনেক আগে থেকেই বর্তমান ছিল।

১ কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে এস্থানে সংক্ষেপে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করলাম।

ইউরোপীয় পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উইল্‌সন সাহেবও এই মতাবলম্বী। এল্‌ফিনষ্টোন গণনা করে এ মতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খৃঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট্ সাহেব বলেন খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। "ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।" কৃষ্ণচরিত্র : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎ প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলেছেন—সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না। "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনৌ।" সকলেই জানেন যে, বৎসরে তুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই তুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ তুইদিনে সূর্য থাকেন,

সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial Point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ পূরে অয়ণ পরিবর্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়ণে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়ণে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্‌গতির হানি হয়), অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘমাসে উত্তরায়ন হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। প্রাণত্যাগের পুর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—"মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।" তবে তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ্ দিন এবং তৎপুর্বদিনকে মকরসংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী নক্ষত্র প্রথম বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না, এবং এখন ১লা মাঘে পুর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না, এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়, ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত সুতরাং অয়ণ পরিবর্তন স্থানও বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পুর্বকথিত (Precession of Equinoxes)—হিন্দুনাম "অয়ণ চলন," কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতিবিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়া ছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন। এবং সর্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন।

এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোনদিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কেন না, তাহা হইলেই "মাঘোহয়ং; সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, রবির শীঘ্রগতি মন্দগতি আছে! ৭ই পৌষ হইতে ১৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গলা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খ্রীঃ পুঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে খ্রীঃ পুঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পুঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। কৃষ্ণচরিত্র ৫ম পরিচ্ছেদের শেষাংশ।

পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন— "বঙ্কিমবাবুর এই গণনা পরিশুদ্ধ নহে। তিনি যেভাবে "তদা প্রবৃত্তশ্চ-কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" (৩৪) শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বিষ্ণুপুরাণের ৪।১।৫২ শ্লোকে ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা পুরাণ নিজেই করিয়াছেন। শ্লোক দুইটি এই—

"ত্রীণি লক্ষানি বর্ষাণি দ্বিজমানুষসংখ্যয়া
ষষ্ঠিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যতেষ বৈ কলিঃ।
শতানি তানি দিব্যান সপ্তপঞ্চ চ সংখ্যয়া,
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্।"

অর্থাৎ—হে ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদিগের বৎসর অনুসারে তিন লক্ষ ষাইট হাজার বৎসর কলিযুগ চলিবে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়া (স্বামী) এই তিন

* সেকালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ৬ ঋতুর কথা মহাভারতে আছে। ১২ মাস না হইলে ৬ ঋতু হয় না।

লক্ষ ষাইট্ হাজার মানুষ-বৎসরে দেবতাদের সাত যোগ পাঁচ (৭+৫=১২) অর্থাৎ বারশত বৎসর হয়। ইহার পরে আবার সত্য যুগ হইবে। কাজেই দেখিলেন, ৩৪ শ্লোকে যে বার শত বৎসর বলা হইয়াছে তাহা দিব্যমানে ১২০০ বৎসর। উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, পরীক্ষিতের সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়, যে কলিযুগের পরমায়ুঃ দিব্যমানে বার শত বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশবাদে মনুষ্যমানে ৩,৬০,০০০ বৎসর। বঙ্কিমবাবু লোককে বুঝাইয়াছেন যে, পরীক্ষিতের সময় কলির ১২০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল, এই কথা যে শুদ্ধ নহে তাহা বুঝিলেন। সাক্ষাৎ কলিযুগ প্রবেশের পূর্বেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করেন; পরীক্ষিতের সময় কলির সাক্ষাৎ প্রকাশ। এই জন্যই পরীক্ষিতের সময় হইতে কলির গণনা।

পরীক্ষিত হইতে নন্দের অভিষেককাল বিষ্ণু ও ভাগবত অনুসারে মাত্র ১০১৫ বৎসর পরে। নবনন্দ মাত্র ১০০ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পরেই চন্দ্রগুপ্ত। অতএব পরীক্ষিৎ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর দূরবর্তী।

জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বর্তমান ছিলেন। সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় ১০০১ বৎসর পরবর্তী। তৎপরে প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর, শিশুনাগ বংশ ৩৬২ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরেই নন্দ। কাজেই নন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৫০১ বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। তাহার ১০০ বৎসর পর চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে (১০০১+১৩৮+৩৬২+১০০=১৬০১) বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। চন্দ্রগুপ্তেরই ১৬০১ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ইহা বিষ্ণুপুরাণ হিসাব করিয়া দিয়াছেন। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ ৩২৭ পূর্বাব্দের লোক হইলে খ্রীঃ ১৯২৮ পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। পরীক্ষিৎ হইতে ১০১৫+১০০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার যে অধিকার আমাদের আছে, সহদেব হইতে ১৬০১ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার সেইরূপ অধিকার আমাদের আছে। নক্ষত্র গণনার কথা পরে বলিতেছি, বরং ভারতযুদ্ধকারী সহদেব হইতে একাদিক্রমে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের কাল গণনাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ কালের ছন্দ্রকট্টাস্ কি এই পুরাণোক্ত চন্দ্রগুপ্ত? তাহা হওয়া যেন অসম্ভব। পঞ্জিকোক্ত কল্যব্দ ধরিয়া হিসাব করিলেও কোন মতেই তাহা হইতে পারে না। কেন না বর্তমান কল্যব্দ ৫০১৩ হইতে ১৬০১ বিয়োগ করিলে ৩৪১২

হয়। উহা হইতে ১২৬০ বিয়োগ করিলে ঠিক ১৫০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। এই সময়ে পাতঞ্জল মহাভাষ্য রচিত হওয়ার কথা দাঁড়ায়। ৩২৭ ও ১৫০২ অঙ্কে অনেক অন্তর। বৌদ্ধদিগের বিবরণানুসারে ৪৩৩ খ্রীঃ পুঃ ভদ্রবাহু নামক একজন লোক জন্মেন। তাঁহার সমকালে এক চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। ৩২৭ খ্রীঃ পুঃ পরেও এক চন্দ্রগুপ্ত দেখা যায়। ইহাতে বোধহয় চন্দ্রগুপ্ত একটি উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "বোধ হয় অনেকেই সাণ্ড্রাকট্টাস্ ছিলেন।" সুতরাং গ্রীক সাহিত্য দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরা যায় না—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালও ধরা যায় না।

সৌর মাসের হিসাবে ক্রান্তিপাতের গতির অনুপাত দ্বারা বৎসর হিসাব করা ঠিক নহে। যে ভীষ্মের উক্তি লইয়া মাঘে উত্তরায়ণ-প্রারম্ভের হিসাব বঙ্কিমবাবু দিয়াছেন, সেই ভীষ্মই বিরাট পর্বে চান্দ্র মাস ধরিয়া অজ্ঞাতবাস পুরণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। নীলকণ্ঠকৃত বিচার দ্রষ্টব্য। তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ২৪-২৭।

পঞ্জিকাকারগণের মতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলির্গতাব্দা: ৫০৬৪ বৎসর। তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সময় ৫০৬৪ বৎসর হইতেছে।

জ্যোতির্বিদাভরণে পাই—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু—
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শক কারকানৃপাঃ॥

শ্লোকটির আবার অন্যপাঠ এইরূপ

"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রম শালিবাহনৌ
ততোনৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাব্দেযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ব বিশ্বে ১৩৫ ইভ্রখখাষ্টভূময়ঃ ১৮০০০।

ততোঽযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ ॥
দশমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থ—যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলী (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দা স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের ও ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে; এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্তমান সময়ে শালিবাহন শকাব্দের মান ১৮৮৭ বৎসর। তা হলে জ্যোতির্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮৮৭) থেকে ৫০৬৬ বৎসরকে আমরা বর্তমান বছর বলে ব্যবহার করছি। এবং

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"—ভাস্করাচার্য

"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য।" মকরন্দ,

এর দ্বারা বুঝায়, ৩১৭৯ বৎসর কলি গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ। যোগ করিলে কলি প্রবৃত্তির প্রথম বর্ষ হইতে উক্ত ৫০৬৮ বর্ষই বর্তমান বর্ষ ইহা স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শক ও কল্যব্দের এক বর্ষই বলিতে হয়।" জন্মভূমি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১।

প্রাচীনকালের একমাত্র ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, তা কহ্লন পণ্ডিত বিরচিত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী'। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে একমাত্র এই গ্রন্থকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। এতে লিখিত আছে—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যাধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

রাজতরঙ্গিনী, প্রথমতরঙ্গ, পৃঃ ৩

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলি প্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলে অনুমিত হয়। অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্বে হয়। রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা আরও বলেন কাশ্মীর রাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় ১৬ই কার্তিক, সোমবার ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরে (রাজতরঙ্গিনী মতে কল্যব্দ ৬৫৩,২,৫২৬ শকাব্দ পূর্বে, ২৩৯১ সংবৎ পূর্বে, ২৪৪৮ খ্রীষ্ট পুর্বে)

দুষ্টমতি দুর্যোধন বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহ দাহ করতে পুরোচন নামক যে মন্ত্রীকে প্রেরণ করে ছিলেন, সেই মন্ত্রী ছিল গ্রীস দেশীয় যবন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহা যজ্ঞের কাল কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পুর্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্বে, এবং ২৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে। এই যজ্ঞে তাম্রধ্বজ রাজাও যোগ দিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় অগ্রহায়ণ মাসের ১লা থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৮ দিন পর্যন্ত। এইস্থান বর্তমানে ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ। সে হোল কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পুর্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্বে, এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে।

যুধিষ্ঠির মোট ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স ১২৬ বৎসর তখন তিনি মহাপ্রস্থান করেন। সে হোল কলির ৭৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ পূর্বে ২২৫৬ সংবৎ পুর্বে, এবং ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পুর্বে। আর্যদর্শন, দশম খণ্ড, ৩৮৭—৩৯৩ পৃঃ।

পরিশেষে আমরা পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের মতামত উল্লেখ করে এ বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তি রেখা টানব। বসু মহাশয় প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের পদ্ধতি অনুযায়ী 'মনুগণনা' দ্বারা এ বিষয়ের সম্পর্কে যে নতুন আলোকপাত করেছেন তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। 'পুরাণ প্রবেশ' নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করছি। আশাকরি এ আলোচনা রসিক পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করবে। বসু মহাশয় মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কাল ৪০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে স্থিরবিন্দু ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করেছেন ১৪১৬ খ্রীঃ পুর্বাব্দ। এই দুইয়ের ব্যবধানকাল ১০১৫ বৎসর তিনি কোথা থেকে কিভাবে গ্রহণ করলেন তা' দেখা দরকার। পুরাণাদিতে কয়েকস্থলেই পরীক্ষিৎ এবং মহাপদ্মনন্দ এই দুই রাজার ব্যবধান কাল সম্পর্কে "পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর" এই নাম দিয়ে একটি "কাল-পরিমাণ" উল্লিখিত আছে। বিষ্ণু পুরাণে (৪।২৪।৩২) ১০১৫ বৎসর, বায়ু পুরাণে (১৯।৪।১৫) ১০৫০ বৎসর, মৎস্যপুরাণে (২৭।৩।৩৫) ১০৫০ বৎসর এবং

ভাগবতে (১২।২।২৫)। ১১১৫ বৎসর পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল বলে উল্লিখিত আছে। বসুমহাশয় এই তিনটি কালের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের ১০১৫ বৎসরই বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কাল ৪০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দের সাথে যোগ করেছেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করেছেন ৪০১+১০১৫=১৪১৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। আপত্তিকারীরা বলতে পারেন যে, এক্ষেত্রে ১০১৫ বৎসর, ১০৫৫ বৎসর এবং ১১১৫ বৎসর পুরাণোক্ত এই তিনটির মধ্যে কোনটি বেশী ও কোনটি কম বিশ্বাসযোগ্য তা নির্ণয় করে দু'টিকে বর্জন করে তৃতীয়টিকে গ্রহণ করাই আসল প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে পুরাণোক্ত পরীক্ষিৎ নন্দান্তর কালের উপর নির্ভর করে কাল নির্ণয় ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল-নির্ণয় সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত কিনা? বিশেষতঃ যে স্থলে অন্য প্রকারে কালনির্ণয় করার উপযোগী নিশ্চিততর উপকরণ বিদ্যমান তখন সংশয়াত্মক পুরাণোক্তি গ্রহণ করা কেন? দেখা যায় যে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ কালকে স্থিরবিন্দুরূপে গ্রহণ করে 'মৃতগণনার'[১] পদ্ধতিতে কালনির্ণয় করার জন্য নিশ্চিততর 'রাজনামমালা'[২] পাওয়া যাচ্ছে এবং যখন তার সাহায্যেই অনেকটা

১,২—মিশরদেশীয় কালপঞ্জী নির্ণয়ে দু'প্রকার প্রণালী বা পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় তার প্রথম প্রণালীর নাম 'মৃতগণনা' (Dead reckoning)। সুদূর অতীতকালে মিশর দেশে বিভিন্ন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন—নানা উপায়ে তাঁদের নামমালা পাওয়া গেছে। (তন্মধ্যে Champollion—আবিষ্কৃত Turin Papyrus-এ লিখিত রাজমালা এবং (Manetho) বর্ণিত বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য) এইভাবে প্রাপ্ত রাজসংখ্যার সঙ্গে গড় রাজত্বকাল (Average period of reign) গুণ করে যে বর্ষ পরিমাণ পাওয়া যায় তা, কোন সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত সাল তারিখের সঙ্গে যোগ করে বিভিন্ন রাজবংশের 'রাজ্য আরম্ভকাল', 'মোট রাজত্বকাল' প্রভৃতি নির্ণীত হয়েছে। মোটকথা জনসাধারণের মধ্যে 'এক পুরুষে' ২৫ বৎসর ধরে কিংবা ১০০ বৎসরে 'চার পুরুষ' গণনা করে যে ভাবে কাল নির্ণয় করা হয় 'মৃত গণনা' ও তদ্রূপ একটি গণনা মাত্র। অবশ্য এতে ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় নিশ্চিত হাতে পারতেন না। তাই তাঁরা 'জ্যোতিষিক কাল গণনা'র আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সভায় তাম্রলিপ্তাধিপতি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদিকে ভারতের সমবেত শক্তিশালী বীর রাজপুত্রদের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছেন—

সুনিশ্চিত ভাবে কালগণনা ও কালনির্ণয় করা চলে তখন সংশয়যুক্ত পুরাণোক্তি গ্রহণ করা কি উচিত ?

বসু মহাশয় প্রদর্শিত রাজানামমালায় লক্ষ্য করা যায় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বল এবং পরবর্তীকালের মহাপদ্মনন্দের পর্যায়সংখ্যা যথাক্রমে ১৮১ ও ২১৭। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে ৩৬ পুরুষ ব্যবধান ছিল। এই ৩৬ এর সঙ্গে পর্যায় কাল ২৫ বৎসর দিয়া গুণ করলেও ৯০০ বৎসরের বেশী পাওয়া যায় না। ৪০১ খ্রীঃ পূর্বের সঙ্গে এই নয় শত বৎসর যোগ করলে ৪০১ + ৯০০ = ১৩০১ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হিসাবে পাওয়া যায়। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের নিকট বৃহদ্বল ও নন্দের ব্যবধানকাল হিসাবে ৯০০ বৎসর ও একটু বেশী বলে মনে হতে পারে। কারণ তাঁরা বলতে পারেন যে, যেহেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় জনসমাজে নানা কারণে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেহেতু এই সময়কার পর্যায়কাল ২৫ বৎসরের ও কম ধরা সঙ্গত। অবশ্য আপত্তিকারীদের এই যুক্তি খণ্ডনকল্পে বলা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজে বাল্য বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হলেও তার প্রভাব বহুদিন যাবৎ ক্ষত্রিয় বা রাজন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। উহা ক্ষত্রিয়েতর সমাজেই ছিল সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের পর্যায়কাল ২৫ বৎসর ধরা অসঙ্গত বলে মনে করা উচিত নয়।

উপরে পুরাণোক্ত, 'পরীক্ষিৎ—নন্দান্তর কাল' ১০১৫ বৎসর এবং মৃত-গণনা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ৯৮০ বৎসরের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা' যা' বলা হোল তা' সত্ত্বেও আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য মোটামুটি ভাবে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হিসাবে গ্রহণ করেছি—(১) ইহা পুরাণোক্ত নক্ষত্র যুগের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন (২) অল্প পুরুষের মধ্যে 'পর্যায়কাল' অথবা 'গড় রাজত্বকাল' উভয়ই ২৭।২৮ বৎসর এমন কি ২৯।৩০ বৎসরও হতে পারে। এক্ষেত্রে ৩৪ পুরুষে ১০০০ বৎসর ধরলে পর্যায়কাল বা গড় রাজত্বকাল হয় ২৯৫ বৎসর। অতএব ইহা খুব অসম্ভব বলে মনে হয় না।

"হে ভগিনি! দেখ কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পাঁওনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎ পুত্র শল্য ** ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাজনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"[১]

তারপরে চলে আসুন সভাপর্বে। মহাবীর ভীম চলেছেন বীর বিক্রমে দিগ্বিজয়ে। একে একে তিনি তৎকালের সকল বীরকেই করছেন পরাজিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চলেছে তাঁর বিজয় অভিযান। অবিশ্রান্ত তৃতীয় পাণ্ডবের এই তুর্জয় অভিযান। অবশেষে এসে হাজির হলেন মোদাগিরিতে।

'অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানাং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥ ২১ ॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ং রাজানাঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২ ॥

১ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদি পর্ব, ২৯৩ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা।

"ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ। * * *
কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পাওনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩
* * *
এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ॥ ২৩
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়া প্রথিতা ভুবি।
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ সুভেঽদ্যতম্॥ ২৪
ইত্যাদি পর্বণি স্বয়ম্বরপর্বাণি রাজনামকীর্তনে
অষ্টাশীত্যধিকশতোঽধ্যায়ঃ।

মহাভারতম্, আদিপর্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ ২৩ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪ ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥ ২৫ ॥

ইতি সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ[১]।

"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুম্ভদিগের অধিশ্বর এবং মহাসাগর কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"

এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়, তৎকালে বাংলা দেশে তাম্রলিপ্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি জনপদ ছিল। এবং বাংলা এই নামে সমগ্রদেশকে বুঝাত না। বাংলা ছিল কয়েকটি খণ্ড খণ্ড স্বাধীন জনপদে বিভক্ত। অনুবাদকারকও তাই সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি এক একটি পৃথক রাজের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাম্রলিপ্তাধিপতি কোন রাজা তখন বর্তমান ছিলেন, তা' কোথাও উল্লেখ করেননি।

তবে এ সত্য প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্তাধিপতি তৎকালীন ভারতীয় ধনবান ভূপতিগণের মধ্যেও একজন ছিলেন। তাঁর ধনদৌলত

১ মহাভারতম্, সভাপর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ৭৩।

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব, পৃঃ ৪১—৪২।

নিতান্ত কম ছিল না। পাণ্ডবগণের যজ্ঞে তিনিও উপস্থিত হয়েছিলেন বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক আয় তখন ছিল বিপুল। কলম্বাসের বহুপূর্বে ভারতবাসীগণ আমেরিকার মাটিতে গিয়ে সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন সেই সুদূর অতীতকালে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব।

সভাপর্বে এমনিভাবে উক্ত হয়েছে —

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ ॥ ১৯ ॥
ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ॥ ২০ ॥
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জবান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা॥ ২১ ॥"[১]

ইতি সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন সন্তাপে দ্বিপঞ্চশোঽধ্যায়ঃ।

"বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্বতপ্রতিম, কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।"[২]

আমরা পূর্বেই বলেছি, তাম্রলিপ্ত ছিল অতি পুণ্যস্থান।

১ মহাভারতম্, সভাপর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ১১৪

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব পৃঃ ৬৯

এখানেই গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল হেতু অনেকেই পুণ্যতীর্থ বলে মনে করতেন। অবশ্য তীর্থ বলে মনে করার আরো অনেক কারণ আছে, তা' পরে বলছি। কিন্তু সেই মহাভারতীয় যুগেই তাম্রলিপ্ত যে পুণ্য জনপদরূপে পরিগণিত হয়েছিল, তা' জ্ঞানী সঞ্জয়ের উক্তি থেকেই বোঝা যায়। ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সেকালের পুণ্যবান নদী ও জনপদের নাম বলতে গিয়ে তাম্রলিপ্তের নামও উল্লেখ করেছেন—

"কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ।
কিরাতা বর্ব্বরাং সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ" ॥ ৫৭ ॥
ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাণি
ভারতীয় নদ্যাদি কথনে নবমোঽধ্যায়ঃ।[১]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাম্রলিপ্ত রাজ পাণ্ডবগণের বিপক্ষে ও কৌরবগণের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। মহাভারত দ্রোণপর্বে পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবা মাত্র তিনি (পরশুরাম) একান্ত ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র. ত্রিগর্ত্ত, মার্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[২]।"

এরপর কর্ণপর্বে আবার তাম্রলিপ্ত রাজের নাম পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাম্রলিপ্তবাসী সৈন্যগণ বিপুল শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন—

১ মহাভারতম্, ভীষ্ম পর্ব, প্রতাপচন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, পৃঃ ২৪

২ মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারত, দ্রোণ পর্ব পৃঃ ৯৮।

"হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, মণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ** ** হস্তিশিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছন্দ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল।"[১]

নিম্নলিখিত ঘটনাটি ব্যাস-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্বে ও কাশীরাম দাস প্রণীত মহাভারত অবলম্বনে লিখিত হোল।

রাজর্ষি ময়ুরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব, তা' রক্ষা করছেন তাম্রধ্বজ মহাবীর। তাম্রধ্বজ হলেন ময়ূরধ্বজের পুত্র। বহুলধ্বজ সেনাপতিও রয়েছেন সংগে। প্রথমে তিনিই দেখলেন পাণ্ডবদের যজ্ঞীয় ঘোটক। সংবাদ দিলেন তাম্রধ্বজকে সেনাপতি। তাম্রধ্বজ অশ্ব ধোরলেন পাণ্ডবদের। শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্র-ব্যূহ রচনা করে চললেন অশ্ব উদ্ধার করতে। অর্জ্জুন, অনু, শাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রূবাহন প্রভৃতি ও চললেন সংগে। ঘোরতর যুদ্ধ হোল উভয় পক্ষে। কিন্তু মহাবীর তাম্রধ্বজের কাছে কেউই এঁটে উঠলেন না। পরাজিত হলেন সকলেই। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুনও পড়লেন মূর্চ্ছিত হয়ে। এই শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল নর্ম্মদা নদীর তীরে।

১ মহাভারত, কর্ণ পর্ব—কালিপ্রসন্ন সিংহ পৃঃ ৩৪ ও ৩৫।

এদিকে তাম্রধ্বজ দু'টি অশ্ব নিয়ে হাজির হলেন নিজ 'নিকেতনে'। পিতাকে জানালেন সব সংবাদ। শুনে আনন্দিত হলেন রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ। কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননায় ব্যথিত হলেন হৃদয়ে।

মহাবৈষ্ণব ময়ূরধ্বজকে ছলনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করে হাজির হলেন রাজসভায়। ময়ূরধ্বজের শরণপ্রার্থী হয়ে বললেন ছদ্মবেশী কৃষ্ণ, আমার পুত্রকে আক্রমণ করেছে এক পরাক্রান্ত সিংহ। সে চায় আমার পুত্রের মাংস। অনেক বুঝিয়ে এবং নিজের শরীর দেব অঙ্গীকার করেও সিংহ ছাড়তে চায় না পুত্রকে। তবে একটি সর্তে সে রাজী আছে, যদি দয়া করে আপনি নিজেকে সমর্পণ করেন সিংহের কাছে, তাহলে ছেড়ে দেবে সে পুত্রকে। পরমবৈষ্ণব ময়ূরধ্বজ সংগে সংগে রাজী হলেন পরহিতার্থে প্রাণ উৎসর্গ করতে। কিন্তু কৃষ্ণ চান অর্ধেক শরীর। আবার তা কেটে দিতে হবে রাজপুত্র ও রাণী এই দু'জনকেই। অগত্যা তাতেই সম্মত হলেন রাণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ। অর্ধেক শরীর কোন কাজে এলো না মনে করে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ ব্যথিত হলেন অন্তরে। বামচক্ষু দিয়ে অবিরল ধারায় বর্ষিত হোল অশ্রু। দেখে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ চললেন উঠে। ব্যথার দান নেবেন না তিনি। তখন বললেন—

'দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষু করয়ে ক্রন্দন॥'[১]

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের এই নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ দেখে মুগ্ধ হলেন। প্রকাশ করলেন স্বরূপ। নর-নারায়ণ মূর্তি দেখে রাজা ময়ূরধ্বজ সগোষ্ঠী হলেন কৃতকৃতার্থ। ধনজন রাজঐশ্বর্য সব পরিত্যাগ করে শরণ নিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদতলে।[২]

---

১ মহাভারত—কাশীরাম দাস (দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত) পৃঃ ১০০৪

২ জৈমিনি-ভরতম্, ৪১—৪৬ অধ্যায়

বিশ্বকোষ, ৬৯০—৬৯১ পৃষ্ঠা

তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ৬, ৭, ৮ ও ৯ পৃষ্ঠা, এবং A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal P. 23—25

আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় 'তমোলুক ইতিহাসে' লিখেছেন—'উক্ত ঘটনা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতেও উল্লেখ রহিয়াছে…।' 'বিশেষতঃ জৈমিনি[১] ও কাশীরাম দাস[২] উভয়েই উক্ত ঘটনা নর্ম্মদা

১। পুরাৎপ্রমুক্তোরাজেন্দ্র তৈঃ সকৃষ্ণৈর্মহাবলৈঃ। ৮
যাবৎপ্রয়াতিতুরগ স্তাবৎ তাম্রধ্বজনসঃ।
বীক্ষিতো রক্ষতাস্বংহি বাজিমেধ তুরঙ্গমং। ৯
প্রযুক্তং রত্নগরাৎ স্বপিত্রাবর্হিকেতুনা।
তাম্রধ্বজস্য হংসং তমর্জ্জুনস্য হয়ো যযৌ॥ ১০
* * * *
রণভূমিং পরিত্যজ্য সমায়াহি যতোব্রজে
পিতাস্য দীক্ষিতঃ পার্থ বিদ্যতে নর্ম্মদাতটে॥ ৩৬
শূরোয়ং জিত কামস্ত সত্যবাগন সূয়কঃ।
ন বোধনীয় পার্থেন সতামেতদ্বদামিতে॥ ৩৭"
জৈমিনি-ভারতম, একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।
বেনারস যন্ত্রে মুদ্রিত ; ৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ—"জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সহিত মহাবল বীরগণনগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে ঐ তুরঙ্গম গমন সময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের দৃষ্টি বিষয়ে পতিত হইল। তিনি পিতৃদেব বার্হধ্বজ (ময়ূরধ্বজ) কর্তৃক রত্নগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব ত্বদীয় অশ্বের নিকট গমন ও তাহার বদন আঘ্রাণ পূর্বক ধ্বস্তকর্ণ হইয়া শব্দ করতে লাগিল এবং এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত ও ক্রোধ ভরে দশন দ্বারা তাহার প্রোথস্থিত মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিল। * * * * বাসুদেব কহিলেন—পার্থ! তুমি আমার সহিত রণভূমি ত্যাগ করিয়া আগমন কর। ইহার পিতা বার্হধ্বজ নর্ম্মদাতটে যজ্ঞসূত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন ও শূর, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে। আমি গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

জৈমিনিভারত, একচত্বারিংশ অধ্যায়, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা।

২। 'শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অশ্ব সঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন॥

তীরে রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এখন পর্যন্ত নর্ম্মদার নিকট, বিলাসপুরের উত্তরে, রত্নপুর নামে স্থান বর্তমান রহিয়াছে।"[১]

অতএব রক্ষিত মহাশয়ের মতে উক্ত রত্নাবতীনগর নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তে নহে।

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, জৈমিনি বা কাশীরাম দাস কেহই এমন কথা বলেন নি যে রত্নাবতীপুর নর্ম্মদা নদীর তীরে। পক্ষান্তরে তাঁরা বলেছেন, ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব তাম্রধ্বজ রক্ষা করছেন এবং সেই অশ্ব নিয়ে তিনি বিচরণ করতে করতে এসেছেন নর্ম্মদার তীরে। সেখানেই দেখতে পেলেন পাণ্ডবদের অশ্বকে। তারপর কাশীরাম দাস বলছেন—সেই নর্ম্মদার তীরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে মূর্চ্ছিত করে—

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরের ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন নরপতি।
অশ্ব রক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের ঘোড়া পেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব,
লক্ষ্মীবিলাসযন্ত্রে মুদ্রিত, ৮৯৩ পৃষ্ঠা।

১ তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত পৃঃ ২২—২৪।

'সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে নিজ সৈন্য লয়ে সঙ্গে
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।'[১]

এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে নর্ম্মদা তীর থেকে তাম্রধ্বজ এলেন নিজ রাজ্য রত্নাবতীপুরে। রত্নাবতীপুর নর্ম্মদার তীরে এমন কথা কোথাও লেখা নাই বা কবিও সেকথা বলেন নি।

জৈমিনিও বলেছেন—'তিনি (তাম্রধ্বজ) পিতৃদেব বার্হধ্বজ (ময়ূরধ্বজ) কর্তৃক রত্ননগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব রক্ষার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় ময়ূরধ্বজের অশ্ব রত্ননগর থেকে বেরিয়ে (প্রমুক্ত) তার ইচ্ছে মত চলেছে আর তাম্রধ্বজ আছেন তার রক্ষণাবেক্ষণে। অতএব রত্নাবতীপুর যে নর্ম্মদার তীরে নয় একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রত্নাবতীপুর তা'হলে কোথায়? রক্ষিত মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"এখন পর্যন্ত নর্ম্মদার নিকট, বিলাসপুরের উত্তরে, রত্নপুর নামে স্থান বর্তমান রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্ভবতঃ নর্ম্মদা তীরবর্তী রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়[২]।"

ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন তমলুকই রত্নাবতীপুর।[৩] পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী ও ঐ মতাবলম্বী। তিনি আরো বলেন নর্ম্মদা তীর পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল বিস্তৃত।[৪]

এমতাবস্থায় রত্নবতীপুর যে কোথায় ছিল তা' সিদ্ধান্ত করা বড় দুষ্কর। তবে তমলুকে জিষ্ণুহরির মন্দির আজো বর্তমান। প্রাচীন

১। মহাভারত—কাশীরাম দাস (দেবসাহিত্য সং) পৃঃ ১০০০।

২। তমোলুক ইতিহাস—পৃঃ ২৪

৩। "288. Supposed to be referred to as Ratnavati in the Kasidas, or Bengal recession of the Mahabharat, Aswamedhparva. The local name of Ratnavati still survives at Tamluk,—" Hunter's Orissa, Vol 1. P. 309.

৪। তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী পৃঃ ৮

মন্দির রূপনারায়ণ গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির আবার স্থাপিত হয়েছে। জৈমিনি মহাভারত ব্যাসদেবের অনেক পরে রচিত হয়েছিল। তাই এই ভারতের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, এই বহু প্রাচীন মতবাদ ও জনশ্রুতিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তাই এ সম্পর্কে আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তমলুকের অনেক প্রাচীন নাম পাওয়া গিয়েছে কিন্তু রত্নগর বলে অন্য কোন স্থানে বড় একটি দেখা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য রত্নাবতী নগরী নর্ম্মদার তীরে থাকলেও সেই রত্নপুর কৃষ্ণার্জ্জুনের শোচনীয় পরাজয়ের স্থান নয়।

জনশ্রুতি মতে, ময়ূরধ্বজ চেয়েছিলেন কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্তি যেন রত্নাবতীপুরের অধিবাসিগণ চিরকাল দেখতে পায়। তাই ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সেই ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন। তাইতো আজো তমলুকে আছে তাঁদের প্রস্তরময় মূর্তি। বিগ্রহ দুটি-ই কিন্তু বিষ্ণুর।

এইসব প্রাচীন জনশ্রুতির মূলে সত্য যে একেবারে নেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আর সবশেষে আমার বক্তব্য হোল এই, তমলুক যেমন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলে আজ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তেমনি রত্নাবতীপুর আর তাম্রলিপ্ত একই স্থান এই সত্য প্রমাণ করতে হলে আরো কিছু প্রাচীন পুঁথি-পত্র থেকে বের করতে হবে তার উল্লেখযোগ্য নজির। তা না হলে জোর করে এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

মহাভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে আর কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায় না। তবে অনেকে হরিবংশে তাম্রলিপ্তের নাম আছে এবং হরিবংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পর্ব বলে গণনা করেন। আমরা কিন্তু হরিবংশকে মহাভারতীয় যুগের গ্রন্থ বলে মেনে নিতে রাজি নই। পৌরাণিক যুগে তাম্রলিপ্তের কথা আলোচনা প্রসংগে

হরিবংশের কথা আলোচিত হবে। এ বিষয়ে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অষ্টাদশপর্ব মহাভারত অনুবাদ করার পর হরিবংশ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হবো।

"অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনা প্রণালী ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে হরিবংশ শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত থাকিলে লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"[১]

বেদের অন্য কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায় না। এক মাত্র অথর্ববেদের পরিশিষ্টে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়।[২]

১ কৃষ্ণচরিত্র (বসুমতী সং) পৃঃ ৩৫—৩৬। ২ তমলুক মঙ্গল, পৃঃ ২।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরাণিক যুগ

পৌরাণিক যুগ কিন্তু মহাভারতীয় যুগের পরে নয়। অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে বিতাড়িত করার জন্য। তাই প্রকৃতপক্ষে পুরাণগুলি বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক কালে রচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[১] কিন্তু তবুও প্রশ্ন উঠে অষ্টাদশ পুরাণ যে ব্যাসদেবের প্রণীত বলে প্রসিদ্ধি আছে? তা'হলে ত পুরাণগুলিকে মহাভারতীয় যুগের পরই স্থান দিতে হয়। এ বিষয়ে একমাত্র বক্তব্য এই যে, ব্যাসদেব কখনই অষ্টাদশ পুরাণ লেখেননি বা তাঁর একার লেখা অষ্টাদশ পুরাণও নয়। এমন হতে পারে অষ্টাদশ পুরাণ বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন। ব্যাস নাম নয় উপাধি মাত্র। মহাভারতকারের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ব্যাস উপাধির কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"বৈদিক সুক্ত সকল * সংকলিত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি এই বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগ জন্য "ব্যাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাহার উপাধি মাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ, এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বলিত।' পৃঃ ৩১।

তা'হলে প্রশ্ন উঠে পুরাণগুলির রচয়িতা কাঁহারা? এ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। এমন হতে পারে সেকালে যিনি কিছু পুরাণতত্ত্ব সংগ্রহ করে বই লিখতেন তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী হতেন। যাইহোক এ সম্পর্কে

১ কৃষ্ণচরিত্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩০—৩৬

বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নয়। আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে পুরাণ যদি বৌদ্ধযুগে রচিত হয়ে থাকে বা বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়নের জন্য এর সৃষ্টি, তা'হলে বৌদ্ধযুগের পর এই অধ্যায়ের সূচনা করা হোল না কেন? এ সম্পর্কে আমি নিজে অনেক চিন্তা করে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হই। স্থির করি বৌদ্ধযুগের পর এই অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু তাতেও মেটে না সমস্যা। ঐতিহাসিক যুগ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছে। বৌদ্ধযুগ থেকেই আমরা প্রকৃত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সন্ধান পাই। বৌদ্ধসাহিত্য জনগণের সাহিত্য। সেখানে দেবতা বড় নয়, প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। মানুষের কথাই বেশী চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু পুরাণের নায়ক-নায়িকাগণ প্রায় সকলেই অতিমানব। তাঁদের লীলাখেলা মর্তের মাটিতে নয়, স্বর্গের নন্দনকাননে। সকলেই তাঁরা দেবতা। দেবতাদের কথা তাই বৌদ্ধযুগের পর লিখতে হলে এই পুস্তকের সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে না। সে কেমন যেন বেসুরো ঠেকবে। মর্তের মাটিতে নেমে এসে, মর্তের মায়ায় জড়িত হয়ে, আবার স্বর্গে ফিরে যেতে প্রাণ যে আকুলি-বিকুলি করে উঠে। তাই দেব-দেবীর কথা আগেই সেরে নেওয়া ভাল বলে মনে করি। এই জন্যই মহাভারতীয় যুগের পর পৌরাণিক যুগের অবতারণা।

পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম যতবারই উল্লিখিত হয়েছে, তার সবই তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্য মূলক। বৌদ্ধযুগে এই সামুদ্রিক বন্দর যেমন বাণিজ্যে খ্যাতিলাভ করেছিল, তেমনি আবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও সঙ্ঘারামে ছেয়ে গিয়েছিল। তাই এই বৌদ্ধ কবলিত বন্দরকে হিন্দুদের তীর্থস্থান করার মানসে নানারকম কাল্পনিক উপাখ্যান ও কাহিনীর সৃষ্টি করে জনচিত্তকে বুদ্ধধর্ম থেকে সরিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। নিম্নের ঘটনাগুলি এই সত্যেরই পরিচয় দেয়।

দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের রাজসভা। একদিন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন সেই দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সখাকে, হে প্রভো, আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থানে সব সময় বাস করেন? জানতে আমার খুব ইচ্ছে করে। শুনে প্রীতিলাভ করব আমি। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ শুনে বললেন, সখে, তাম্রলিপ্ত ছাড়া আমার অন্য কোন প্রীতিপ্রদ স্থান ভূমণ্ডলে নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল কখনো পরিত্যাগ করেন না, আমিও তেমনি, হে কৌন্তেয়, তাম্রলিপ্ত পরিত্যাগ করতে কখনো পারি না। আমি যুগে যুগে সব তীর্থ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তাম্রলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করতে পারি না। এ তুমি স্থির জেনো।[১]

এবার আমরা ব্রহ্মপুরাণ থেকে যে কাহিনীটি বর্ণনা করব, এই কাহিনীটিতে তাম্রলিপ্তকে 'কপালমোচন তীর্থ' নামে খ্যাত করা হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ।

ব্রহ্মা-তনয় দক্ষপ্রজাপতি। তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। আবার দেবাদিদেব মহাদেবের শ্বশুর। সেই দক্ষপ্রজাপতিকে দক্ষযজ্ঞে হত্যা করেছিলেন মহাদেব। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। ফলে দক্ষশির

১। "পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠী মধ্যে গতোঽর্জ্জনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ ॥
নাথ! ভূতল মধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্রমে প্রীতিরুত্তমা ॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে ॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্যা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তাং হি নত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং ॥
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন ॥"
প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ১৯৯ পৃঃ ও বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠা।

আটকিয়ে গেল মহাদেবের হাতে। মহাচিন্তায় পড়লেন তিনি। কেমন করে এই মহাপাপ থেকে পাবেন নিষ্কৃতি! দেবতারা বললেন পরিভ্রমণ করুন ভারতের সকল তীর্থ। কিন্তু তবুও দক্ষ-কপাল পড়ল না মহাদেবের হাত থেকে। অবশেষে ভোলানাথ হিমালয়ে বসলেন বিষ্ণুর ধ্যানে। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন বিষ্ণু, যেস্থানে গেলে ক্ষণকালের মধ্যে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, বলছি সে স্থানের মাহাত্ম্য। ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাতীর্থ তাম্রলিপ্ত। সে তীর্থে স্নান করলে মানুষ বৈকুণ্ঠে যায়। অতএব সেখানে গেলে পাপমুক্ত হবে তুমি। বিষ্ণুর মুখে তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্য শুনে ভোলানাথ চললেন সেই মহাতীর্থে। বর্তমান বর্গভীমা মন্দির ও জিষ্ণুহরির মন্দিরের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র এক সরসী নীরে নেমে স্নান করলেন মহাদেব। অমনি হাত থেকে দক্ষ-শির হোল বিমুক্ত। দর্শন পেলেন পালনকর্তা বিষ্ণুর। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন —যে মহাপাপ থেকে মুক্ত হলাম আমি, আজ থেকে সেই এই স্থান "কপালমোচন তীর্থ" নামে প্রসিদ্ধি হবে। স্নান করলে এখানে সর্বপাপে মুক্ত হবে মানুষ।[১] "কাল সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতঃপ্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থানটি (কপালমোচন নামক

১। "পুরা দক্ষবধে যস্মাৎ তৎশিরঃ স্বকরে শিবঃ।
দদর্শ তত্তয়ান্মোক্তুং তীর্থযাত্রাঞ্চকারবৈ॥"
"ভূতলে সর্ব্বতীর্থানি পর্য্যটন্ন বিনির্গতং।
তস্মাদ্ভীতো হরোগত্বা স্থিতবান্ গিরিগহ্বরে॥"
"ত্বয়া জ্ঞপ্তং পুরা যস্মাৎ কর্ত্তুং তীর্থাটনং ময়া।
কৃতং তীর্থাটনং তস্মাৎ কস্মাৎ পাপান্নহীয়তে॥"
"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃ পাপাস্তর্গো ভবিষ্যসি॥"
"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থ বরং বসেৎ।

সরোবর) বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে প্রাচীন বিষ্ণু-নারায়ণের মন্দির দণ্ডায়মান ছিল, সে স্থান এক্ষণে 'নদীগর্ভে নিহিত—তথায় অদ্যাপিও বারুণী উৎসবে পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে জনগণ অবগাহন করিয়া থাকে। তমোলুকে প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তি, মাঘী-পূণিমা, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়া, এই চারিবার মেলা হইয়া থাকে।"[১]

এই কপালমোচন তীর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধ আছে। ভারতবর্ষে এই 'কপালমোচন তীর্থ' খুব কম করে হলেও সাতটির অস্তিত্ব আজো পাওয়া যায়। মহাদেব কর্তৃক দক্ষমুণ্ড হস্ত-মুক্ত হওয়ার জন্য একটি আর ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ —অর্থাৎ দেবগণের শক্তিহরণ-মুখ ছেদন করায় সেই মুণ্ডও শিবের হাতে আটকিয়ে যায় ও সেই ব্রহ্ম-মুণ্ড হাত থেকে মুক্ত হওয়ার দরুণ আর একটি "কপালমোচন" তীর্থের সৃষ্টি হয়। মোট এই দুটি তীর্থই প্রধান। ব্রহ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তকে "কপালমোচন তীর্থ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে

তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থ রাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়ঃ॥"
"পুরীং প্রবিশ্যাথ বিলোকনাশ্রয়ং জলাশয়-স্যাশুজগাম সন্নিধিং।
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়চ স্পর্শাৎ শিরোভুমিতলং জগাম॥
ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্ব্বঃ সর্ব্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণুমূর্ত্তিমলোকয়ৎ॥"
"পাপাদ্ যস্মাৎ বিমুক্তোঽস্মি যস্মান্মুক্তং করাৎ শিরঃ।
কপালমোচনং নাম তস্মাদেব ভবিষ্যতি॥"
"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্টা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

১। প্রতিমা, প্রথমখণ্ড, ৩৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা ও রহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম পর্ব্ব, ১৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা।

মায়াপুরে একটি, স্কন্দপুরাণে কুরুক্ষেত্র মধ্যে একটি, প্রভাস খণ্ডে গুজরাটের অন্তর্গত প্রভাস তীর্থের মধ্যে একটি, রেবাখণ্ডে রেবা তীরে একটি এবং উৎকলখণ্ডে উড়িষ্যার মধ্যে কপালমোচন তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোন দুটি তীর্থ প্রধান আজো স্থিরীকৃত হয়নি। বিভিন্ন পুরাণে একই তীর্থ সম্পর্কে এরূপ মতভেদ দেখে মনে হয়, পুরাণগুলি কখনই একই ব্যক্তির রচনা নয়। যদি তা' হোত, তা'হলে একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে এত মতদ্বৈধ কোনক্রমে উপস্থিত হোত না বা স্থান নির্বাচন নিয়ে গণ্ডগোলও থাকত না। বিভিন্ন প্রদেশের লোক মনে হয় বিভিন্ন পুরাণ রচনা করেছিলেন এবং তাদের দেশের মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্য নিজের দেশের দিকে তীর্থগুলিকে টানবার চেষ্টা করেছেন। আজ বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস, জয়দেব ও লাউসেন রাজার গড় নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এও সেই রকমের সমস্যা। তাই এই সমস্যার মীমাংসা করা বড় কঠিন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকালে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বন্দর এবং বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল তাতে পুরাণকাররা যে সহজে এ বন্দরকে এমন একটি বিশিষ্ট তীর্থ থেকে বঞ্চিত করবেন, তা' কোনক্রমেই মনে হয় না। এ প্রসংগে আমরা বর্গভীমা মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

ব্যাসদেব নকল শ্রীক্ষেত্র নির্মাণ করতে গিয়ে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবার সে কাহিনী সংক্ষেপে "তমলুক মঙ্গল" থেকে উদ্ধৃত করছি।

"পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্যাসদেব, দেবতাগণের ছলনায় বারাণসী পার্শ্বে তত্তুল্য দ্বিতীয় কাশীধাম করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিশোধার্থ এই ভীমাদেবীর পার্শ্বে যোজনার্দ্ধ মধ্যে স্বয়ম্ভু শিব স্থাপন করিতে পারিলে, এখানে শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে পারে, ফলে স্বয়ম্ভুদেবের

নিকট বর পাইয়া শিবলিঙ্গ লইয়া আসিতেছিলেন। এরূপ হইলে দৈব ব্যবস্থার বিঘ্ন হইবেক ভাবিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পরামর্শ পূর্বক মহামায়ার আশ্রয়ে ব্যাসদেবের ভ্রম ঘটাইয়া, যাহাতে ঐ শিবলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে না তুলিতে পারেন, তজ্জন্য দেবর্ষি নারদকে কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ মহামায়ার সহায়তায় তাঁহাকে ভুলাইয়া দিক বঞ্চনা পূর্ব্বক ভীমাদেবীর পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ দিকে যোজনার্দ্ধ অন্তরে বর্তমান গো-মায়ী গ্রামে ঐ শিবলিঙ্গ উঠাইয়া ছিলেন। ঐ কারণেই গো + দিক, মায়ী + বঞ্চক অর্থে গোমায়ী নামকরণ হইয়া থাকিবে। উক্তরূপে বঞ্চিত হওয়ায় এইস্থানে জগন্নাথ ক্ষেত্র হয় না।[১]" পৃঃ—১২—১৩।

তমলুক থেকে দক্ষিণ দিকে গোমায়ী গ্রামে দক্ষিণেশ্বর শিব মন্দির আজো বর্তমান আছে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এই গোমায়ী গ্রামের সন্নিকটে মাহিষ্য রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরীর ধনাগার ও রাজধানী ছিল। কল্যাণ রায় চৌধুরী ছিলেন মহিষাদল রাজ্যের রাজা এবং তমলুক রাজ্যের সামন্ত নৃপতি। খুব সম্ভবত ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে এখানে তিনি রাজত্ব করতেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তমলুকের দক্ষিণ পার্শ্বে যে সমুদ্র ভিন্ন জনপদ ছিল না[২], একথা বহু প্রামাণ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। ভূস্তর পরীক্ষা করে ও তমলুকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এই গোমায়ী গ্রাম পূর্বে যে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। বাংলা ১২৫১ সালের মিঃ ফেণী সাহেবের সংগৃহীত ৭২০ খ্রীষ্টাব্দের সুমারী ও কর সংগ্রহের রেয়োদাদেও এর আভাস পাওয়া যায়। অতএব

১ হিন্দুস্থান ও তমালিকা ১৪—৪০ পৃঃ

২ "খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর তমলুকের দক্ষিণ-দিকবর্তী সমুদ্রগর্ভ ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মনুষ্যবাসোপযোগী হওতঃ দোর, মহিষাদল, গুমাই, অরঙ্গীনগর, জলামুঠা, নাড়ুয়ামুঠা, রসুলপুর, বালিযোড়া প্রভৃতি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।" ভগবতীচরণ প্রধান কৃত মহিষাদল রাজবংশ, পৃষ্ঠা ১৭।

গোমায়ী গ্রামের এই ব্যাস প্রতিষ্ঠিত মহাদেব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। মহাদেবের পূর্বমন্দির ভগ্ন হওয়ায় বাং ১২০৮ সালে মহিষাদলের ধর্মপ্রাণা রাণী জানকী দেবী এর স্বয়ম্ভুত্ব পরীক্ষার জন্য তলদেশ সাধ্যাতীত ভাবে খুঁড়েও কোন ঠিকানা না পেয়ে এর উপরে মন্দির নির্মাণ করে দেন। অদ্যাপি সেই মন্দিরই বর্তমান আছে।[১]

গোমায়ী গ্রামে দক্ষিণেশ্বর শিবের এক অংশ বিশেষ ভাবে কর্তিত। প্রবাদ আছে কালাপাহাড় যখন তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের কোন ক্ষতি না করতে পেরে উড়িষ্যার পথে বিজয় অভিযান চালান, তখন এই শিব মন্দিরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইতিহাস থেকে মনে হয় এই শিবলিঙ্গ ১২৷১৩ শত বছরের প্রাচীন। এবং রাণী জানকীদেবী যখন খুঁড়েও এঁর তলদেশ পাননি, এর দ্বারা মনে হয় এটি কোন প্রাচীন সুবৃহৎ স্তম্ভ। কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে এই সুবৃহৎ স্তম্ভটি একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। আজ আর প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধান করেও এ সম্পর্কে কোন স্থির সত্যে উপনীত হওয়ার উপায় নাই। চিরকালই হয়ত ব্যাস-প্রতিষ্ঠিত মহাদেব বলে আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি কুড়িয়ে ও চাল কলা খেয়ে ইনি পরিপুষ্ট থাকবেন।

প্রতি বছর শিব চতুর্দশী ও সংক্রান্তির দিন এখানে বিরাট মেলা বসে। প্রতি সোমবার বহু যাত্রীর ভিড় হয়। মহাদেবের গাত্রসংলগ্ন শক্তির স্থানে সব সময়ই জল থাকে। তার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, মাঝে মাঝে শব্দযুক্ত উচ্চ বুদ্বুদও উঠে।[২] নাকি, অনেক চেষ্টা করেও এই বুদ্বুদ বন্ধ করা যায় না।

এই ঘটনা থেকে মনে হয়, গোমায়ী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের

১ তমালিকা, পৃঃ ১৪।

২ তমলুক মঙ্গল—গিরিশচন্দ্র সরস্বতী

সন্নিকটে হয়ত কোথাও কোন তেলের খনি অনাবিষ্কৃত ভাবে বর্তমান আছে। উপযুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা একান্ত আবশ্যক।

খিল হরিবংশে—হিরণ্যকশিপু বধ প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়।[১] পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ও হরিবংশে উক্ত একই শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়।[২] পদ্মপুরাণে আরো দু'জায়গায় তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বর্ণনা প্রসংগে, কিরাত, ঔড্র, বিদেহ প্রভৃতি নামের সংগে এমনিভাবে সন্নিবিষ্ট আছে—

"কিরাতা বর্ব্বরা সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তিকাঃ।
ঔড্রম্লেচ্ছাঃ সসৈরিন্ধ্রাঃ পার্ব্বতীয়াশ্চ সত্তমাঃ॥" ৫২
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্ম আদিখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

পদ্মপুরাণে আর একস্থানে ব্রহ্ম-রুদ্র ধ্যানেও তাম্রালপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। ধ্যানমন্ত্রে এমনি ভাবে লিখিত আছে—

"কাঞ্চীং কাশীং তাম্রলিপ্তাং মগধান্মালবাং স্তথা।
বৎসগুল্মং চ গোকর্ণং তথা চৈবোত্তরান্কুরূন॥" ১৬৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে
ব্রহ্মরুদ্রাধ্যানাধ্যায়শ্চতুর্দ্দশঃ, পৃঃ ৭৭।

মৎস্যপুরাণেও তাম্রলিপ্তের নাম একাধিকবার পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের

১ "সুরাষ্ট্রশ্চ সবাহলীকাঃ শূদ্রাভীরাস্তথৈব চ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যশ্চ অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥" ৫৫
অষ্টবিংশত্যধিক—দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

২ পদ্মপুরাণম্, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়ে প্রকাশিতম্, ১১০০ পৃষ্ঠা ও শ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদেন সম্পাদিতম্ শ্রীপাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে নরসিংহ প্রাদুর্ভাবোনাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠাঃ ৩১৫।

নাম করতে গিয়ে পুরাণকার তাম্রলিপ্ত রাজ্যের নামও উল্লেখ করেছেন। যথা—

"অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরি।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয় মালবাঃ॥ ৪৪
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্ব-মাগধ-গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৫
চতুর্দ্দশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ[১]

শব্দকল্পদ্রুমে ঠিক উপরি উক্ত শ্লোকটির সহিত আর একটি চরণ অধিক সংযুক্ত হয়েছে। যেমন—

"ততঃ প্রবঙ্গা মাতঙ্গা মলয়া মলবর্ত্তকাঃ।"[৩]

মৎস্যপুরাণের অন্যত্র পাই—

"পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মাগধাঙ্গা স্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রালিপ্তাংস্তথৈব চ॥" ৫০
একবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ[২]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কূর্মকে ভগবানরূপে বিচিত্র করা হয়েছে। সেই কূর্মরূপী ভগবানের বিভিন্ন অংশে ভারতের বিভিন্ন দেশ অবস্থিত। সেই বিভিন্ন অংশ বর্ণনা প্রসংগে মার্কণ্ডেয় পুরাণকার বলেছেন—

"কশায়া মেঘলামুষ্টা স্তাম্রলিপ্তৈকপাদপাঃ।
বর্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥" ১৪
অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ[৪]।

কূর্মের পাদদেশে অর্থাৎ ভারতের শেষ তটরেখায় বঙ্গোপসাগরে তাম্রলিপ্ত অবস্থিত। ঐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতের পূর্বদিকে প্রসিদ্ধ

১, ২, মৎস্যপুরাণম্, বঙ্গবাসীযন্ত্রে মুদ্রিত; পৃঃ ১৫০, ১৬০।
৩ শব্দকল্পদ্রুমঃ পুনঃ প্রকাশিতঃ পৃঃ ১৬৯৯।
৪ মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, পৃঃ ১০০।

জনপদ সমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাম্রলিপ্তের নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধ গোমন্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ ॥" ৪৪

পণ্ডিত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতাতেও তাম্রলিপ্তের নাম, কোশল, গিরিব্রজ, মগধ, পুণ্ড্র, মিথিলার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—

"আপ্যেঽঙ্গ-বঙ্গ-কোশল-গিরিব্রজা মগধ-পুণ্ড্র-মিথিলাশ্চ।
উপতাপং যান্তি জনা বসন্তি যে তাম্রলিপ্ত্যাঞ্চ ॥" ১৪
শনৈশ্চর চারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।[২]

বৃহৎ সংহিতার অন্যত্র পাওয়া যায়—

"উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পোণ্ড্রোৎকল-কাশি-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ" ॥ ৭
কূর্মবিভাগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ[৩]

জ্যোতিস্তত্বে আছে—

"প্রাচ্যাং মাগধশোঽর্ণা চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাদয়াশ্রয়ঃ ॥"[৪]

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ৪।৫টি পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম পরিদৃষ্ট হয়। বাকি আর অন্য পুরাণগুলিতে তাম্রলিপ্তের নাম নাই। আমরা এই অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছিলাম, পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করার জন্য এবং

১ মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ, পৃঃ ৯৯।
২ বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত ; পৃঃ ৩১
৩ বৃহৎসংহিতা, ঐ পৃঃ ৪০।
৪ স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টচার্য্যেন বিরচিত অষ্টবিংশতি তত্বানি, ২৯৭ পৃষ্ঠা ও শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিতঃ পৃষ্ঠা ২৪৬০।

বৌদ্ধপ্রধান স্থানগুলি হিন্দুদের ভগবানের প্রাচীন লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা নানারূপ কাল্পনিক কিংবদন্তীর সৃষ্টিও করেছিলেন। সেই কিংবদন্তী-অধ্যুষিত স্থানগুলি আজো হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে। আমার মনে হয় এই পুরাণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা খুব অল্পই আছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পুরাণগুলিতে যেরূপভাবে তাম্রলিপ্তের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকালে যে খুব সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাণে বর্গভীমা দেবীর সম্পর্কে অনেক কথা আছে, সে সব আলোচনা এই অধ্যায়ে করলাম না। বর্গভীমার মন্দিরের আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে এর সূত্রপাত করা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ যুগ

তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই যুগেই তাম্রলিপ্তের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন ভ্রমনকাহিনী পাঠ করে তাম্রলিপ্তের প্রতি অধিক কৌতূহলী হন। ভারতের পূর্ব উপকূলে কোথায় তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল তা' অনুসন্ধান করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বৌদ্ধযুগেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্রমণকারক ও ধর্মপ্রচারকগণ ভারতে আসেন এবং ভারত থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে গমন করেন। ভারতীয় নাবিকগণ শুধু শ্যাম, বালি, সিংহল, যবদ্বীপ ও চীন দেশে নয় সুদূর আমেরিকা, গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বাণিজ্য করার সংগে সংগে উপনিবেশ স্থাপনও করেছিলেন। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধপূর্ব যুগ ছিল ভারতের এক গৌরবময় যুগ। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকেই প্রমাণিত হয় খ্রীষ্ট জন্মের বহু শত বছর আগে তাম্রলিপ্তবাসিগণ দুর্দান্ত নাবিক ও রণনিপুণ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। কলম্বাসের বহুপূর্বে ভারতীয় নাবিকগণ যে আমেরিকা আবিষ্কার করে সেথায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তার প্রমাণ আজ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ৩২৬ বছর পূর্বে বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁর সেনাপতি নিয়ারকস্ যখন আসেন, তখন তিনি ইউফ্রেটিস্ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত একখানিও অর্ণবযান দেখতে পাননি। কেবল কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক জেলেডিঙ্গী (fishing boat) দেখেছিলেন[১]।

১ Vide cowell's Elphinstone's History of India, book III, ch, x. P. 183.

যখন হিপ্‌পালাস (Hippalus) লোহিত সাগরের মুখ থেকে বেরিগোজা ও মুসিরিস্ পর্যন্ত সোজাসুজি পার হতে সাহস করেন নি, তার বহু পূর্ব থেকেই ভারতের অর্ণবযানসকল বঙ্গোপসাগর দিয়ে, সিংহল, বর্মা, মালাক্কা ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যাতায়াত করত। গ্রীক, রোমান জাহাজ তখনও উল্লিখিত স্থানে যায়নি। আরবগণও মহম্মদের জন্মের পূর্বে ঐ সকল স্থানই জানতেন না।[১]

এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে পূর্ব উপকূলের নাবিকগণই একমাত্র বিদেশে ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় প্রাচীন কালে পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্ত ছিল একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর। কলিঙ্গ ছিল তখন তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত। আর এই কলিঙ্গবাসিরাই খৃঃ পূর্ব ৭৫ অব্দে যবদ্বীপে গমন করে, সেখানে একটি অব্দের প্রচলন করেন। সে অব্দ এখনো তথায় প্রচলিত আছে। এ বৃত্তান্ত জানা যায় যবদ্বীপের ইতিহাস পাঠ করলে। যবদ্বীপে যে হিন্দুদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তার বহু প্রমাণ আজও পাওয়া যায়[২]।

ভারতীয় বণিকগণ কেবলমাত্র ভারত মহাসাগরেই বাণিজ্য করে যে সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়। "কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন নাই, অথবা আরবগণ আমেরিকার সন্ধান পর্যন্ত জানিতেন না, তাহারও বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতীয় বণিককুল বাণিজ্য ব্যপদেশে আমেরিকায় গিয়া হিন্দুসভ্যতা বিস্তার ও ইন্দ্রপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্য আমেরিকায় যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদির

১ "Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, directly across to Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malaca, and to Sumatra. No Greek or Roman ship visited those places. No Arub settlers were found there prior to the birth of Mohamed. The earth in these quarters was unknown to them." Mookerjee's, Magazine June, 1873, P. 270.

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৭৪—৭৫।

ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সকলের গঠনপ্রণালী সর্বাংশেই দক্ষিণ ভারত ও ভারতমহাসাগরীয় অম্বুদ্বীপস্থিত হিন্দুমন্দিরের অনুরূপ[১]। ভারতবর্ষে পাহাড় কাটিয়া যেরূপ মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে মেক্সিকোর সিৎল নামক স্থানে তদনুরূপ প্রস্তর মন্দির সকল দর্শন করিলে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুগণ সমুদ্র পরপারস্থ সেই অতি দূরবর্তী মহাদেশে যাইয়া ভাস্করবিদ্যার বিরাট নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছেন। তথায় প্রস্তরখোদিত বহুতর দেবদেবীর মূর্তিও বাহির হইয়াছে, তাহা অনেকাংশেই এ দেশীয় হিন্দু দেবদেবীর মত। দক্ষিণ আমেরিকার টিটি-কাকা হ্রদের তীরেও ভারতীয় শিল্পচাতুর্য প্রকটিত রহিয়াছে। মেক্সিকোবাসীরা গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্বে হস্তী পাওয়া যাইত না, সে দেশে কখনই এরূপ মূর্তি কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দু বণিকদিগের নিকট হইতেই তাঁহারা সিদ্ধিদাতা-গণেশমূর্তি পাইয়াছিল। এখনও কম্বোজ, শ্যাম, যব, বালি প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপসমূহে নানাবিধ গণেশমূর্তি দৃষ্ট হয়, এতদ্দারা অনুমিত হয় যে হিন্দুরা কম্বোজ বা যবদ্বীপাদি হইতে আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন।

আমেরিকায় সকল জাতি অপেক্ষা ইঙ্ক জাতিই শ্রেষ্ঠ। ইঙ্ক দিগের প্রাচীন বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, মঙ্ক নামক প্রথম ইঙ্ক"ইস্তির" আদেশে টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন। তিনিই অসভ্য জাতিগণকে সুসভ্য করিয়া ইঙ্ক রাজ্যে স্থাপন করেন। এই বংশীয় সকলেই আপনাদিগকে সূর্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।[২]

---

১ Squirel's Serpent Symled.

২ দক্ষিণ আনাম্ হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিসমূহে "ইন্দ্র" উপাধিধারী বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (De Guignes) এই 'ইন্দ্র' উপাধিকে অপভ্রংশে 'ইস্তো' বা 'ইস্তি' নামে উল্লেখ করেছেন। এরূপ স্থলে আমেরিকার 'ইস্তি' ও সংস্কৃত 'ইন্দ্র' অভিন্ন বলে মনে হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, পৃঃ ৭৫—৭৬।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক ঐতিহাসিক তাসিতাস উত্তর প্রদেশের ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। পরে তাঁর বন্ধুবর প্লিনি এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ অব্দে কতকগুলি ভারতবাসী বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে এসে বাত্যা-বিতাড়িত হয়ে জর্ম্মণ-উপকূলে পতিত হয়েছিলেন, তখন সুএবীয়রাজ তাঁদের উপহার স্বরূপ গলের প্রধান শাসনকর্তা মেটেলাসের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন ।[১]

তাসিতাসের অনুবাদক মার্কি সাহেব প্লিনির এই বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, কর্ণোলিয়া নেপোস্ (তাসিতাস) সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে যে বিস্তৃত বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, প্লিনি তা' সংক্ষিপ্ত ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যদি মূল গ্রন্থখানি পাওয়া যেত, তা'হলে সমুদ্র-বাণিজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস পেতাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বর্তমান তমলুকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্বিক বস্তু সমূহের আলোচনা করে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারব যে সেই সুদূর অতীতকালে সত্যসত্যই তাম্রলিপ্ত-বাসিগণ এইসব দেশে গিয়ে বাণিজ্য করেছিলেন। তমলুকে এমন সব জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, যার প্রাচীন মিশর, গ্রীস, ও সুদূর আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের আবিষ্কৃত জিনিসের সাথে প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য আছে।

আমরা এখন প্রাচীন ভ্রমণকারী ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে সব জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়, তাই আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। তৎপূর্বে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ থেকে একটি শ্লোক নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন, কালিদাস রঘুর

১ Carnelius Nepos de Septentrionali circuitu tradit quinto Metello celeri, Lucii Afranii in consulatee collegæ, sed tum Galliæ, Procunsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii causa navigantes, tampestatibus essent in Germanian abrepit." Pliny, lib, ii. S. 67.

দিগ্বিজয় বর্ণনা করতে গিয়ে কপিশা ও সুহ্মদেশের নাম করেছেন। বলা বাহুল্য রামায়ণের কালে কালিদাস বর্ণিত স্থানসমূহ বর্তমান ছিল এমন কোন প্রমাণ আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তা'ছাড়া কালিদাস বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১] তাই আমরা রঘুবংশকে বৌদ্ধযুগের মধ্যে ধরলাম। শ্লোকটি এই—

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥ ৩৫।
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৬॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৭॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥ ৩৮॥

(চতুর্থঃ সর্গঃ)

অর্থ:—বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্য-দেশ-সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলা-ভূমিতে উপনীত হইলেন॥ ৩৪॥

১ কালিদাসের জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু মতভেদ আছে। তিনি কোন সময়ে ও কোন বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, তা স্থির করে বলা বড় শক্ত। ঐতিহাসিক ম্যাকডোনেল বলেন—"But as to the date of the most famous classical poets, Kalidasa, Subandhu, Bharabi, Gunadhya, and others, we have no historical authority." ম্যাকডোনেল সাহেবের এরূপ উক্তির কোন মানে হয় না। অন্যভাবে অনেক চেষ্টায় কালিদাসের সময় সম্পর্কে যে মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা' সংক্ষেপে এই। এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রক্ষিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে

বেগবতী প্রবাহিনীর খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছ্রিত বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু আনতকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে, তাঁহাদের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশসমূহের যে নামাবলী ক্ষোদিত আছে, তার কতকগুলি দেশের নামের সাথে কালিদাসের রঘুবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট রঘুর বিজিত দেশসমূহের নাম হুবহু মিলে। অথচ যে মহাকাব্যের ঘটনা নিয়ে রঘুবংশ রচিত, সেই বাল্মীকি রামায়ণে রঘুরদিগ্বিজয়ের নামগন্ধও নাই। কালিদাসের কাল সম্বন্ধে চারটি মত প্রধান। (১) খৃষ্টজন্মের ৫৬ বৎসর পূর্বে (২) খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক (৩) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক (৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কতক এবং ষষ্ঠ শতকের কতক অংশ। এই চারটি মতের মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকই প্রমাণ বাহুল্যে অধিকতর বলিষ্ঠ। তাঁকে অনেকেই খৃষ্টীয় শতকের লোক বলে মনে করেন; কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, কালিদাস পঞ্চম শতকে জন্মগ্রহণ করে গুপ্তগণের মালবরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৮০ শতকে গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে উজ্জয়িনী জয় করেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেননি। খ্রীষ্টিয় ৪১২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি ৪ শত ৫৫ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ, অর্থাৎ চারশত তিন, চার বা পাঁচ সাত, অব্দ থেকে কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল অর্থাৎ ৪৫৫ অব্দ পর্যন্ত এবং হয়ত বা স্কন্দগুপ্তেরও রাজত্বের কিছুকাল পর্যন্ত উজ্জয়িনীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। কালিদাস প্রশস্তি, পৃঃ ১—৩)

তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় (রোয়া ধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর রঘু গজ-নির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গ-ভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন[১] ॥ ৩৭ ॥

৩৪ শ্লোকের 'তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলাভূমি' এই কটি শব্দের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় পূর্ব ভারতের একেবারে শেষ সীমায় সাগরের কাছে যে দেশ বা উপকণ্ঠ সেখানে এসে দিগ্বিজয়ী রঘু উপস্থিত হয়েছিলেন। তৎকালে পূর্বভারতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শতকে তাম্রলিপ্তই ছিল একমাত্র সমুদ্র উপকূলে বিখ্যাত বন্দর। এর পরের শ্লোকে উপমার দ্বারা সুহ্ম দেশীয় নরপতিদের পরাজয়ের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, সে উপমাটি এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে "উপমা কালিদাসস্য" এই প্রবাদ বাক্যকে সার্থক করেছে। দশকুমার চরিতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—"অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।" এর দ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে সুহ্মদেশেই ছিল দামলিপ্তী বা তাম্রলিপ্ত নগর। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়-দেশকে সুহ্মদেশ বলে নির্দেশ করেছেন। পাণ্ডু এই দেশ জয় করেছিলেন (মহাঃ আদিঃ অঃ ১১৩) কিন্তু বৃহৎ-সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশের মধ্যবর্তী ভূভাগকেই সুহ্ম নামে কীর্তিত করা হয়েছে। মৎস্য-পুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে কলিঙ্গ এবং সুহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দু'টি পৃথক রাজ্য

---

১ কালিদাস-গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৬ সাল, পৃঃ ৪৭—৪৯।

বলা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্বে ২৯ অধ্যায়ে এবং মৎস্য পুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্তকে দু'টি পৃথক দেশরূপে দেখা যায়। পঞ্চনদের অন্তর্গত সুক্ষনামে আর একটি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। অর্জ্জুন এই দেশ জয় করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর আত্মজ বালির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র ছিলেন, তাঁদের নাম অনুসারেই পুরাকালে পাঁচটি দেশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সব বিভিন্ন মতবাদ থেকে মনে হয় বাংলা দেশের কোন না কোন স্থান প্রাচীন কালে সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল এবং এই দেশ কখনো স্বাধীন এবং কখনো বা আশ-পাশের কয়েকটি ছোট বড় দেশ একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এবং কালিদাস-এর উক্ত শ্লোক থেকে বেশ বোঝা যায় সুহ্মে বিভিন্ন ভূখণ্ডের রাজন্যবর্গ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। পরবর্তী শ্লোক অর্থাৎ ৩৬ শ্লোকের দ্বারা বাংলার তৎকালীন নৌবহর যে কি বিরাট ও শক্তিশালী ছিল, তা' উপলব্ধি করতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ডে ২১০ ও ২১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধপটু ছিল; এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।"

আজকে আমরা বাংলা দেশ বলতে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝি তৎকালে কিন্তু বাংলা দেশ এত বৃহৎ ছিল না। প্রাসদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদাজির মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মানদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগই বঙ্গ নামে পরিচিত। মহাভারতের সময়েও বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্ত এই তিন দেশ থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দেশ ছিল। (মহাঃ সভাঃ অঃ ২৯।) প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউ এন্-স-সঙ্গ

যখন এদেশে থাকেন, তখন বঙ্গ দেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যথা (১) পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ (২) সমতট বা পূর্ববঙ্গ (৩) কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ (৪) তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ (৫) কামরূপ বা আসাম। খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হওয়ার পরে, বঙ্গদেশ চারটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। বল্লালসেনই এই বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তরদিগ্‌বর্তী ভূভাগ বারেন্দ্র এবং বঙ্গ, আর দক্ষিণদিগ্‌বর্তী ভূভাগ রাঢ় এবং এবং শাখা জলাঙ্গী নদী কর্তৃক বিভক্ত। মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী বরেন্দ্রভূমিই প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ, বঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ, ভাগীরথীর পশ্চিমদিগ্‌বর্তী রাঢ়দেশ কর্ণসুবর্ণ এবং বাগ্‌ড়ি দক্ষিণবঙ্গ-রূপে বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক নির্ণীত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ৭৩২ শতকে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, দেবীবর ঘটকের মতে ঐ সময়ে বঙ্গদেশ রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং গৌড় এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের প্রথম নির্দেশ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় ১৩শ শতকেও বঙ্গ দেশ "বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হয়।

৬২৯ শতকে হিউয়েন সাঙ. ভারতে এসেছিলেন। তখন বাংলা দেশে 'বঙ্গ' নামে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। এদিকে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠ শতকের কিছু অংশ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এমতাবস্থায় কালিদাস বঙ্গ বলতে যে কোন ভূভাগকে নির্দেশ করেছেন, তা' বলা বড় শক্ত। বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে। তবে একথা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নদীমাতৃক বাংলা দেশের যে অঞ্চলকে কালিদাস "বঙ্গ" বলে অভিহিত করেছেন, সে বঙ্গদেশ ছিল সমুদ্রের সন্নিকটে। কেন না রঘু গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। নদীর মোহনা ছাড়া দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয় না ইহাই ভৌগোলিক সত্য।

এদিকে যে বিরাট নৌবহরের কথা কালিদাস বলেছেন, তা প্রাচীন বাংলা দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে তাম্রলিপ্ত, সমতট, রাজমহল, সপ্তগ্রাম, ভূরীশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রকেতুগড়, পাণ্ডুয়া এবং কমলাঙ্কে (কুমিল্লা) ছিল। তাম্রলিপ্ত আর সমতট (বাগেরহাট) থেকেই একমাত্র সমুদ্রগামী জাহাজ সকল যাতায়াত করত। এরদ্বারা মনে হয় কালিদাস সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত কোন ভূভাগকেই বঙ্গদেশ বলে অভিহিত করেছেন।

এবার ৩৭ শ্লোক নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এই শ্লোকটি এমনভাবে লিখিত হয়েছে যে কালিদাসকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞ বলে প্রমাণিত করেছে। কালিদাসের কাব্যরাজিতে এমন কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় তিনি বোধহয় বাঙালী ছিলেন। কোন কোন দুঃসাহসিক ঐতিহাসিক কালিদাসকে বাঙালী বলে অভিহিত করতেও ভয় পাননি। এ সম্পর্কে কিছু মতামত দেওয়ার পূর্বে শ্লোকটি তর্জমা করে দেখি আসুন। "উৎখাত-প্রতিরোপিত।" সোজা কথায় তুলে আবার লাগান। বাংলা দেশে যাকে রোয়া চাষ বলে এ হোল তাই। ঘন ভাবে তলা ফেলে যখন সেই চারা বড় হয়, তখন আবার তাকে তুলে নিয়ে ৩।৪টি চারা এক সংগে যুক্ত করে 'গোছ' অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে লাগানকে রোয়া বলে। কিছুদিন পরে, ধানের ভরে গাছগুলি একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বঙ্গের এই প্রধান এবং নিজস্ব বস্তুর সাথে দর্শনপটু কবি, পরাজিত, এবং বশ্যতা স্বীকার করায় পুনরায় রঘু কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রতিরোপিত নৃপতিদিগের তুলনা করেছেন। এ তুলনা যে কত সুন্দর, কত হৃদয়গ্রাহী ও যথার্থ হয়েছে তা' বলে বুঝান বড় কষ্টকর। কবি একথা মনে রেখেছেন, তিনি রঘুকে নিয়ে এসেছেন বাংলা দেশে, যে দেশ হোল কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ। তাই তিনি এই বাংলাদেশের অতি পরিচিত বস্তু নিয়েই উপমা আহরণ করেছেন। এ একমাত্র প্রতিভাবান কবি ছাড়া তাই বা

বলি কেন কালিদাস ছাড়া সম্ভব নয়। সাধারণ পাঠক যদি ভাবেন এমন একটি জিনিসের সাথে আবাল্য পরিচিত না থাকলে কখনো সাহিত্যে প্রয়োগ সম্ভব নয়, তা'হল সে অনুমান ভুল হবে বলে মনে হয় না। "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস" লেখক ধনঞ্জয় দাস মজুমদার মহাশয় তাঁর প্রণীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডে পৃঃ ৭৪—৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"অনেক পণ্ডিতের মতে মহাকবি কালিদাস বাঙালী ছিলেন, কারণ কালিদাস নাম একমাত্র বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল বা আছে। তাহার রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা—

"দূরদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমাল তালিবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥"

এতদ্বারা সততঃই মনে হয় যে, কালিদাস খেজুরী থানার খেজুরী ডাক-বাংলার কাছে গঙ্গার সন্নিবিষ্ট শ্যামল, তমাল ও তাল, নারিকেল তরুগণের সবুজ শোভায় নীলাকাশের নীচে বসিয়া শরৎকালের স্বচ্ছ-নীল-লবণাম্বুর ঢেউ দেখিতে দেখিতে এই পদ্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কালিদাসের সময়—তাম্রলিপ্তে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াই ইহা লিখিয়াছিলেন। এইরূপ দৃশ্য ভারতের আর কোথাও নাই এবং এই দৃশ্য না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না।"

এই দুঃসাহসী ঐতিহাসিককে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না। অনেক পণ্ডিত নাকি কালিদাস বাঙালী বলে মনে করেন। লেখক সেই সব পণ্ডিতদের এক জনেরও নাম উল্লেখ করেন নি বা তাঁদের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আলোচনারও সূত্রপাত করেননি। এরূপ একটি নতুন তথ্য পরিবেশন করতে হলে যেরূপ প্রমাণ ও তথ্যের প্রয়োজন তার একটিও লেখক দেননি। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন কালিদাস চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক। অথচ যে খেজুরী থানার ডাক বাংলার কাছে বসে তিনি রঘুবংশ লিখেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা' মাত্র ১৫৫৩

খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছে। তখনো মনুষ্যবাসের কোন চিহ্নই সেখানে নেই। লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, তা'হলে কালিদাস মাত্র চারশত কি সাড়ে চারশত বছর আগে বর্তমান ছিলেন বলে মনে করতে হয়। খেজুরী যে অত্যাধুনিক স্থান তা ডিব্যারার মানচিত্র দেখলেই স্পষ্টই বোঝা যাবে। ডিব্যারো মানচিত্রে (১৫৫৩) বর্তমান কস্‌বা-হিজলী পরগণা স্থানে একটি দ্বীপ উৎপন্ন হচ্ছে ইহাই সূচিত হয়েছে। ব্লেভের মানচিত্রেও (১৬৬০) হিজলী দ্বীপাকারে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। ভ্যাণ্ডেন্‌ব্রুক্‌ (প্রায় ১৬৬০) ও বৌরির (১৭৮৭) মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপরূপে চিহ্নিত আছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের জর্জ হিরোণের মানচিত্রেও এই দুটি দ্বীপ স্পষ্টই বর্তমান দেখা যায়। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকের মানচিত্রে এই দু'টি দ্বীপ অঙ্কিত আছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হুইট্‌চার্চের এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বোল্টের মানচিত্রে এই দু'টি দ্বীপের অবস্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুদ্র নদী দ্বারা এই দ্বীপ দুটি স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত "হিজলীর মসনদ্‌—ই—আলা"র দ্বিতীয় সংস্করণ-এর ২৭—২৮ পৃঃ পাঠ করে দেখতে অনুরোধ করি।

লেখক শেষে তাম্রলিপ্ত কালিদাসের রঘুবংশের পটভূমি বলে যে অনুমান করেছেন, সে সম্পর্কেও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে তাম্রলিপ্তে কালিক নামে একজন খুব বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের। ষোড়শ স্থবিরের মধ্যে কালিক ছিলেন একজন। এঁর সম্বন্ধে যথাস্থানে সময়ে আলোচনা করা হবে।

কালিদাসকে বাঙালী বলে গ্রহণ করতে হলে যে সব প্রমাণের প্রয়োজন, তা' যতদিন আবিষ্কৃত না হচ্ছে, ততদিন জোর দিয়ে কিছু বলা মানে দুঃসাহসী করা। কবি হলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ।

বাংলা দেশের পরিচিত কিছু দেখলেই যদি বাঙালী হয়ে যান তা'হলে "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও "পদ্মা নদীর মাঝি" পড়ে মাণিক বন্দ্যোধ্যায়কে আমরা কি মনে করব? মহাকবি কালিদাসের জীবনী আজো সাধারণের কাছে অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। তাই এ সম্পর্কে কোন কিছু মতামত ব্যক্ত করা আমার মত নগণ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৮ শ্লোকে কপিশা নদীর নাম পাওয়া যায়। এই কপিশা নদীর উপরে গজ-নির্মিত সেতু প্রস্তুত করে তার উপর দিয়ে তিনি উৎকল দেশে উপনীত হয়েছিলেন। এই কপিশা নদী নিয়েও পণ্ডিতদের নানা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্ত্তমান সুবর্ণরেখা নদীর প্রাচীন নাম ছিল কপিশা। কিন্তু মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী বর্ত্তমান কাঁসাই নদীকেও অনেকে 'কপিশা' বলে থাকেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও এই কথা বলা হয়েছে। এক সময়ে গান্ধার (কান্দাহার) রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 'কপিশা' কিন্তু সে কপিশার সাথে আমাদের বর্ত্তমান কপিশার কোন সম্বন্ধ নাই। (N. L. D)

রঘুবংশের উক্ত শ্লোকগুলি নিয়ে আমরা যে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম, এখানে এরূপ আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ উক্ত শ্লোকগুলির কোথাও তাম্রলিপ্তের নাম সংযুক্ত নাই। তবে রঘুরাজ যে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না কালিদাসের বর্ণনানুযায়ী তাম্রলিপ্তের একদিকে গঙ্গা, একদিকে সমুদ্র ও আর দিকে কপিশা নদী পারেই উৎকল ও কলিঙ্গ দেশ। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয় তৎকালে উৎকল ও কলিঙ্গ নামে দু'টি পৃথক দেশ বর্ত্তমান ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান তথাগত বুদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর আর্য্যাবর্তের বিভিন্ন স্থানে ৪৫ বছর ধরে করেছিলেন তাঁর সংধর্ম প্রচার। তারপর খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৮৩ অব্দে আশী বৎসর বয়সে

কুশী নগরে পাবা নামক স্থানে দু'টি শাল বৃক্ষের মাঝে হিরণ্যবতী নদীর তীরে লাভ করেন মহাপরিনির্বাণ। বুদ্ধদেবের নির্বাণের তারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি ৮১ বছর বয়সে উক্ত স্থানে ৪৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমাধিস্থ হন।

যখন তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন, তখন ইন্দ্রকে ডেকে বললেন, "আজ বিজয় লঙ্কা দ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।" (বাংলার গৌরব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৩, আশ্বিন, বঙ্গ প্রসঙ্গ থেকে)।

এই বিজয় সিংহ ছিলেন বাংলা দেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে সিংহবাহু সিংহপুরে রাজত্ব করতেন। সিংহপুর বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার অধীন সিঙ্গুর নামক সহর। (হুগলী জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৫৯)

এই সিংহবাহুর "বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেলো"। রাজা সাত শ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্র যাত্রা করিল। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারী দ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরার্ক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকা চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল।" (প্রাচীন বাংলার গৌরব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গ-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১২০-১২১)

এরপর শাস্ত্রী মশায় মন্তব্য করেছেন—“সাতশ লোক যে নৌকায় যায় সেত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পুর্বে বাংলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, স্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটি ত এখনো আছে. তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত চৌদ্দ শ’ বৎসর হইয়া গিয়াছে।…তাম্রলিপ্তি বা বাংলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শোনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার ‘নাবধ্যক্ষ’ থাকিতেন, তিনি “সমুদ্রযানেরও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।” (ঐ, পৃঃ ১২১-১২২)

দশকুমার চরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হয়েছে। এই দশকুমার চরিতে তাম্রলিপ্তি নগরীর বিবরণ আছে তা’ আমরা পূর্বেই দু’এক জায়গায় বলেছি। সেখান থেকে অনেক পোত বঙ্গসাগবে পাড়ি দিত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি থেকে এক বিরাট পোতে চড়ে দূর সমুদ্রে যাচ্ছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁর পোতকে ডুবিয়ে দেয়। ‘রামেষু নাম্নো যবনস্য’ পড়ে ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূপ ছিল।

॥ অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও তাম্রলিপ্ত ॥

মহামতি ধর্মাশোক পূর্ব জীবনে চণ্ডাশোক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ভীষণ দুর্দান্ত ছিলেন। পিতার জীবিত-কালে তিনি পাঞ্জাবের প্রান্তদেশে এক দুর্দান্ত অধিবাসীদের নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেন। এবং পিতার কাছ থেকে জোরপূর্বক সিংহাসন অধিকার করে নেন। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের চার বছর পরে খৃঃ পূঃ ৩১৯-২০ অব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়।

সিংহাসনে আরোহণের ত্রয়োদশ কি অভিষেকের নবমবর্ষে তিনি কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেন। এই প্রদেশ তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ-রাজ বড় সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। মেগাস্থিনিস্ বলেন, তাঁর ৬০,০০০ হাজার পদাতিক, ১ হাজার অশ্বারোহী, ৭ শত রণহস্তী ছিল। এই যুদ্ধনিপুণ রাজাকে পরাজিত করতে অশোক বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। কলিঙ্গবাসীগণ দুর্দান্ত বীর ও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করে তবেই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী ও এক লক্ষ সৈন্য নিহত এবং বহু সৈন্য অনাহার ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ভীষণ দৃশ্যে অশোকের বিবেকে নিদারুণ আঘাত লাগে এবং তাঁর হৃদয়ে অনুশোচনা, মর্মান্তিক দুঃখ ও মনস্তাপের ভীষণ অগ্নি জ্বলে উঠে। তখন তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্র—শ্মশানক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন এমন লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে একমাত্র রাজ্যলোভে আর কখনো প্রবৃত্ত হবেন না। কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রেই চণ্ডাশোক ধর্মাশোক লাভের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন।

যে কলিঙ্গবাসীগণ দুর্দান্ত অশোককে ধর্মপথে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ী ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যে। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর প্রণীত বৃহৎ বঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডের এগার শত পৃষ্ঠায়

এ সম্পর্কে বলেছেন—"অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন—সেই কলিঙ্গের সৈন্যগণ বোধ হয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইঁহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন।" হিউয়েন সাঙ বলেন তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকের অনুশাসন স্তম্ভ দেখেছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অনুশোচনা দুর্দান্ত কলিঙ্গবাসী-দিগকে কতকটা নিরস্ত করেছিল।

দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের এই অনুমানের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী দেশ সমূহকে তৎকালে "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ" বলিত। প্লিনি লিখেছেন—"গঙ্গানদীর শেষ ভাগ 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।** গঙ্গারিডির প্রধান নগর 'গঙ্গে' ভারতের প্রধান বন্দর ছিল।" 'পিরিপ্লাস ইরিথ্রিমেরি' নামক [খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে—"গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি হইত।" খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ভৌগোলিক টলেমি বলেন—"গঙ্গার মোহনা সমূহের সমীপবর্তী প্রদেশে 'গঙ্গারিডি'গণ বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা গঙ্গে নগরে বাস করেন।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হয়, গঙ্গারিডি তৎকালে তাম্রলিপ্ত প্রদেশবাসীকেই বোঝাত। আর এই তাম্রলিপ্তবাসীগণ যে তৎকালে খুব বীর ছিলেন তারও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। গঙ্গারিডি বীরগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম সম্রাটের নিকট বীরত্ব প্রদর্শন করে জগতকে বিস্মিত করেছিলেন। মহাকবি ভার্জিল (জার্জিকস্ কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায়) লিখেছেন। যার বাংলা তর্জমা হোল—"তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেন্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্মর প্রস্তরের একটি মন্দির নির্মাণ করিবেন এবং মন্দিরের দ্বার ফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্ত দ্বারা গঙ্গারিডিগণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।"

মহাকবি ভার্জিল যে গঙ্গারিডিগণের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় এমন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই প্রাচীন গঙ্গারিডিগণের বংশধরগণ আজো এইসব অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শক্তিশালী জাতি বলে পরিগণিত হয়ে আসছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরবাসিগণ যে অপূর্ব বীরত্ব, শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা' দেখে মনে হয় এই জাতির পূর্বপুরুষগণের বীরত্ব সত্যই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ছিল। সম্প্রতি একটি প্রাচীন বংশের বংশাবলী সহ ইতিহাস উদ্ধার করেছি। তাতে যে অপূর্ব বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তা' যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করব।

অশোক তাঁর কলিঙ্গ বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ কলিঙ্গদেশের প্রান্ত সীমা তাম্রলিপ্ত নগরীতে স্থাপন করেছিলেন। যে স্তম্ভ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্গ দেখে গিয়েছিলেন, তার কোন অস্তিত্ব আজ আর বর্তমান নেই। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হিউয়েন-সাঙ্গের ভ্রমণ বৃতান্ত প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হবে।

বৌদ্ধগ্রন্থ "মহাবংশ" পাঠ করে জানা যায়, "খ্রীষ্ট জন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্বে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র কূলবর্তী একটি বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল[১]।"

সম্রাট অশোক নিজে একবার তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন। "সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থের একটি গল্পে দেখিতেছি সম্রাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য নিজে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত আসিয়া সেই বন্দরে তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গয়া হইতে স্থলপথে বিন্ধ্যপর্বত (ছোট নাগপুরের

১। মহাবংশ, ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষ ৬৮৯ পৃষ্ঠা।

পাহাড়) অতিক্রম করিয়া আসিতে তাঁহার ঠিক সাতদিন লাগিয়া ছিল।' বাংলার ইতিহাস, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৬৯।

মহারাজ ধর্মাশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য যে দূত পাঠিয়ে ছিলেন, তাঁরা এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসে জাহাজে আরোহণ করে ছিলেন।[২]

অশোকের রাজত্বকালে যখন চতুর্দিকে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হোচ্ছিল, সেই সময় অশোকের ভ্রাতা বা পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলের রাজা তিষ্যের অনুরোধে ২৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সিংহল দ্বীপে গমন করে ছিলেন। তখন ভারতবর্ষ থেকে সিংহল, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে যেতে হোলে তাম্রলিপ্ত একমাত্র বন্দর ছিল। অশোক পুত্র মহেন্দ্র ও বিস্তর ভিক্ষুবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে ঐ বন্দর থেকেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন। (Pilgrimage of Ea-Hian, Ch. XXVIII. P 53)

"ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে (Archipelago) যবনগণ যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট প্রথম শতাব্দীতে তমলুক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেন।" (Hunter's Orissa, Vol. I. P. 310).

বুদ্ধদন্ত ও তাম্রলিপ্ত

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তমলুক দিয়ে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্তখণ্ড সিংহলে প্রেরিত হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠা বংশ পাঠ করে এ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় দন্তপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের একটি নগর। বৌদ্ধাধিকারের প্রাধান্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পূর্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। কলিঙ্গরাজ

২। Pilgrimage of Fa-Hian, ch. XXXVII, P. 331. and Lethleridge's History of India.

ব্রহ্মদত্তের সময় এই স্থানে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত ও তদুপরি মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম "দন্তপুর" বা "দন্তপুরী" হয়।

ক্ষেম নামে বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটি দন্ত সংগ্রহ করেন। তিনি এই দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্মাণ করান, দহগোব নির্মাণ করান নাই। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে গুহশিব নামে এক রাজা হন। গুহশিব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির পূজক ছিলেন। একদিন রাজধানী দন্তপুরে দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটালপুত্ররাজ পাণ্ডুরাজকে জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডুরাজ জনৈক অধীন নৃপতি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত চৈতন্য নামক জনৈক সামন্ত নৃপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। চৈতন্য দন্তপুরে গিয়া দন্তমন্দিরাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। কিন্তু পাণ্ডুরাজের আদেশ অমান্য না করিয়া যুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দন্তপুর হইতে দন্তটিও লইয়া পাটলিপুত্রে উপনীত হন।

বুদ্ধদন্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। পাণ্ডুরাজ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের সর্বব্যাপৃতত্ত্ব ও অসংখ্য অবতারত্বের কথা বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। পাণ্ডুও বৌদ্ধ হইলেন। পাণ্ডু কলিঙ্গ রাজ গুহশিবকে স্বরাজ্যে আটক করিয়া রাখিয়া দন্তের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহশিব দন্ত লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে একরাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র একে একে রাজা হইয়া গুহশিবকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহশিব বিপদ বুঝিয়া জামাতাকে বলেন যে যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দন্ত লইয়া সিংহলে যাইও। ঘটনা তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়। রাজপুত্র দন্তকুমার সস্ত্রীক দন্ত লইয়া সিংহল যাইবার উদ্দেশ্যে তামলিত্তি (তাম্রলিপ্তি) নগরে উপনীত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন করেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায় যে দন্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। ফা-হিয়েন যখন খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, তখন পুরীই একটি বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার জন্য এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দন্তকুমার তাহা না করিয়া সিংহলে যাইবার জন্য যখন তমোলুকে গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহারই কোন নিকটবর্তী স্থানে দন্তপুর[১] ছিল।" (বিশ্বকোষ ৮ম ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৪)

১। দন্তপুর সম্পর্কে আমি আমার লেখা "মেদিনীপুরে বৌদ্ধধর্ম" পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। দাঁতনই যে দন্তপুর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দাঁতন অঞ্চলে অনুসন্ধান করার নিমিত্ত ১৩৫৯ সালের ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে ১৫।২০ দিন থেকে বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করি এবং কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিও পাল যুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই। এই সব নিদর্শন স্পষ্টই প্রমাণিত করে যে দাঁতন অতি প্রাচীন স্থান। দাঁতন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। "দন্তপুর প্রত্নতত্ত্ব শালার প্রতিষ্ঠাতা" ৺ললিতমোহন সামন্ত মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার করে আশপাশের গ্রাম থেকে প্রাচীন মূর্তি ও নানা ঐতিহাসিক জিনিসের ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোগলমারী কাকরাজিৎ গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, বরুণ মূর্তি ও মোহনপুর দাতুনিয়া গ্রামে বুদ্ধমূর্তি। আর অখণ্ড দু'টী ছোট বড় বৌদ্ধযুগের পানপাত্র, একটি ভগ্ন শিলালিপি। যতদূর মনে হয় প্রাচীন রুনিক লিপির অনুকরণে লেখা।

দাঁতনে কয়েকটি বড় বড় দীঘি আছে। তাতে ডুবে ডুবে অনুসন্ধান করেও কয়েকটি মূর্তিসহ বুদ্ধযুগের পানপাত্র একটি পাই। বীরবর রাজা সুরেশচন্দ্র রায় সাহিত্যবিনোদ মহাশয়ের পুরাতন গড়ে দু'টি পাল যুগের সুন্দর মূর্তি দেখে ছিলাম। একটি জৈন গুরু মহাবীরের। মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন আর তার চার পাশে ১২জন ১২জন ২৪জন তীর্থঙ্করের মূর্তি অতি সুন্দরভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ২২" ইঞ্চি ও প্রস্থে প্রায় ১২" ইঞ্চি। শিয়রে মাথার কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দু'টি পরী মালা হাতে নিয়ে। শিল্পী যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মহাবীরের ধ্যানযোগীর ভাবকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে নিখুঁতভাবে চেষ্টা করেছেন।

বুদ্ধমূর্তিটি আকারে একটু বড়। উচ্চতায় ২৪" ইঞ্চির কাছাকাছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্তিটি অক্ষত অবস্থায় নাই। দক্ষিণ পার্শ্বের কিছু অংশ ভগ্ন। মূর্তিটি দেখতে অতি সুন্দর। নাসিকাগ্রে অর্ধনিমিলিত নয়নের দৃষ্টি। সমগ্র মুখমণ্ডলে নিহিত স্থির, শান্ত সমাহিত ধ্যানযোগীর আলোকসত্ত্ব ভাব। অঙ্গসৌষ্ঠবতা এবং প্রতনুকোমলতার প্রাচুর্যে স্নাত অবয়বসমূহ—এসকলই শিল্পীর শিল্পসাধনার চূড়ান্ত সার্থকতার পরিচয় দেয়। মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত এবং সমসাময়িক সারনাথ শিল্পরীতির বুদ্ধমূর্তির সাথে এর সাদৃশ্য অতি নিবিড়। মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন সারনাথ অঞ্চল থেকেই আনা হয়েছে। বাংলা দেশে সবচেয়ে প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে রাজসাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে। বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির সাথে এর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে। সেটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তবে এর চেয়ে আরো বেশী ভগ্ন—হাঁটুর কাছ থেকে একেবারে নেই। মূর্তিটির দু'পাশে দু'জন শিষ্য দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করছেন। এই দু'জন শিষ্য খুব সম্ভবত এপুশ ও ভল্লিক। মূর্তিটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

এছাড়া আরও একটি ভগ্ন বুদ্ধের মাথা আবিষ্কার করি জয়পুরা পল্লীতে। এ মূর্তিটির গলার কাছ থেকে একেবারে নাই। মাথার মুকুটের খানিকটা অংশ ভগ্ন এবং নাসিকার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন। মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

বিশ্বকোষ প্রণেতা তমলুকের কাছেই দন্তপুর ছিল বলে অনুমান করে

ছিলেন। কানিংহাম সাহেব, রোমক পণ্ডিত প্লিনীর ভারতীয় স্থান সকলের নির্দেশকালে বলেছেন, প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য কলিঙ্গ অন্তরীপ থেকে দন্তপুর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ কলিঙ্গ অন্তরীপ বর্তমান কলিঙ্গ পত্তনের কাছে এবং দন্তপুর নগর প্লিনীর মতে গঙ্গার মোহনা থেকে ৫৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান রাজমাহেন্দ্রী নগরের দূরত্ব গঙ্গার মোহনা থেকে প্রায় ঐ রকম দূরে অবস্থিত। এই কারণে কানিংহাম সাহেবের মতে রাজমাহেন্দ্রীই প্লিনীর কথিত দন্তপুর নগর। তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন যে, বর্তমান করিঙ্গপত্তন থেকে রাজমাহেন্দ্রী বা প্রাচীন দন্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। (Ancient Geography of India P. 518)।

আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে—কলিঙ্গ নগরীতে প্রথম বুদ্ধদন্ত স্থাপিত হয়েছিল। তৎপরে পিপলির নিকটে একস্থানে মন্দির নির্মাণ করে তন্মধ্যে দন্তটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দন্তপুর নগর। (Antiquities of Orissa, Vol. 11. P. 106-107)

দাঠা বংশের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহলে প্রেরিত হয়েছিল। সে সময় পুরীও একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। একথা ফা-হিয়েন নিজেই বলেছেন। পুরী যদি দন্তপুর হোত, তবে শিবগুহের জামাতা পুরী থেকেই পোতারোহণ করে সিংহলে গমন করতে পারতেন। তাঁকে বহু দূরবর্তী তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসতে হোত না। রাজমাহেন্দ্রী থেকে সিংহল যাত্রা করতে গেলেও তাম্রলিপ্ত অপেক্ষা পুরী বন্দরই অনেক নিকটবর্তী ছিল। দাঁতন থেকে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব মাত্র ৫০।৬০ মাইল। কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় ৩০০ মাইল। রাজমাহেন্দ্রী আরও অনেক দূরে অবস্থিত। তখনকার দিনে আজকের মত এত দ্রুতগামী যানবাহনও ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্য যে ছিল তা' কাহিনী থেকেই পাওয়া যায়। তাই পুরী থেকে বা রাজমাহেন্দ্রী থেকে আসতে হলে পথ যে কোনমতেই নিরাপদ ছিলনা একথা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং সময়ও অনেক ব্যয়িত হোত। বন-জঙ্গল ও দস্যু তস্করের কথা ছেড়ে দিলেও বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু ব্রাহ্মণগণের হাত থেকে তিনি কোন মতেই রেহাই পেতেন না। এতসব বিপদের ঝুঁকি :মাথায় না নিয়ে তিনি

দাতবংশে এই ঘটনাটি নিম্নরূপ আছে। শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে "ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অংসখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদন্ত পাইবার আশায় যুদ্ধযাত্রা করিলে দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ আপনাকে বলহীন ভাবিয়া বুদ্ধদন্ত গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তী রাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার (হেমকলা ?) সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া 'দেবানম্ পিয়' তিষ্য নির্মিত ধর্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান একদা সিংহল দ্বীপে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব 'দালাদপিঙ্কয়া' দর্শন করিয়াছিলেন।[২]"

এই বুদ্ধদন্ত সিংহলে ব্যাণ্ডির দন্তমন্দিরে নিয়মিত পূজিত হচ্ছে।

॥ ফা-হিয়ান ॥

Fa-Hian

বুদ্ধদেবের অনেক আগে থেকেই মহাচীনের সাথে ভারতের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা

অতি সহজে পুরী দিয়েই চলে যেতে পারতেন সিংহলে। আমরা পূর্বেই বলেছি দাঁতন অতি প্রাচীন স্থান এবং সেখান থেকে বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপ্ত বন্দরও দাঁতনের কাছে। এমতাবস্থায় দাঁতনই যে প্রাচীন দন্তপুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দাঁতনের নিকটবর্তী শতদোলা ও মোগলমারী গ্রামে রাজঘাট রাস্তা নির্মাণের সময়ে অনেক সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সকল ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এখানে একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল।

২। দাত বংশ, পঞ্চম অধ্যায় ও জ্ঞানাঙ্কুর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯-৪৩০।

করব। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর চীন থেকে অনেক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন জ্ঞানলাভ করার জন্য। ভারত তখন শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও ধর্ম-কর্মে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের সুশীতল ছায়ায় অর্দ্ধেক পৃথিবীবাসী করেছিল আশ্রয় গ্রহণ। যে সমস্ত বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের সকলের ভ্রমণকাহিনী আজ আর পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে চিটাওয়ান (chi-tao-an) নামে যিনি এসেছিলেন, তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাঁর অমূল্য ভ্রমণকাহিনীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্তের খ্যাতি পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান আর্যাবর্ত্ত ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ৩৯৯ থেকে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪।১৫ বছর ভারতে অবস্থান করে ছিলেন। অতএব ভারতের অনেক কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বিভিন্ন দিক দিয়ে ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মূল্য তাই অনেক। তিনি ভারতবর্ষ ও মধ্য-এসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্যটন করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ও তৎকালীন ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। তাঁর এই ১৪।১৫ বছর ভ্রমণ কালের মধ্যে পুরো দু'বছর কেটেছিল তাম্রলিপ্তে। এই দু'বছর তিনি তাম্রলিপ্ত নগরীর বিভিন্ন বৌদ্ধমঠে অবস্থান করে বহু মূল্যবান বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে ছিলেন এবং বৌদ্ধ দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি অঙ্কন করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই পোতারোহণে তিনি সিংহল দ্বীপে গমন করে ছিলেন। সেখানেও কাটিয়ে ছিলেন পুরো দু'টি বছর। সিংহলে ফান্ ভাষাতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথির নকল অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে করেন। তিষ্য নির্মিত ধর্মমন্দিরে বুদ্ধদন্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জাভা দিয়ে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তন করেন।[১] ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত নগরীতে মোট ২৪টি সংঘারাম (বৌদ্ধ আশ্রম) ও বহু বৌদ্ধাচার্য সন্দর্শন করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাম্রলিপ্ত তখন শুধু ব্যবসা বাণিজ্য আর জাহাজ নির্মাণের জন্যই নয়, বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তা'না হলে ফা-হিয়ানের মত পণ্ডিত মানুষ দু'বছর থেকে কেনই বা বিদ্যাশিক্ষা করে ছিলেন। কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ তখন তাম্রলিপ্তে বাস করতেন, সে সম্পর্কে তিনি যদিও কিছু স্পষ্ট লিখে যাননি, তবুও যখন বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কন করে ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাযান ও হীনযান এই দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ তাম্রলিপ্তে বাস করতেন। এবং বজ্রযানি সম্প্রদায়ও কিছু কিছু ছিল বলে অনুমিত হয়। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মহাযান দার্শানক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এদু'টি পন্থের ভিতর নানারকম প্রভেদ আছে। হীনযানে নিজের মুক্তিই লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশুপক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও একমাত্র উৎপত্তিস্থল শূন্য। এই শূন্যকে বজ্রযানে "বজ্র" আখ্যা দেওয়া হয়। তার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব।[২]

ফা-হিয়েন যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তিনি পাটলিপুত্র সহরে মহারাজ অশোকের প্রাসাদ বর্তমান দেখে ছিলেন। দারুময়

১। Elphinstone's History of India, Appendix IX. (Cowell's Edition) P. 288

২। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এসম্পর্কে যদি বিস্তৃতভাবে কিছু জানতে চান, তা'হলে বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের "বৌদ্ধদের দেবদেবী" পুস্তক পাঠ করলে অনেকখানি পরিতৃপ্ত হবেন।

এই প্রাসাদ দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং এরি সন্নিকটে হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের ছ-সাতশো সন্ন্যাসীকেও বিভিন্ন মঠে বাস করতে দেখে ছিলেন। এর দ্বারা মনে হয়, তখন তাম্রলিপ্তেও এই দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বাস করতেন। বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্য থেকেই বৌদ্ধ মূর্তির ও বৌদ্ধ দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছিল। তাম্রলিপ্তে মূর্তিপূজার প্রচলন যদি না হয়ে থাকে, তা'হলে বৌদ্ধগ্রন্থাগার গুলিতেই বা এই সব দেব-দেবীর মূর্তি সংগৃহীত হবে কোথা থেকে।

ফা-হিয়ানের ভারত ত্যাগের এক শতাব্দী পরে হোই-সেং (Hoei-Seng) ও সং-উন (Song-Yun) নামক দু'জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতের উত্তরে ভ্রমণ করতে আসেন, কিন্তু তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তের কোন নাম পাওয়া যায়নি।

॥ আচার্য বোধিধর্ম ॥

তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই বৌদ্ধগুরু আচার্য বোধিধর্ম কাণ্টন যাত্রা করেছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক নন। ভারত থেকেই বিদেশে গিয়েছিলেন তথাগতের বাণী প্রচার করতে। এই আচার্য বোধিধর্ম প্রসংগ বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগের ৪১১ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

আচার্য বোধিধর্ম—খ্রীষ্টীয় ৫২৬ অব্দে আচার্য বোধিধর্ম তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টনযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন সম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্মের 'কাষায়' ও "ভিক্ষাপাত্র" জাপানের 'ইকরুণ' মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এদেশ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ দু'খানি জাপানের 'সিঙ্গোন' বা তান্ত্রিকগণ যে সকল

স্তব কবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করিয়া থাকেন, সে সমুদয় পূর্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

আচার্য বোধিধর্ম খুব সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। জাপানে 'ইকরুণ' মঠে আজো বোধিধর্মের উক্ত দু'খানি পুস্তক সযত্নে সংরক্ষিত আছে। জাপান যাত্রী দু'একজন ভ্রমণকারীর ডায়েরী থেকে এতথ্য জানা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে এই পুস্তকের প্রতিলিপি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, প্রাচীন বাংলা হরপের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা কালে এই দুটি গ্রন্থের লিপি কৌশল বিশেষ মূল্যবানরূপে গৃহীত হবে বলে আশা করি। ১৩৩৯ বছর পূর্বে বাংলা ভাষা ও তার লিখন প্রণালী কিরূপ উন্নত ছিল এতথ্য নিঃসংশয়ে আবিষ্কৃত হবে। চর্যাপদের ভাষা যদি হাজার বছরের পুরানো বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন, তা'হলে সে অনুমান যাচাই করে নিতে পারা যাবে "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" তন্ত্রগ্রন্থ থেকে। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের থেকেও প্রাচীন বঙ্গাক্ষর-এর পরিচয় বহন করছে এই দু'টি পুস্তক। চর্যাপদও তান্ত্রিক গ্রন্থ আর "প্রজ্ঞাপারমিত-হৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" এ দু'টি গ্রন্থও তন্ত্র সম্বন্ধীয়। তাই বলছিলাম, যদি এ দু'টি গ্রন্থের প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তা'হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সন্ধান পাওয়া যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাপদ থেকেও এ দু'টি গ্রন্থ আরো প্রাচীন। না জানি কোন অজ্ঞাত কবি ও তাঁদের পরিচয় এই দু'টি গ্রন্থে হয়ত বা লিপিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধিৎসু গবেষক পণ্ডিতবৃন্দের কাছে এ দু'টি এক মহামূল্যবান বস্তু আর বাঙালীর কাছে এ এক পরম বিস্ময়।

॥ পরিব্রাজক হিউয়ান-চোয়াং ॥
[Hiouen Thsang]

বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়ান-চোয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন ভারতের রাজতক্তে মহর্ষি হর্ষবর্ধন ছিলেন আসীন। তিনি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তখন ভারতে ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হিউয়ান চোয়াং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের অভিষেকের ৩০ বছর পরে প্রয়াগে ষষ্ঠবার যে মেলা হয়েছিল, সেই মেলা একমাস চলার পর সভাগৃহ বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষীগণ পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেই সময় হর্ষ এক স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। গোলমালের মধ্যে ছুরিকা হাতে এক ধর্মান্ধ হর্ষকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যায়। তাকে ধরে ফেলাতে হর্ষের জীবন রক্ষা পায়। এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠার জন্য কি ভীষণভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সে যাই হোক, হিউয়ান চোয়াং-এর মতে ভারতবাসীরা—'সত্যবাদী, সাধু, সরল, ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিলেন।' তাম্রলিপ্ত-বাসিগণ ছিলেন উদার, ধর্মভীরু, পরিশ্রমী ও বীর। সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় তথা তাম্রলিপ্তের সভ্যতা সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখেছেন—"জগতের কোন সভ্যতাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে একথা বলা যায় না কিন্তু এটা সত্যি যে বৈদগ্ধ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতা এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল, যাকে অতীত বা বর্তমান কোনো সভ্যতাই অতিক্রম করতে পারে নি।" [১]

১ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ২০৩।

এই বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক 'তমলুককে (Tam-mo-liti) একটি উচ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধশালী উপসাগরের তীরবর্তী বৌদ্ধবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথে ও বহি-র্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইত। এখানে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও ১০০০ বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন, এবং নগরের একপ্রান্তে মহারাজ অশোক-নির্মিত ২০০ ফিট একটি স্তম্ভ ও তাহার পার্শ্বে সিঁড়ি ছিল, তাহাতে প্রাচীন বুদ্ধগণ বসিতেন ও বেড়াইতেন। দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্য এখানে প্রচুর পাওয়া যাইত, বিস্তর ধিনীসওদাগর ও জাহাজের অধিকারিগণ (Ship-owners) বাস করিতেন; এবং সাধারণতঃ অধিবাসিগণ ধনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ছিল, এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধমঠ ব্যতীত এখানে আর ৫০টি পৌত্তলিক হিন্দুমন্দির ছিল। যদিও ইহার ভূমি সকল নিম্ন ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্বরাশালী থাকায় কর্ষিত হইয়া যথেষ্ট ফুল ও ফল উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী ও কার্য তৎপর ছিলেন।' [১]

হিউয়ান চোয়াং-এর ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে অন্যত্র দেখা যায়: ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত নগরী সমুদ্রে ধুয়ে যায়। [২] এই ধুয়ে যাওয়া যে কি রকমভাবে হয়েছিল তা' তিনি কোন উল্লেখ করে যান নি। তিনি ভারতে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ বছর অবস্থান করেছিলেন।

ইউয়ান চোয়াং-এর আগমনকালে বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন—(১) কর্ণসুবর্ণ (ভাগলপুরাদি), (২) পুণ্ড্র

১। Samuel Beal's Budhist Records of the Western World, Voll. II, P. 200-201 and Hunter's Orissa, Vol. I, P P. 209-310.

২ Imperial Gazetteer of India, Vol. VIII. P. 514

(দিনাজপুরাদি), (৩) কামরূপ (আসামাদি), (৪) সমতট (ঢাকাদি), (৫) তাম্রলিপ্তি (বিস্তৃত তমলুক রাজ্যাদি।) [৩]

চোয়াং রচিত ভ্রমণ কাহিনীর নাম "সি-যু-কি" (Si-Yu-Ki)। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় চোয়াং সমতট (বর্তমান ঢাকা) থেকে পশ্চিম দিক ধরে নয়শত "লি" আসার পর তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রাজ্যের পরিধি ১৪০০ 'লি' এবং ইহার রাজধানী ১০ 'লি'র অধিক ছিল। এই রাজ্যের বাণিজ্য সমারোহ দেখে চোয়াং চমৎকৃত হয়েছিলেন !

ফা-হিয়ান ভারতে এসেছিলেন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর হিউয়ান চোয়াং এর ঠিক ২৩০ বছর পরে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে আসেন ভারতে। এই ২৩০ বছরের ব্যবধানে তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে যে কত অঘটন ঘটে গিয়েছে, তার কোন সংবাদই আমরা জানি না। অন্তত আজ পর্যন্ত তা' আবিষ্কার হয় নি। ফা-হিয়ান তার ভ্রমণ কাহিনীতে তাম্রলিপ্তে ২৪টি সংঘারাম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিন্দু মন্দির যে কতগুলি ছিল, সে সম্পর্কে কোন কিছু বলে যান নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ফা-হিয়ান হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তাই তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে হিন্দুদের সম্বন্ধে কোন কিছু লিখে যান নি। এ ধারণার মূলে কতখানি সত্য আছে জানি না। তবে ফা-হিয়ান যেখানে ২৪টি সংঘারাম দেখেছিলেন সেখানে ২৩০ বছর পরে হিউয়ান-চোয়াং এসে মাত্র ১০ বিহার এবং হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখলেন। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাম্রলিপ্ত থেকে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে কিরূপভাবে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ২৩০ বছরের মধ্যে ১৪টি সংঘারাম একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উঠে গিয়েছিল। ফা-হিয়ানের সময় হয়ত তাম্রলিপ্তে হিন্দুধর্মাবলম্বী কিছু সংখ্যক লোক ছিল, তা'

৩ R. C. Dutt's Rambles in India, PP. 156-157.

নিতান্ত নগণ্য। তাই ফা-হিয়ান তাদের সম্পর্কে কিছু বলা উচিত বলেই মনে করেন নি। বস্তুত ফা-এর সময়ে তাম্রলিপ্ত পুরাপুরি-ভাবেই বৌদ্ধ ছিল। হিউয়ান-চোয়াং-এর সময়ে ৫০টি হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ দেখে মনে হয়, তাম্রলিপ্ত তখন সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কবলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা' না হলে যেখানে ১০টি বিহার সেখানে তার চার-পাঁচ গুণ বেশী হিন্দু মন্দিরই বা কেন গজিয়ে উঠবে। এই পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আজো যখন পাওয়া যায় নি, এ সম্পর্কে কোন মতামত দেওয়াও সমীচীন হবে বলে মনে হয় না।

তবে একথা স্পষ্টই মনে হয় যে এই ধর্মবিপ্লবের ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্যিক লেন-দেন-এর কোন বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নি। কেন না চোয়াং স্পষ্টই বলেছেন, তিনি এর বাণিজ্য সমারোহ দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এবং এই বাণিজ্য সমারোহ হয়ত আজো অক্ষুণ্ণ থাকত, যদি না তাম্রলিপ্তের ভাগ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হোত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণগণকে তাম্রলিপ্ত তথা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে বিতাড়িত করতে অনেক বিপ্লব করতে হয়েছিল সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

হিউয়ান-চোয়াং বলেছেন ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দর ধৌত হয়েছিল। সে যে কি রকম ধৌত তা' তিনি বিশদভাবে বলে যাননি। তাম্রলিপ্তের ভূমি ছিল নিম্ন অথচ উর্বর। এই নিম্নভূমি সামুদ্রিক কোন বিশেষ বিপর্যয়ের ফলে ধৌত হয়েছিল, তাই বলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তা' যদি হোত, তা'হলে চোয়াং নিশ্চয়ই সে কথা স্পষ্টই উল্লেখ করতেন। তবে অনুমান হয়, বিগত ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যেরূপ ভীষণ ঝটিকা ও জল প্লাবন হয়ে এই নগর ধৌত হয়েছিল উহাও হয়ত তদ্রূপ।[১]

[১] Marshman's History of Bengal, [8th Edition] P. 104.

দু'শত ফিট উচ্চ যে অশোক স্তম্ভ তাম্রলিপ্তে তিনি অবলোকন করেছিলেন, তার কোন চিহ্নই আজ আর বর্তমান নাই। এই অশোক স্তম্ভ যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কোথায় ছিল, সে স্থান সম্পর্কে কোন নির্দেশ আজো পাওয়া যায় নি। অনেকে হ্যামিল্টন সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের সম্মুখে যে প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভাংশটি আছে, সেইটিকেই উক্ত স্তম্ভের অংশ বিশেষ বলে অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কারণ তমলুকরাজ সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজবাটীর সীমা মধ্যে মৃত্তিকা খননকালে এই প্রস্তর খণ্ডটি পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্মুখে রক্ষিত প্রস্তর খণ্ডটি উক্ত প্রস্তর। তা'হলেও প্রশ্ন উঠে অশোক স্তম্ভের মত এই প্রস্তর খণ্ডটি ওস্থানেই বা পাওয়া গেল কেন? আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যমধ্যে প্রস্তর নির্মিত দুর্গও ছিল। মোগল শাসনের সময় তমলুক দুর্গের পরিমাণ ২৯৭ বিঘা নির্দিষ্ট হয়েছিল। হয়ত উক্ত প্রস্তর খণ্ডটি কোন প্রস্তর নির্মিত দালানের স্তম্ভাংশ। এবং প্রস্তর নির্মিত দুর্গটি বঙ্গে পাল রাজা বা গুপ্তরাজত্বের সময় তৈরী হয়েছিল। যার জন্য স্তম্ভ বা থামগুলি বৌদ্ধ ভাস্কর্যের অনুরূপ করে নির্মিত। কিন্তু আজ আর প্রস্তর নির্মিত দুর্গের বা গৃহের সামান্যতম নিদর্শনও বর্তমান নাই। বঙ্গোপসাগরের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অনন্তকালের জন্য মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই সমস্ত ভাস্কর্যের পুনরুদ্ধার করা আর হয়ত সম্ভব নয়, তবুও ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হয়ত টুকরো টুকরো নিদর্শন আজো আবিষ্কৃত হতে পারে।

চোয়াং তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ১৪০০ শত 'লি' বলে উল্লেখ করেছেন। 'লি' শব্দটি চৈনিক দূরত্বমাপক শব্দ। বর্তমান কাঁথি মহকুমার অনেকাংশ ও সূতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম এই ১৪০০ লির মধ্যে নয়। কারণ এই সমস্ত দেশ তখন ছিল সমুদ্রের অতল গহ্বরে। তা'হলে অনুমান করা যায় যে বর্তমান ঘাটাল হয়ে

হাওড়া ও হুগলীর সামান্য কিছু অংশ হয়ত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান উড়িষ্যার সম্পূর্ণ বালেশ্বর জেলা ত এককালে বিস্তৃত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অংশ ছিলই। মূল তাম্রলিপ্ত বন্দরের পরিমাণ ছিল ১০ 'লি'। এই বিস্তৃত পরিমাণ স্থান আজো নির্দেশিত হয়নি। যদি এই স্থানের সীমা আজ নির্নীত হয়, তাহ'লে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের বিশেষ সুবিধা হবে। কারণ বর্তমান তমলুকটুকুই প্রাচীন বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত বন্দর নয়। প্রবাদ আছে তমলুক থেকে চার পাঁচ মাইল পশ্চিম দিকের গ্রাম 'দরজা' নাকি তমলুক বন্দরের "দরজা" ছিল। স্থলপথে এই বন্দরে প্রবেশ করতে হলে এই স্থানের নির্মিত দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হোত। যদি এ প্রবাদে কিছু মাত্রও সত্য থাকে, তা'হলে তাম্রলিপ্ত নগরীর খনন কার্য শুধু তমলুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তমলুকের আশপাশের বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সব শেষ কথা হোল এই মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার মত এখানে কোন ঢিপি নেই যে ঢিপি খুঁড়লেই কোন কিছুর হদিস মিলবে। তাম্রলিপ্ত ছিল সেকালে অত্যন্ত নিম্নভূমি। সেই নিম্নভূমি ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পলিতে ভরাট হয়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চল জেগে উঠেছে। তাই প্রকৃত তাম্রলিপ্তের স্থান নির্ণয় করতে হলে বা হিউয়ান-চোয়াং বর্ণিত তাম্রলিপ্তের সীমা নির্দ্ধারণ করতে হলে বেশ কষ্ট পেতে হবে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন।' এ উক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হয়ত অমূলক নয়, তবে হিউয়ান-চোয়াং-এর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য যেমন পাওয়া যায়, তেমন ভারতের একটি সুস্পষ্ট চিত্রও পাওয়া যায়। সে চিত্র পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিকগণকে বৌদ্ধ ভারত তথা হর্ষবর্দ্ধনের সময় ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করেছে।

আর যাই হোক ভারতবাসী এবং তাম্রলিপ্ত অধিবাসিগণ যে পরিশ্রমী, সৎ, উদার এবং সাহসী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হিউয়ান-চোয়াং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে যখন আসেন, তখন এই প্রদেশের শস্য সম্পদ ও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তাম্রলিপ্তের মাটিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোত এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হোত। চোয়াং তাম্রলিপ্ত বন্দরের এক অধিবাসীর সংগে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব করে তাঁর সাহায্যেই বিদেশে সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়ে ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় চোয়াংকে তৎকালীন তাম্র-লিপ্তের অধিবাসী অর্থাৎ বৌদ্ধগণ অপেক্ষা বাঙালী নাবিকই বেশী সাহায্য করে ছিলেন।

পরিব্রাজক আই-সিং

[I-sing]

মহাচীন থেকে ভারত পরিভ্রমণের জন্য প্রাচীন কালে যাঁরা এসেছিলেন, আই-সিং তাঁদের সকলের চেয়ে ভাল সংস্কৃত জানতেন। এই সংস্কৃত জ্ঞানই তাঁর ভারতভ্রমণকে সার্থক করে তুলেছিল। সম্রাট্ তৈ-সাংয়ের রাজত্বকালে (ইনি ৬২৭ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন) ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফান্-ইয়াংয়ে (বর্তমান চো-চৌ) আই-সিং জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তার বয়স সাত বছর তখন তিনি সান্-উ এবং হুই-সি নামক আচার্য দ্বয়ের নিকট পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। আর ঠিক চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বৎসর, তখনই ভারতে আসার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। (৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু এই সংকল্প তিনি তখনই রক্ষা করতে পারেননি। তৎকালে ভারতই ছিল বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। যিনি যত বড় বিদ্বান হোন না কেন, আজকালের মত যেমন

বিলাত ভ্রমণ করে না এলে শিক্ষা সম্পুর্ণ বলে মনে হয় না তেমনি তৎকালে ভারত ভ্রমণ না করলে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি হোত না। চীন-সম্রাটগণ সাহায্য দিয়ে তৎকালে ভারতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বদেশের পণ্ডিতদের পাঠিয়ে দিতেন।

আই-সিং স্বদেশে অত্যন্ত যত্নপূর্বক প্রায় উনবিংশ বৎসর ধরে ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে ভারত দর্শনের ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবলরূপ ধারণ করে। তিনি বিনয় সংক্রান্ত পুস্তক প্রায় পাঁচ বছর ধরে অধ্যয়ন করে ঐ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফলে তাঁর উপাধ্যায় হুই-সি তাঁকে ঐ বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদানে আদেশ দেন। বস্তুত বিনয় শাস্ত্রে তাঁর মত পণ্ডিত তৎকালে চীন দেশে একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের প্ররোচনায় তিনি অভিধর্মপিটক সংক্রান্ত অসঙ্গের শাস্ত্রদ্বয় অধ্যয়নের জন্য পূর্ব-উইতে (বর্তমান চ্যাং-টে-ফু) গমন করেন। এই স্থান থেকে তিনি অভিধর্মকোশ এবং বসুবন্ধুর ও ধর্মপালের বিদ্যামাত্রসিদ্ধি শিক্ষার জন্য পশ্চিম রাজধানী সিয়ান-ফু-তে গমন করেন। খুব সম্ভবত চ্যাং-থানে অবস্থান কালেই তিনি হিউয়ান-চোয়াং কর্তৃক ভারত ভ্রমণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রোৎসাহিত হয়েছিলেন। এই সময় ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়ান-চোয়াং-এর মৃত্যু হয়। রাজাদেশে তিনি হিউয়ান-চোয়াং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সন্দর্শন করেছিলেন।

ফা-হিয়ানও হিউয়ান-চোয়াংকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জীবনী লেখক বলেছেন, এঁদের নাম কীর্তন করতে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কে বলতে পারে হিউয়ান-চোয়াং জীবদ্দশায় ও দেহান্তে স্বদেশে যে সম্মান লাভ করেন, সেইরূপ সম্মান লাভেচ্ছায় আই-সিং ভারতবর্ষ আগমনে প্রণোদিত হন নাই! যাই হোক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানী থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

চ্যাং-আনে অধ্যয়ন কালে পিংপু (সেন্-সি প্রদেশস্থ পিং-চৌ) বাসী চুই ধর্ম্মশিক্ষক, লৈ-চো (সাং-টাংয়ের অন্তর্গত লাই-চো-ফু) নিবাসী শাস্ত্রাধ্যাপক হুং-ই এবং আরো দুই তিন জন ভারতবর্ষে আসবার জন্য একমত হন। কিন্তু পরিশেষে সিন্-চৌ-বাসী যুবক-যতি সান্-হিংকে[১] সংগে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হন।

ভারতবর্ষ ভ্রমন ব্যাপারে তিনি যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁদের কথা আই-সিংয়ের নিজের ভাষাতেই বলি—

"সিয়েন-হেং রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমি ইয়াং-চ্যুতে (কিয়াং-সুর অন্তর্গত ইয়াং-চৌ। পর্যটক মার্কোপলো এই স্থানকে ইয়াং-ফু বলে উল্লেখ করেছেন) গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিলাম। হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে আমি অসম্ভাবিতভাবে কোং-চৌবাসী (কোয়ং-সিং প্রদেশের প্রাচীন নাম) সিয়াও-চুয়ান্ নামক রাজদূতের সন্দর্শন লাভ করিলাম; তাঁহারই সাহায্যে, আমি দক্ষিণদিকে যাত্রা করিবার জন্য এক পারস্য দেশীয় জাহাজের স্বত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলাম এবং তিনিও দ্বিতীয় বার আমার দানপতির কার্য্য করিলেন। সিয়াং-টাং এবং সিয়াও-চেং নামক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় (ইঁহারাও রাজদূত ছিলেন) এবং নিং ও পেন্ নাম্নী তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদ্বয় ও অন্যান্য সকলেই আমাকে নানারূপ উপহার দানে অনুগ্রহীত করিলেন।"

"পূত-ভূমি পরিদর্শনে যে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম তাহা কেবল কেং বংশের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। অধিকন্তু, লিং-নানের (কোয়াং-টাং এবং কোয়াং সি) শ্রমণ ও সাধারণ ব্যক্তিগণ বিদায়-কালে অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিয়াছিলেন?"

"এই বৎসরের একাদশ মাসে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা সর্প ও

১ সান্-হিং আই-সিং-এর ছাত্র ছিলেন। ইনি আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে সুমাত্রা পর্যন্ত এসে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে চীনে প্রত্যাগমন করেন।

বৃশ্চিকরাশির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও পান্-উকে ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া যাত্রা করিলাম। কখনও কখনও আমি মৃগদাবের কথা মনে করিতে লাগিলাম। অন্য সময়ে আমি কুক্কুটপাদগিরিতে বিশ্রাম করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।"[১]

২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই জাহাজ মালব দেশের রাজধানী ভোজে উপস্থিত হোল। এইস্থানে আই-সিং জাহাজ থেকে নেমে ছ'মাস অবস্থান করে ছিলেন। এই ছ'মাসের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন। ভোজের রাজা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। ফলে তিনি মালয় প্রদেশে আসেন। এর বর্তমান নাম শ্রীভোজ। এখানে দু'মাস অবস্থান করার পর কচ্ছ গমন করেন। কচ্ছে একবছর অবস্থান করে রাজকীয় জাহাজে আরোহণ করে পূর্বভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এর দশদিন পরে "উলঙ্গ জাতি"র দেশে আসেন। আই-সিং এই দেশের রীতি-নীতি ও অধিবাসীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। "লোহা" এদেশে পাওয়া যেত না। এরা খুব হিংস্র ছিল। এই "উলঙ্গ দেশ" থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় পঞ্চদশ দিবস অগ্রসর হয়ে তারা তাম্রলিপ্ত পৌঁছিলেন। তাম্রলিপ্তিই পূর্বভারতের দক্ষিণ প্রান্তসীমা, ইহা মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ষাট যোজনের অধিক দূরবর্তী।

"সিয়েন-হেং রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের (৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে আমি তথায় উপনীত হইলাম। পঞ্চম মাসে পুনর্বার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথিমধ্যে আমি দুই একটি সঙ্গী পাইতে লাগিলাম।

মহাযান প্রদীপের[১] সহিত সর্বপ্রথমে আমার তাম্রলিপ্তিতেই

---

১ মহাযান প্রদীপ অন্যতম পর্যটক হিউয়ান—চোয়াংয়ের শিষ্য। ইনি পশ্চিম শ্যাম, লঙ্কা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে নালন্দা, বৈশালী এবং কুশীনগরে গমন করিয়া তত্রস্থ পরিনির্বাণ বিহারে দেহত্যাগ করেন।

২ আই-সিং, পৃঃ ৯-১১।

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারই আশ্রয় লাভ করিয়া আমি ব্রহ্মভারত (সংস্কৃত) শিক্ষা শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ) আরম্ভ করি। আচার্য্য টেং ও বহু সংখ্যক বণিক্ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখী রাজপথ দিয়া মধ্যভারতে উপনীত হইলাম।"[১]

এরপর আই-সিং নালন্দা প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থগুলি একে একে পরিভ্রমণ করেন। নালন্দায় কয়েক বৎসর অবস্থান করে ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সুদীর্ঘ ভারত ভ্রমণে তিনি কয়েকবার দস্যু হস্তে পড়ে ছিলেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে তবেই তিনি ভারত ভ্রমণ শেষ করে ছিলেন। তিনি বলেছেন ভারতের পথঘাট তৎকালে একা একা ভ্রমণ করা কোনমতেই সমীচীন ছিল না। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বেরিয়ে নালন্দায় যাওয়ার সময় এমন ভাবে দস্যুহস্তে পড়েছিলেন যে তাঁর সর্বস্ব তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং শেষে তিনি সর্বাঙ্গে পাঁক মেখে তবেই কোন রকমে সঙ্গীদের সাথে গিয়ে মিলেছিলেন। এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল তিনি সাময়িক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে। তাম্রলিপ্ত থেকে সঙ্গীগণ সহ একদল বণিকের সাথে তিনি নালন্দার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি বলহীন ও অসুস্থ হওয়ার দরুণ সঙ্গীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন! এবং সেই অসুস্থ শরীরেই পথ অতিক্রম করতে থাকেন।

আই-সিং মৃগদাবে প্রবেশ, কুক্কুটপদে গমন ও নালন্দা বিহারে দশ বৎসর[২] অতিবাহিত করে ছিলেন। চুকাং রাজত্বের প্রথম বৎসরে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দা থেকে ছ'যোজন দূরবর্তী স্থান উ-হিংয়ের

১। কথিত আছে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিমল কীর্তি বৈশালীতে এক গৃহে বাস করতেন। এই গৃহ দশ হস্ত পরিমিত ছিল, পরে ইহা "ফান্-চ্যাং" নামে অভিহিত হয়, বর্তমানে সংঘ মাত্রই এই নামে আখ্যাত হয়।

২ আই-সিং, পৃঃ ১৩।

নিকট বিদায় নিয়ে তিনি আবার দেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন। আই-সিং লিখেছেন—

"আমি ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিলাম। তৎপরে আমি তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাগমন করিলাম। তাম্রলিপ্তি পৌঁছিবার পূর্বে আমি পুনর্ব্বার দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে তাহাদের তরবারীর আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া অতি কষ্টে আমার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। অতঃপর তাম্রলিপ্তি হইতে আমরা জাহাজে কচ্চ অতিক্রম করিলাম। আমি যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছি তাহাতে পাঁচ লক্ষাধিক শ্লোক আছে। এইগুলি চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইলে সহস্রাধিক পুস্তক হইবে। এইগুলি সহ এক্ষণে আমি ভোজে অবস্থান করিতেছি।" আই-সিং, পৃঃ ১৬।

ভারতবর্ষ ও তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে আই-সিং বলতে গিয়ে বলেছেন—"মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষীয় মধ্য দেশ হইতে পূর্ব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তিনশত যোজন। উত্তর দক্ষিণে চারিশত যোজনের অধিক। আমি স্বয়ং সকল প্রান্তদেশ না দেখিলেও, অনুসন্ধানে ইহা অবগত হইয়াছি। ভারতবর্ষের পূর্বসীমা হইতে তাম্রলিপ্তি চল্লিশ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে পাঁচ-ছয়টি সংঘারাম আছে। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী। ইহা পূর্ব ভারতবর্ষের অন্তর্গত এবং মহাবোধি ও শ্রীনালান্দা হইতে ষাট যোজন দুরবর্তী। চীন হইতে আসিতে হইলে এই স্থানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে দুই মাস জলপথে গমন করিলে কচ্চে পৌঁছান যায়।" আই-সিং, পৃঃ ১৭।

কচ্চে ভোজ থেকে একটি জাহাজ আসে। এই জাহাজ সাধারণতঃ বছরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাসে ভোজ থেকে এসে উপস্থিত হয়। ভোজ থেকে সিংহল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যেতে হয়, ইহার দুরত্ব সাতশত যোজন।

আই-সিং যখন তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেছিলেন, তাম্রলিপ্তে তখন ভা-রা-হা নামে একটি বিরাট বিহার ছিল। এই বিহার তার আবশ্যকীয় আহার্য এবং পরিচ্ছদ সম্পর্কে আলোচনা বিস্তৃত ভাবে করেছেন। তাম্রলিপ্তে এই বিখ্যাত বিহারটি কোথায় ছিল আজো তা' আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই বিহারের নিয়ম-শৃঙ্খলা যে কত সুন্দর ছিল, তা, আই-সিং গ্রন্থ থেকে অবিকল উদ্ধৃত করছি। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এতে খুশী হবেন।

"প্রথমবার তাম্রলিপ্তিতে গমন কালে আমি বিহারের বহির্দ্দেশে তত্রস্থ কয়েকজন প্রজাকে কিছু শাক তিন অংশে বিভাগপূর্বক এক অংশ যতিগণকে উপহার প্রদান করিয়া ও অন্য দুই অংশ সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিলাম। আমি তাহাদের ঐরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না এবং পূজনীয় মহাযান প্রদীপকে ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, "এই বিহারের অধিকাংশ শ্রমণই প্রতিমোক্ষ প্রতিপালন করেন। মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ করিতে নিষেধ করায়, তাঁহারা তাঁহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তাঁহারা সদাচারে জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া হলচালনা ও জলসেচনের দ্বারা প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।"

আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে প্রত্যহ প্রভাতে ঐ বিহারের অধ্যক্ষ কূপসান্নিধ্যে জল পরীক্ষা করিতেন; জলের মধ্যে কোন কীট না থাকিলে ঐ জল ব্যবহৃত হইত কিন্তু তন্মধ্যে একটি কীট থাকিলেও ঐ জল পরিষ্কৃত হইত; কোন দ্রব্য এমন কি কিঞ্চিৎ শাকও প্রদত্ত হইলে সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হইত না, কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে সঙ্ঘই উহা বিচার করিতেন এবং যদি কোন যতি একাকী কোন সিদ্ধান্ত করতেন অথবা ইচ্ছানুযায়ী,

সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে, শ্রমণগণের সহিত ন্যায় বা অন্যায় আচরণ করতেন, তবে তাঁহাকে কুলপতি আখ্যা প্রদান করিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইত।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল :— সন্ন্যাসিনীগণ বিহারে যতিগণের নিকট গমনকালে, সঙ্ঘকে নিবেদন করিয়া পরে তথায় গমন করিতেন। যতিগণকে সন্ন্যাসিনীগণের কক্ষে যাইতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া গমন করিতে হয়। বিহার হইতে দূরে ভ্রমণকালে সন্ন্যাসিনীগণ একাকী গমন করিতেন না; কিন্তু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতে হইলে তাঁহারা একত্রে চারিজনের কম গমন করিতেন না। প্রতি মাসের উপবাস দিবসে বিভিন্ন বিহার হইতে বৈকালে বহু শ্রমণ সমবেত হইয়া কর্ম্মপদ্ধতি পাঠ ও সম্মানের সহিত উহা প্রতিপালন করিতেন।

আমি নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একদিন নিম্নশ্রেণীস্থ জনৈক ভিক্ষু এক প্রজার স্ত্রীকে এক প্রস্থ তণ্ডুল একটি বালককে দিয়া প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এই কার্য চাতুরী বলিয়া মনে করা হয় এবং এক ব্যক্তি এই ঘটনা সঙ্ঘের গোচরীভূত করে! শিক্ষককে আহ্বান ও পরীক্ষা করিলে তিনি ও তাঁহার সহযোগী অপরাধ স্বীকার করিলেন। যদিও তিনি কোন দোষ করেন নাই; তথাপি লজ্জিত হইয়া সঙ্ঘ হইতে নিজ নাম প্রত্যাহার করিয়া বিহার হইতে চিরদিনের জন্যে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গুরুদেব পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ অন্য ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। এবম্প্রকারে শ্রমণগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে গমন না করিয়া নিজেরাই অপরাধের বিচার করেন। স্ত্রীলোকগণ বিহারে প্রবেশকালে কদাপি যতিগণের কক্ষে প্রবেশ করে না; অলিন্দে থাকিয়া মুহূর্ত্ত-মাত্র কথোপকথন করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। ঐ সময়ে বিহারে রাহুল মিত্র নামক একজন ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, তাঁহার চরিত্র অনিন্দনীয় এবং তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত

হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সাত শত গাথা সমন্বিত রত্নকূটসূত্র পাঠ করিতেন। তিনি কেবল ত্রিপিটকেই পারদর্শী ছিলেন না; তিনি চতুর্বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শাস্ত্রেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্ব আর্যদেশের শ্রমণগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ হইতে তাঁহার মাতা বা ভগিনী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করেন নাই; তাঁহার মাতা বা ভগিনী তাঁহার নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার কক্ষের বহির্দ্দেশে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিবস আমি তাঁহাকে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি স্বভাবতঃই সংসারের প্রশক্তিতে আসক্ত; এরূপ না করিলে আমি উহার উৎস প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হই না। স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতে আমরা ভগবান দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে স্ত্রীলোকদিগকে দূরে রাখাই কর্ত্তব্য।"

উচ্চ শিক্ষিত পূজনীয় শ্রমণগণকে ও ত্রিপিটকে পারদর্শী ব্যক্তি-গণকে বিহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষগুলি ও ভৃত্য, সঙ্ঘ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। দৈনিক শিক্ষাদান কালে ইঁহারা ভিক্ষুদের উপর ন্যস্ত ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। বহির্গমন কালে ইঁহারা শিবিকায় গমন করিতে পারেন; কিন্তু অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ। অপরিচিত ভিক্ষু বিহারে উপস্থিত হইলে পাঁচ দিবস তাঁহাকে উত্তম খাদ্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা এবং বিশ্রামর্থ অনুরোধ করা হয়। এই কয়দিবস অন্তে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় গণ্য করা হয়। সচ্চরিত্র হইলে সঙ্ঘ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত বাস করিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার পদমর্যাদানুযায়ী শয্যাবস্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু শিক্ষিত না হইলে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় পরিগণিত করা হয়; পক্ষান্তরে, তিনি শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলে তাঁহার প্রতি উল্লিখিত ভাবে ব্যবহার করা হয়। এরূপ হইলে তাঁহার নাম তালিকা ভুক্ত

করিয়া তাঁহাকে ঐ বিহার-বাসী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাঁহাকে তখন বিহারের পুরাতন অধিবাসীর ন্যায়ই গণ্য করা হয়। কোন গৃহস্থ সদুদ্দেশ্যে সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করা হয় এবং তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহনেচ্ছু দেখিলে সর্বপ্রথমে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অতঃপর রাজ্যের তালিকার সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সঙ্ঘেরই ভিন্ন তালিকা আছে এবং তাঁহার নাম এই তালিকা ভুক্ত হয়। নিয়মভঙ্গ করিলে ও আচার প্রতিপালনে অন্যথা করিলে তাঁহাকে বিহার হইতে দূরীভূত করা হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করা হইত না। যতিগণ পরস্পরের নিকট আত্ম-দোষ স্বীকার করেন বলিয়া, পাপ বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই দমন হয়।[১]

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি আবেগ ভরে বলিলাম, "গৃহে বাস কালে আমি আপনাকে বিনয় পিটকে অভ্যস্ত মনে করিতাম, এবং কদাচ অনুমান করি নাই যে একদিবস এই স্থানে আসিয়া আপনাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিব। পশ্চিমাঞ্চলে না আসিলে কি প্রকারে আমি এই সকল যথাযথ আচার প্রত্যক্ষ করিতাম?"

১। সঙ্ঘের যে সকল বিধান দ্বারা মণ্ডলীর শাসন বা শাস্তি বিধান হইত, তাহার নাম "পাতিমোক্‌খ" (প্রতিমোক্ষ), পালি ধর্মগ্রন্থে যে পাতিমোক্‌খের বিধান আছে, তাহাই সর্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য, ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি॥ সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিধান একরূপ, তবে বিধানের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, পালিগ্রন্থ মতে ভিক্ষুগণের প্রতিমোক্ষের সংখ্যা ২২৭; চীনদেশে প্রকাশিত ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ে এই সংখ্যা ২৫০; তিব্বতে ২৫৩ এবং মহাব্যুৎপত্তিতে ২৫৯, বুদ্ধের আদেশ ছিল যে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ প্রতি পক্ষে একবার ঐ সকল নিয়মাবলী পঠিত হইবে, চারজন ভিক্ষু যেখানে সমবেত হইতেন, সেখানেই এই আবৃত্তি হইতে পারিত, প্রত্যেক বিধানের আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন ভিক্ষু তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা, লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্যভাবে সভায় বলিতে হইত।

উল্লিখিত আচারের অনেকগুলি সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ত্যাগ স্বীকার শিক্ষার জন্য, অন্যগুলি বিষয়ে দৃষ্ট হয় এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর বহুদিবস অতীত হওয়াতেও এইগুলি অবশ্য আচরণীয়। তাম্রলিপ্তির ভা-রা-হা বিহারের এইগুলিই ক্রিয়াপদ্ধতি। (আই-সিং,—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, একাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় কল্প-সমসাময়িক ভারত। চৈনিক পরিব্রাজক। পৃঃ ১০২—১০৭)

আই-সিং এই ভা-রা-হা বিহারে বসেই বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের 'সুহৃল্লেখ' গ্রন্থ ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করেছিলেন। 'সুহৃল্লেখ' পদ্যে লিখিত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র কবিতা। ইহা পত্রাকারে লিখিত। অর্থ—"ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট পত্র'। ইহা তাঁর পুরাতন দানপতি জেতককে উৎসর্গ করা হয়েছিল, শতবাহন[১] নামক এই নরপতি দক্ষিণ ভারতের সুবৃহৎ দেশাধিপতি ছিলেন। এই পত্রের সৌন্দর্য আশ্চর্য্য এবং সৎপথের জন্য উপদেশ গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ। তাঁর দয়া কুটুম্বিতা অপেক্ষাও অধিক এবং ঐ পত্রের বহুপ্রকার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখেছেন "ত্রিরত্নকে[২] সম্মান ও বিশ্বাস কর এবং আমাদের মাতাপিতার ভরণ পোষণ কর। আমাদের শীল রক্ষা করা কর্তব্য এবং পাপজনক কর্ম্ম পরিহার করো।"

"যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্র অবগত না হইব, ততক্ষণ কাহারও সংসর্গে থাকিবে না। অর্থ ও সৌন্দর্যকে সর্বাপেক্ষা কদর্য দ্রব্য বলে মনে করব। আমাদের সাংসারিক কার্যের সুবন্দোবস্ত করব এবং সর্বদাই মনে রাখব যে, এই পৃথিবী অনিত্য।" (আই-সিং, পৃঃ ২৭০—২৭১)

১। এই রাজা-কে ঠিক অবগত হওয়া যায় না, হিউয়েন-চোয়াং এঁকে দক্ষিণ কোশলের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন, আই-সিং 'সদবাহন' রাজার উদ্দেশ্যে এই কবিতা লিখিত হয় বলেছেন, তার নাম উদয়ন বলেছেন, আবার কেহ কেহ এঁকে শতবাহন রাজা বলে স্থির করেছেন।

২। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ।

আই-সিং পণ্ডিত রাহুল মিত্র সম্পর্কে যে সামান্য আলোকপাত করেছেন, তা' অত বড় পণ্ডিতের পরিচয়ের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই ডাঃ নলিনীনাথ সেনগুপ্ত তাঁর প্রণীত 'বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম" নামক গ্রন্থে বড় দুঃখ করে লিখেছেন—"আই-সিং দয়া করিয়া এই তথ্যটি না লিপিবদ্ধ করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, অতখানি রাহুল মিত্রের এই এতটুকু না জানলেও বাঙ্গালীর ইতিহাসের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না। এমন কত রাহুল মিত্রই বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন বিবরে লীন হইয়া আছেন, আই-সিং গণের ক্ষমতাও নাই তাঁহাদের প্রনষ্ট স্মৃতিতে আবার ক্ষীনতম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁহাদের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-জননীর ভাগ্যলিপিকে নিরর্থক নিষ্ঠুর খোঁটা দিতে চাই না। তবে আই-সিংকে অন্ততঃ মুখের একটি ধন্যবাদ দিতেই হয়। (বাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ৬৭)

ভা-রা-হা বা বরাহ বিহার তাম্রলিপ্তের যে কোথায় অবস্থিত ছিল, আজো তা, আবিষ্কৃত হয়নি। এই সুপ্রসিদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ যদি আবিষ্কৃত হোত তা'হলেও অনুমান করা সম্ভব হোত কত বড় ছিল এই সুপ্রসিদ্ধ বিহারটি। এই বিহারে যে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণগণ বাস করতেন, তাই নয় এখানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুনীও থাকতেন। আই-সিং এই বিহারের কোন বর্ণনা দেননি। কিন্তু এর নিয়মাবলী সম্পর্কে যেরূপ ভাবে প্রশংসা করেছেন, তা'তে মনে হয় তৎকালে এই বিহারটি বিবিধ জ্ঞানের রত্নখনি ত ছিলই অধিকন্তু দেশের তৎকালীন রাজা বা রাজপুরুষগণ অনেক জমি জায়গাও এই বিহার পরিচালনার জন্য দান করে ছিলেন। কারণ, আই-সিং নিজেই দেখেছেন বিহারের সম্পত্তিতে কৃষকগণ চাষ করতেন এবং তাঁরা উৎপন্ন শস্যের একভাগ মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে দিতেন এবং বাকি দু'ভাগ নিজেরা গ্রহণ করতেন। অন্যান্য নিয়মকানুন সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা' থেকে মনে হয় এই বিহারটি হয়ত

অট্টালিকা ছিল এবং এতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। এর পরিচালন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কালের কবলে এই বিখ্যাত বিহারটি হয় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে, না হয় বঙ্গোপসাগরের বার বার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পলি পড়ে পড়ে গভীর ভূগর্ভে চাপা পড়ে গেছে। কিম্বা আজকের সুউচ্চে স্থাপিত দেবী বর্গভীমার মন্দিরই হয়ত সেই বিখ্যাত বিহারের সামান্যতম অংশ। বর্গভীমার মন্দিরটি যে বৌদ্ধ মঠের অনুরূপ ভাবে নির্মিত তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের মত এই মঠটিকেও ব্রাহ্মণগণ রাতারাতি ধ্বংস করে কিরূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করেছিল, সে কাহিনী সম্পূর্ণ অবগত না হলেও কিংবদন্তীর মধ্যে আজো তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই বলেছি তাম্রলিপ্তে ধীরে ধীরে কিরূপ ভাবে বৌদ্ধ আধিপত্য ধ্বংস হচ্ছে তা ভ্রমণকারীদের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। হিউয়েন-চোয়াং যেখানে ১০টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন, সেখানে ৪৪ বছরের মধ্যেই চারটি বিহার ধ্বংস হয়েছিল নিশ্চয়ই। কেননা আই-সিং এসে মাত্র পাঁচ-ছ'টি সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন, এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় ব্রাহ্মণগণের বিপ্লব খুব তাড়াতাড়ি বিরাট আকার ধারণ করেছিল। এই বিপ্লব হয়ত বৌদ্ধ-অধ্যুষিত স্থানেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয়েছিল।

॥ অন্যান্য পরিব্রাজকগণ ॥

পরিব্রাজক আই-সিং এর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় ভারতে চীন থেকে প্রায় ৫৬ জন পরিব্রাজক এসেছিলেন। এঁদের অনেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দর ঘুরে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। কিন্তু এঁদের ভ্রমণ কাহিনী থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

"তবে তাঁহারা কোন পথে কি ভাবে আসিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ আলোচনা করিলে কোন্ কোন্ দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল পর্যটকের মধ্যে তাও-লিন, তাং-চেং-তেং, হুই-লুন, উ-হিং-চেং-কন, চাং-মিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধি সম্পন্ন। তাও-লিন যবদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পথে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাং-চেং-তেং, লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া বরাহ বিহারে বাস করিয়াছিলেন। যে বাণিজ্যপোতে তিনি তাম্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সেই বাণিজ্যপোত দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। হুই-লুন ও উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া ছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্তের সহিত যে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায়। (পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩)

॥ মহাস্থবির কালিক ॥

প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ষোলজন বিখ্যাত মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ষোলজন মহাস্থবির ছিলেন বৌদ্ধ জগতে বিশেষ বিখ্যাত ও সাধন পথে উন্নত। এঁদের পর আরও অনেক স্থবির জন্মগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এই ষোড়শ মহাস্থবিরের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে কালিকও ছিলেন একজন। কালিক জাতিতে বাঙালী। তিনি ছিলেন তাম্রলিপ্তের অধিবাসী। তাঁর জন্মস্থান খুব সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি কোন একটি গ্রামে। (Mem, As. Sac, of Bengali, Vol 1. No. 1, P. 2)

কিন্তু সমস্যা, এই কালিক যে কত খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, তার নির্দ্দিষ্ট কোন সময় আজো নির্দ্ধারিত হয়নি বা জানবার কোন উপায় নাই। তবে ডাঃ নলিনীনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন, মহাযান

সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে কালিক বর্তমান ছিলেন। স্থবির পূজা সম্ভবতঃ প্রথমে ভারতেই আরম্ভ হয়। তারপর ভারতের শ্রমণগণ খোটান দেশে প্রবর্তন করেন।

তাই বলে মহাযান সম্প্রদায় প্রাচীন নয়, ইহা সর্বাধুনিক। বৌদ্ধধর্মের মুখ্য দু'টি বিভাগ আছে। একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দু'টি যান প্রায় দু'টি বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি হীনযান পুরাতন ও মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দু'টি মতের মধ্যে নানারূপ বিভেদ আছে। কিন্তু মুখ্যত একটিরই উল্লেখ এখানে করা দরকার। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশু-পক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান কাজ। হীনযানে দেবদেবীর বালাই নাই। গৌতম-বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না তাঁর ভাই নন্দ যখন তাঁকে প্রণাম করেন তখন বুদ্ধ তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, প্রণামাদি দ্বারা তিনি সুখী হবেন না। তিনি সুখী হবেন তখনই যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে সদ্ধর্মের পালন করবেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মহাযান মতের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজা এবং স্থবিরপূজারও প্রচলন হয়েছিল। তা যদি না হোত, তবে হীনযান মতের প্রচার কাল থেকেই বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া যেত। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে কোন মূর্তির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়নি। তখন বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদির পূজা হোত।

।ইমনি কেল্লার দেবদেবী (উড়িষ্যা

বৌদ্ধ সংঘরামকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেছেন। দেবীর সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলি বিশেষরূপে পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে এই সত্য। আমরা এইগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করার আগে কিংবদন্তীগুলো উদ্ধৃত করব।

এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির যে কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, মহারাজাধিরাজ স্বয়ং তাম্রধ্বজ কর্তৃক এই দেবী ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাহিনীটি এই—

"নরপতি তাম্রধ্বজের নিয়োজিত ধীবরপত্নী প্রত্যহ রাজসংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত। সে একটি বনমধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটি দেবীমূর্তি রহিয়াছে, তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।" তামালুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৬ ও ১৭ পৃঃ।

ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেন, "নূতন রাজা কালুভূঞা নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারম্ভ করেন, ঐ ঠাকুর বর্গভীমা নামে বিরাজ করিতেছেন। এই ঠাকুর প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুরীতে জগন্নাথদেব প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেরূপ গল্প আছে, ইহা ও অবিকল সেই জাতীয় গল্প। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ দেব উড়িষ্যার দক্ষিণ জঙ্গল

প্রদেশে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারানুসারে একরূপ গল্প রচনা হইয়াছে, আর তমোলুক সমুদ্রকূলবর্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের মনের ভাব ও স্থানের অবস্থানুসারে গল্প অন্যরূপ বাঁধা হইয়াছে। জগন্নাথ দেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন, এবং এক ব্যক্তির বাটীতে পাওয়া যায়, আর এখানকার বর্গভীমা দেবীকে একজন ধীবরের বাটীতে পাওয়া যায়। জগন্নাথ দেব কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবী পাথরের, প্রথমতঃ উভয়কেই নীচ জাতীয় লোকে গোপনে পূজা করিত, তাহার পর রাজগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কৃত দেবতাদ্বয়কে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে যাত্রী আসিতে লাগিল, এবং এই নূতন ঠাকুরদ্বয় প্রকাশ হইবার পরেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পুঁথি বাহির করিয়া নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" Hunter's Orissa, Vol. I.P.311.

ভূরিশ্রেষ্ঠের ইতিহাস লেখক ৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, ভূরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণরাজ বংশের অষ্টম পুরুষ রাজা শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের ভ্রাতা রাজা শ্রীমন্ত নারায়ণ রায় দেবী বর্গভীমার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়ে প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধ্বংস হয়ে যায়। এই পুস্তকে লেখা আছে—

"শ্রীমন্ত বাঙ্গালার সুলতানের অল্পবিস্তর পৃষ্ঠপোষকতায় সুকৌশলে ও বীর্যবলে উড়িষ্যা রাজকে পর্যুদস্ত করিয়া মেদিনীপুরের পূর্বসীমা হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উড়িষ্যাপতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে একাধিক বার বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সুসজ্জিত নৌবহর দামোদর ও রূপনারায়ণ নদে ভাসমান থাকিয়া শত্রুর গতিরোধ করিত। তিনি তমলুকে বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।" রায়বাঘিনী, অভিনব সংস্করণ, পৃঃ ৫১-৫২।

আবার কাহারো কাহারো মতে ধনপতি সওদাগর নাকি এই মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

"দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট একখণ্ড পারসিক ভাষায় লিখিত দলিল রহিয়াছে, ইহাকে তাঁহারা "বাদসাহী পঞ্জ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন (খ্রীঃ ১৫৬৭-৬৮) দুরন্ত কালপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি দেবীকে সন্দর্শন করত প্রীত হইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন।"[২]

কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আজ থেকে চারশত বছরেরও আগের কথা। হুগলী জেলার দামোদর নদের তীরে এক গ্রামের এক অভিমানী ছোট-ছেলে মায়ের ওপর রাগ করে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়ে বসেছিল ঐ দামোদরেরই তটভূমির জনহীন একটি স্থানে স্থাপিত এক চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের কাছে। ঘুম নেমে আসে চোখে। চণ্ডী-দেউলের দুয়ারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক।

'রাজু ঘরে ফিরে আয়!'

স্বপ্নের মধ্যেই এক আকুল কণ্ঠের এই আহ্বান শুনতে পেয়ে

১ "Another legend relates, how a famous merchant, named Dhanapati, the Lord of Wealth, when sailing down the Rupnarayan in his ship, anchored at Tamluk. While here he saw a man carrying a golden jug, who told him that a spring in the neighbouring jangle had turned his
.that a spring in the neighbouring jungle had turned his
brass vessel into a golden one, and pointed out the well. The merchants according bought up all the brass vessel, in the market transmuted them into the precious metals sailed to ceylon, where he sold them to the natives and returning, built the great Tamluk temple. The skill and ingenuity displayed in the construction of the temple still attract admiration."

A Statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 64

২ তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৭ পৃঃ

ঘুম ভেঙে গেল বালকের। ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারে, মিথ্যা নয় এই স্বপ্ন। সত্যিই একটা ব্যাকুল মায়ার স্বর যেন চণ্ডী দেউলের চারদিকে ছুটোছুটি করে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'রাজু ঘরে ফিরে আয়!'

দেউলের দুয়ার হতে ছুটে যেয়ে মায়ের আঁচল ধরেছিল সেই বালক। তার নাম রাজু, চারশত বছর আগের হুগলী জেলার ভুরস্থটের এক ব্রাহ্মণকুমার—রাজীবলোচন রায়।

কে জানে কেমন করে সেই রাজীবলোচনই আবার একদিন কোন্ দুঃস্বপ্নের অভিশাপে কার ওপর রাগ করে আর কিসের অভিমানে 'কালাপাহাড়' হয়ে গেল। মন্দিরের শিখর ভূপাতিত করে, দেউলদ্বারের কপাট চূর্ণ করে, দেবশীলা দীর্ণ করে আর নীলাচলের দারু-ব্রহ্ম দগ্ধ করে উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছিল যে ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড়, সে-ই ত ছিল দামোদর তটের এক গ্রামের এক হিন্দু মাতার আঁচল ধরা অভিমানী ছেলে রাজু। নবাব দুহিতার প্রেমে মুসলমান হয়েছিলেন, আর স্থলেমান কররানির সেনাপতি হয়েছিলেন।

একদিন অভিযানে চলেছেন কালাপাহাড় উড়িষ্যার অভিমুখে। সে অভিযানের পথে দেউলের দুয়ার আর দেবশিলা চূর্ণ করে এগিয়ে চলেছেন কালাপাহাড়। এই ভাবেই এক সন্ধ্যায় রূপনারায়ণের তটে যে স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন কালাপাহাড়, সেই স্থানের নাম তমলুক।

কালাপাহাড়ের শিবির জেগে উঠেছে রূপনারায়ণের তটে। মন্দিরচূড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন কালাপাহাড়। আর কতক্ষণ! রূপনারায়ণের বুক থেকে বহু শতাব্দীর শ্রদ্ধায় লালিত মন্দির-চূড়ার সে ছায়ার জীবন আর কতক্ষণ?

একাকী এগিয়ে চললেন কালাপাহাড়। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের দেবীগৃহের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়।

বেলা বাড়ে। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে ওঠে চতুর্দ্দিক। রূপনারায়ণের বুক থেকে হু-হু করে ছুটে আসে শীতল বাতাস। চোখের পাতায় ঘুম টেনে আনে। তারপর, তারপর সেদিনের তমলুকের পাঠান সৈন্যের শিবির তখন কল্পনাও করতে পারে না যে, দেবী বর্গভীমার সম্মুখে এক শীতল সুচ্ছায়ের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

কে জানে, কি স্বপ্ন দেখে অমন করে চমকে উঠেছিলেন কালাপাহাড়? ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। উৎকর্ণ হয়ে আর চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন কালাপাহাড়।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখেই একবার দেবী বর্গভীমার দিকে তাকালেন। মনে হয়, হাসছেন দেবী বর্গভীমা। সেদিন সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য ধ্বংসোন্মাদ কালাপাহাড় গ্রাম্যবালক রাজু হয়েই গিয়েছিলেন।

দূরে নিক্ষেপ করলেন লৌহ-লগুড়। কাগজের ওপর নিজের পাঞ্জার ছাপ এঁকে দিয়ে দেবী বর্গভীমার উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধার বাণী লিখলেন। দেবী বর্গভীমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়।

কালাপাহাড়ের সেই শ্রদ্ধার দলিল আজও দেখিয়ে দিতে পারেন দেবী বর্গভীমার মন্দিরের পুরোহিত। মূর্তিনাশক কালাপাহাড় জীবনে প্রথম ও একমাত্র যে মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেও ধ্বংস করতে পারেননি, সেইমূর্তি আজও তমলুকের মন্দিরে আরতির আলোকে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠে[১]।" "কিংবদন্তীর

১। কালাপাহাড়ের জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতদ্বৈধ আছে। তিনি নাকি জালাল সাহের সময় বর্তমান ছিলেন (১২৬০-১২২৩)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বৃহৎ বঙ্গ" দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাঁজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালা-পাহাড়ের জীবন চরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

দেশে,"—'সুপান্ত'। প্রলাপ পত্রিকা—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১ (১৯৫৪) থেকে সংগৃহীত।

বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দীর সময় বাংলাদেশে বর্গীর অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। সেই সময় বর্গীগণ তমলুকেও এসে লুণ্ঠন আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ১১৩ পৃষ্ঠা ও Imperial Gazetteer of India, Vol., III, P. 515 পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ (বর্গী) নিম্ন বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নরপিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর, শান্তিপ্রিয় জনগণ সমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, এবং ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সেই হৃদয় বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তমলুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোনপ্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল।"

এবার আমরা একটি অত্যাধুনিক কাহিনীর কথা আলোচনা

তাঁহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়, তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে (থানা মান্দা) তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে রারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাদের উপাধি ভাদুড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশ জাত ('জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুঙর"—কৃত্তিবাস)। কালপাহাড়ের পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল ভুঁইয়া। অপর পক্ষে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে" পেঁড়ুয়াগড়ের রাজা অমরেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন···।" পৃঃ ১৪৭।

করব। এটি একটি সত্য ঘটনা। 'হিন্দু' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় শ্রীযুত ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় "শ্রীশ্রীবর্গভীমা মা" নামে একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করেছেন। উক্ত 'হিন্দু' পত্রিকাটির ৩৯৭-৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাত্র আমার কাছে আছে। উক্ত পৃষ্ঠা কটিতেই এই কাহিনী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমগ্র পত্রিকাটি না থাকার জন্য উহা কত সালে প্রকাশিত ও কত বর্ষের তা সঠিক ভাবে কিছু জানান সম্ভব হোল না। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

"একদিন মনের যখন এই রকম অবস্থা সেই সময়ে আমার পড়ার ঘরে আমার এক বন্ধু এসে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে সে বলে উঠলো "হাঁরে, দেবদেবী মানিস? আমি কিন্তু ভাই এখন মানি।" মহা নাস্তিক বন্ধুটির মুখে একথা শুনে আমি বিশেষ বিস্মিত হলুম। বন্ধুটি যা বললে তা এই—রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছিল এক চমৎকার দেবীমূর্তি হাতছানি দিয়ে যেন তাকে ডাকছেন আর মন্দিরে যাবার সব পথগুলির নির্দ্দেশও যেন তিনি বন্ধুটিকে দিয়ে দিলেন। পরদিন বন্ধুটি সেই স্বপ্ন-কল্পিত পথ ধরে সেই দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল, এবং কি জানি কেন, সেই মূর্তি দর্শনের পর থেকে বন্ধুটির মনে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তার মুখে শুনলাম দেবীমূর্তির নাম বর্গভীমা এবং উহা তমলুক সহরের নিকটেই অবস্থিত। আমার ভবঘুরে মন বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠলো। বন্ধুকে নিয়েই সেই রাত্রে চললুম বর্গভীমা দেবী দর্শনে।

ট্রেন চলেছে তার সামনের অন্ধকার কেটে টুকরো টুকরো করে, অবিশ্রান্ত গতিতে—আর লাইনের দু'ধারে চলেছে ক্ষেতের পর ক্ষেত, আবার ক্ষেত—এর সীমা নাই শেষ নাই—ক্ষেত আর ক্ষেত—আর তার সারা গায়ে ছড়িয়ে গেছে ঘন জমাট অন্ধকার।

এমনি ভাবেই উৎসাহে ও আনন্দে চলেছি। অন্ধকার রাতের

মায়া আমার চোখে কি মোহন তুলির ছোঁওয়া দিয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে পান করে চলেছি রাতের নিস্তব্ধতার রূপ। তারপর যখন চমক ভাঙলো তখন দেখি রূপনারায়ণের পুলের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। আজকের রঙীন চোখে আমার কাছে জগৎটা লাগছে বেশ মিঠে, রূপনারায়ণ নদের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখে মনে পড়লো বহুদিন আগে লিখিত আমার কবিতার দুইটি ছত্র—

"যবে আসি যাই, তোমা পানে চাই, অপলকে থাকি চেয়ে,
পুলকিত তনু, তোমার চরণে, উচ্ছাসে পড়ে নুয়ে।"

পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে বাসে করে তমলুক উপস্থিত হলুম। সেখান থেকে পদব্রজেই "বর্গভীমা" দেবীর মন্দিরে যেতে হয়। পাথরে খোদাই করা দেবীর চতুর্ভুজা ছোট মূর্তি চিত্তাকর্ষক ভক্তি উদ্রেককারী। পর্তুগীজেরা যখন বাণিজ্য করতে তমলুকে আসেন সেই সময়েও এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে মহিষাদলের রাজবাড়ী মায়ের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেছেন, প্রতিমা দর্শনে আমাদের মনে যে অভূতপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হয়েছিল, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পূজারী ঠাকুর আমাদিগকে সযত্নে দেবীর চরণামৃত ও প্রসাদ দিলেন। অদূরে দেখলুম একব্যক্তি অতি সঙ্কোচে মন্দির আঙিনার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। পূজারী ঠাকুরের দৃষ্টি সেদিক এড়ালো না, তিনি তাহাকে ডেকে ঠাকুর দর্শন করতে বললেন। অতি বিনীত কণ্ঠে উত্তর এল—"আমি যে নীচ জাত—চাঁড়াল,—আমার কি ঠাকুর দালানে উঠে, ঠাকুর দেখতে আছে?" পূজারী বললেন, "খুব আছে ভাই, মায়ের সব ছেলেই সমান।"

উপরিউক্ত কাহিনীগুলিকে নিছক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোন কোন কাহিনী যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্বশেষ কাহিনীটির মধ্যে

কোন অলৌকিকতা নাই, তবে দেবী স্বপ্নে নাস্তিককে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন মাত্র এবং দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাসী করে তুলেছেন। এ কাহিনীটির মূলে হয়ত কিছু সত্য আছে কিন্তু কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান নাই। ভক্তগণ দেবী যে জাগ্রত এ কাহিনী থেকে এই সত্য প্রচার করতে পারেন মাত্র।

প্রথমোক্ত কিংবদন্তটি মেছুনির মরা মাছ বাঁচানোর গল্প। এতে স্পষ্টই মনে হয় যখন দ্বাদশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত থেকে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই সংঘারামটি সমুদ্রের তীরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে! কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগেই এখান থেকে বৌদ্ধগণ চলে যান। ব্রাহ্মণদের প্রতাপ ও প্রাধান্য তখন অপ্রতিহত। তাঁদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ আগে থেকেই জানতেন এখানে এক-কালে বৌদ্ধ-সংঘারাম ছিল। তখন তাঁরা কোন নীচ-জাতীয় লোককে অর্থদ্বারা বশীভূত করে তৎকালের রাজার নিকট উক্ত স্থানের অলৌকিক মাহাত্ম্য শোনায়। রাজা এতে সহজেই আকৃষ্ট হন এবং দেবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ভক্ত হয়ে পড়েন, তৎকালে রাজাকে দেশবাসিগণ দেবতা জ্ঞানে পূজা করত এবং রাজাদেশকে দেবতাদেশ মনে করে তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। অতএব ব্রাহ্মণগণ এই সুযোগে বৌদ্ধ-মন্দিরকে হিন্দু-মন্দিরে পরিণত করেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দিরও এককালে এইরূপ বৌদ্ধ-মন্দির ছিল। এই বৌদ্ধ-মন্দিরকে ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে রাতারাতি হিন্দু-মন্দিরে পরিণত করেন, সে কাহিনী পুরী অঞ্চলে আজো কোথাও কোথাও শোনা যায়। প্রবীণ পাণ্ডাগণকে বেশী কিছু উৎকোচ দিলে আজো নাকি তারা বুদ্ধ-মূর্তিকে একটি গোপন প্রকোষ্ঠে দেখিয়ে থাকেন। আসলে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা —বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক। এ সম্পর্কে প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত গান আছে, তা হোল—

"পুন তা ত্যজিয়া বুদ্ধ অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিন ॥"

(চণ্ডীদাসের পদাবলী। রমণীমোহন মল্লিক, ২য় সংস্করণ পৃঃ ৬০। নীলরতন মুখোপাধ্যায় সংস্করণ, পৃঃ ১৮।)

বর্গভীমার মন্দির সম্পর্কে আজ থেকে ৬৬ বছর পূর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের সারসংগ্রহ। রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয় বলেন—

"বর্গভীমার মন্দিব পূর্বে বৌদ্ধ-মন্দির ছিল; ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উহা কালীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মহাসমারোহে ঐ মন্দির মধ্যে কালীমূর্তি সংস্থাপিত করেন। এখনও সেইখানে কালীমূর্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুস্তকসমূহে এই মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। সার উইলিয়াম হাণ্টার বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, ইহা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার বিরচিত। এই মন্দির অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে গঠিত; কিরূপে সেই সকল প্রস্তর অত উচ্চে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেস্থানে এই মন্দির সংস্থাপিত, সেস্থান সহর অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড় ও বানের সময় বহুসহস্র সহরবাসী সেখানে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।"

(সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩০৪। পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০)

রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের মতও আমাদের মতের স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। মন্দির সম্পর্কে আরো তথ্য দিয়েছেন "তমলুক মঙ্গল"

রচয়িতা গিরিশচন্দ্র সরস্বতী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর পুস্তিকায়। তিনি লিখেছেন—

"ভীমাদেবীর কথা কি আর স্বয়ং জগদ্ধাত্রী মাতা,
ষট্ সংবাদে উক্ত আছে নয়ক তাহা কথার কথা।
তোমার অধিষ্ঠাত্রী তিনি উচ্চ পীঠে আছেন বসি,
যাঁর কৃপাতে বেঁচে ছিল বিপদগ্রস্ত মুনি-ঋষি।"

তারপর লেখক পাদটীকায় লিখেছেন—"মন্দিরটি কতদিনের তাহা কেহই জ্ঞাত বা শ্রুত বলিয়াও বলিতে পারেন নাই। আকৃতি দেখিলে এই মন্দির বৌদ্ধ যুগের বলিয়াই বোধ হয়। বাং ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ৪।৩৭ ঘণ্টার সময় যে ভূমিকম্প হইয়া ৪।৫৭ মিনিট স্থায়ী ছিল তদ্বারায়, বিলাতী শিক্ষিত ইংরাজ শিল্পী নির্মিত ইংরাজ রাজ্যের প্রধান রাজধানীস্থিত মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের গৃহের শীর্ষদেশের চূড়া ও সেণ্টপল গীর্জার চূড়াদি, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার নির্মিত অট্টালিকা ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দু-শিল্পী নির্মিত এই বহু পুরাতন মন্দিরের কোন অংশের অনিষ্ট হয় নাই। কেবল ১২৭৩ সালের ভীষণ ঝটিকায় চূড়ার চক্রটি পড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহা স্বুবর্ণ নির্মিত হইয়াছে। যাঁহারা অশিক্ষিত বলিয়া ভারতের শিল্পীগণের উপর খড়গহস্ত ও গৌরাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার ভিন্ন পছন্দ করেন না সেই মহানুভবগণ এই বিষয় অনুধাবন করিলে নিশ্চিতই লজ্জিত হইবেন।"

(তমোলুক মঙ্গল, পৃঃ ১৪-১৬)

এবার বর্গভীমার মন্দিরের বর্ণনা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই মন্দিরের অবস্থান ও নির্মাণের কৌশল দেখলে মনে হয় প্রাচীনকালে এই মন্দিরটি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সংঘরামের অংশবিশেষ ছিল।

মন্দিরের "বাইরের গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের (Band size) মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ, এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান

যা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুগণ একা একা নির্জনে উপাসনা করিতেন ; এবং সম্ভবতঃ প্রধান বিহারে শিষ্যগণকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত উপদেশ প্রদান করিতেন। পরে হিন্দুগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া পূর্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র বিহার (Side Rooms) ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহারও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্রবিহারের উপর পশ্চিম-দ্বারী করিয়া এক মন্দিররূপে নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থিত এবং উক্ত বেদীর উপরেও মন্দিরটি ৫০ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়।" (তমোলুক ইতিহাস, পৃঃ ১০৭-১০৯)

"যেস্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ৩০ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ প্রস্তুত করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর ৯ ফিট ভিতবিশিষ্ট তেহারা (Three folds form one compact wall) প্রাচীর (অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরে ইষ্টক এবং মধ্যে প্রস্তর দ্বারা) প্রস্তুত পূর্বক ৬০ ফিট উচ্চ করিয়া খিলানাকারের গোল ছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে।"

A statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 65.

তমলুকের ভূ-প্রকৃতি সমতল। সমুদ্রের সন্নিকটে এই নিম্নভূমি সমুদ্রেরই দান। এর কাছাকাছি কোথাও কোন পর্বতাদি নাই। এমতাবস্থায় এই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড হয় স্থলপথে না হয় জলপথে জাহাজে করে তবেই এই স্থানে নীত হয়েছিল, এতে আর আশ্চর্যের কিছু নাই। তবে এই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড যে কিরূপে অত উর্ধ্বে উত্তোলন করে তা' যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, তা' ভাবতে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম হণ্টার সাহেব বলেন—

"Among the objects of note at Tamluk are a temple of great sanctity and of much architectural interest, dedicated to Bargabhima."

Imperial Gazetteer of India, Vol. V.IP. 381.

এই মন্দিরেয় সম্মুখে আর একটি ছোট মন্দির আছে। এর নাম যজ্ঞ-মন্দির। এই মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। কথিত আছে, একটি পতিপুত্রবিহীনা বৃদ্ধা সূত্র প্রস্তুত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই ইহা প্রস্তুত হয়।

(তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, পৃষ্ঠা ১৯)

যজ্ঞমন্দির ও মূল মন্দির একটি খিলানদ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহাকে জগমোহন বলে। এছাড়া সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদির জন্য একটি ছাদবিশিষ্ট প্রশস্ত দালান আছে, ইহাকে নাট্যমন্দির বলে। এরপর সম্মুখে দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা ছিল। এই নহবৎখানা এখন আর বর্তমান অবস্থায় নাই। সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে পাকশালার গৃহাদি ও উত্তরে কুণ্ড পুষ্করিণী আছে। এবং দেবীর নীচে, সোপানাবলীর উত্তরে, ভূতনাথ ভৈরব ও তাঁর মন্দির আছে।

মোটামুটিভাবে এই হোল মন্দিরের বর্ণনা। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় ইহা এককালে একটি ছোটখাট বৌদ্ধ সংঘারাম বা সংঘারামের অংশবিশেষ উপসনালয় ছিল।

বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামে অনেক পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে গৃহে বাস করতেন তাকে বিহার বলে। বিহারগুলি সাধারণত একচাল বিশিষ্ট হোত। "সুপন্ন বঙ্ক গেহ।" গড়ুর পাখীর ডানার ন্যায় বাড়ী। আর এইরূপ কতকগুলি গৃহ বা বিহার শুধু বিহার হলেই চলবে না। বিহারের সংলগ্ন 'আরাম' (বাগান), 'চেতিয়' (ভোজনাগার), 'জন্তাগার' (স্নানকক্ষ), 'উপস্থানশালা' (সভাগৃহ), 'অগ্নিশালা' (রন্ধনাগার), 'কোষ্ঠক' (ভাণ্ডার গৃহ),

'বর্চ্চঃকুটি' (পায়খানা), 'পরিবেন' (প্রথমে এর অর্থ ছিল কতকগুলি বিহার অর্থাৎ কক্ষের সমষ্টি। পরে অর্থ হয়েছিল প্রকোষ্ঠ, কলম্বো নগরের "বিদ্যোদয় পরিবেন" অথবা 'মিলিন্দ পঞ্হো" গ্রন্থে বাণত" সংঘেস্য পরিবেন।"

উপরিউক্ত সমস্ত গৃহের সমষ্টিকে একসাথে "সংঘরাম" বলে। সাধারণভাবে অর্থ দাঁড়ায় এই—আজকাল আমরা আশ্রম বলতে যেমন সমস্ত কিছুকেই অর্থাৎ লাইব্রেরী, ক্লাসরুম, অফিস, উপাসনালয়, ভোজনালয় প্রভৃতি আশ্রমের সমস্ত অঙ্গগুলিকেই বুঝি। সেকালে তেমনি "সংঘারাম" বলতে একটি সুবৃহৎ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বৌদ্ধমঠকে বুঝাত। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'সংঘারাম' বড় ছোটও ছিল।

এখন এই সিদ্ধান্তের মূলে আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, বর্গভীমার মন্দিরও একটি ছোটখাট "সংঘারাম"। এখনো যদি কোন দর্শক যেয়ে মনোযোগ সহকারে দেখেন, তবে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে মূল মন্দিরের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট গৃহ বা বিহার ছিল। কালের কপোল তলে আজ তার অনেকগুলিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবুও দু'চারটির অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বর্তমানের মূল মন্দিরটিতেই থাকতো বুদ্ধের প্রতিমূর্তি এবং খুব সম্ভব হয়ত প্রধান আচার্যও এইখানে বাস করতেন। ঐটিই হয়ত ছিল 'উপস্থানশালা'। ঐ স্থানেই আশ্রমের সমস্ত শ্রমণগণ মিলিত হয়ে সমবেতভাবে উপাসনা করতেন এবং ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আর মন্দিরের চারপাশে যে ছোট ছোট গৃহগুলি ছিল, তাতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ থাকতেন এবং 'সংঘারামে"র অন্যান্য বিভাগগুলিও থাকত। মূল মন্দিরের উত্তরে কুণ্ড বা পুষ্করিণীর দিকে ভাল করে দেখলে মনে হয়, পূর্বে ঐ পাশে আরো কিছুটি অংশ ছিল যেখানে আশ্রমের অন্যান্য বিভাগগুলি ছিল।

এত উঁচু করে এই মন্দিরটি নির্মাণের একমাত্র কারণ বোধহয় বার বার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে এটিকে রক্ষা করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহানগরী সমুদ্রের জল প্লাবনে ধৌত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাহা ১৭৩৭ কিংবা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা ও জল প্লাবনের অনুরূপ বলে অনেকের ধারণা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক মহাশ্মশানের মত বিরাটভাব পরিগ্রহ করে। এই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে তমলুক সমভূমিতে পরিণত হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৪০০ গৃহের মধ্যে মাত্র ২৭টি অবশিষ্ট ছিল। বাকি সমস্তগুলি জলপ্লাবনে সমুদ্রগর্ভে ভেসে গিয়েছিল। 'Imperial Gazetteer of India Vol. VIII. P. 514 Manshman—History of Bengal, 8th Edition, P. 104.)

এই বৌদ্ধ মন্দিরটি পূর্বে সমুদ্রের ধারে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে ভগবৎ আরাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন প্রাতঃকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ শয্যাত্যাগ করে নীলাম্বুধির বিরাট শান্তরূপ অবলোকন করে ধ্যাননিমগ্ন হতেন। খুব সম্ভবত এর দরজা তখন পূর্বদিকেই ছিল। পরবর্তীকালে যখন এই মন্দিরটিকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করা হোল তখন রাজবাড়ীর দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দুয়ারী করা হলো। কারণ, রাজা যেন প্রতিদিন উঠেই এই দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে পারেন। অন্য কারণ হোল পূর্বদিকে একেবারে গা ঘেঁসেয়ে সমুদ্র থাকার জন্য যাতায়াতের কোন জায়গাই ছিল না। আমরা ছোটবেলা দেখেছি রূপনারায়ণ নদী এই মন্দিরের একেবারে ধার দিয়ে প্রবাহিত হোত। বর্তমানে প্রায় আধ মাইল দূরে চর পড়ে সরে গিয়েছে। আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক 'তমলুকের ইতিহাস' লেখক সেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখেছেন—

"কথিত আছে, ভীম তরঙ্গাঘাতে পাছে দেবীমন্দির বিনষ্ট

হইয়া যায়, সেই জন্য নদীর বেগমান স্রোতঃ মন্দিরের নিকটবর্তী হইয়া মস্তক অবনত করতঃ নীরবে মন্দিরের গাত্র স্পর্শ করে। ইহা অত্যধিক আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবীর এতাদৃশ অনুগ্রহ সত্ত্বেও কালে তাম্রলিপ্তের শৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প, বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিদ্যা-সভ্যতা সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" (তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ১০২)

জানিনা এ দেবীর অলৌকিক কেরামতি কিনা, তবে আজ পর্যন্ত যদি ভীম তরঙ্গ রূপনারায়ণে প্রবাহিত হোত, তা'হলে অতীতের এই ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও হয়ত বর্তমান থাকত কিনা সন্দেহ।

কোন কোন ঐতিহাসিক কিন্তু এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁদের মতে স্বয়ং তাম্রধ্বজই এই দেবীমূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখেছেন—

"আরও অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দারা বর্গভীমা দেবীর ও তাঁহার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্ব সূচিত হয় মাত্র। বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই দেবীমন্দির বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন যে, বৌদ্ধযুগের পর এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে—তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।" (তমলুকের ইতিহাস—পৃষ্ঠা, ১০০)

বর্গভীমাকে অনেকে চণ্ডীগ্রন্থোক্ত ভীমা দেবী বলে মনে করেন। ৫১ পীঠের মধ্যে তমলুকের বর্গভীমাও একটি পীঠস্থান এই ধারণা আজো অনেকের আছে। কিছুদিন আগে পি. এম বাকচি-র পঞ্জিকাতে তমলুকের এই দেবীকে একটি পীঠদেবী বলে উল্লেখ দেখেছিলাম। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই দেবীর মূর্তি একটি প্রস্তরের সম্মুখভাগ খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। এই মূর্তির গঠন উগ্রতারা মূর্তির অনুরূপ। প্রতিকৃতিটি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত। এরূপভাবে খোদাই করা প্রতিমূর্তি সচরাচর বড় একটি দেখা যায় না। এই দেবীর ধ্যান ও পূজাদি যোগিনী মন্ত্র ও নীল-তন্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়।

মার্কাণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যে লেখা আছে—"ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" এই শ্লোক থেকে মনে হয় ইহা বোধহয় বর্গভীমা দেবীর সম্পর্কেই লিখিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র শ্লোকটি পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় ইহা হিমাচল-বাসিনী কোন ভীমাদেবীর উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হোল—

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়রিষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৬৬ ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥"

একনবতিতমাঽধ্যায়ঃ, মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, পৃষ্ঠা, ১৪৫

(পুনর্বার যখন আমি মুনিদিগের রক্ষার জন্য হিমাচলে ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে ক্ষয় বা নাশ করিব, তখন মুনি সকল নম্রমূর্তি হইয়া তামার স্তব করিবেন; এই জন্য আমার ভীমাদেবী এই নাম বিখ্যাত হইবে।)

সতীরবাম গুলফা যেখানে পড়েছিল সেখানে ভীমারূপা এক দেবীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই দেবী তমলুকের নয়। বিভাসেই এই তীর্থ অবস্থিত। এ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র রায় "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে লিখেছেন—

"বিভাসেতে বাম গুলফা ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০ ॥"

(সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে বাংলা ১৩১৪ সালে মুদ্রিত। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা, ১৪) কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তমলুকের এই দেবী সম্পর্কে লিখেছেন—

"গোকুলে গোমতীনামা তাম্রলিপ্তে (তমলুকে) বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।"

(অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত "প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ৭ ও ৩০ পৃষ্ঠা। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী।")

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশত বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। (যাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা = ১৪৬৬) মুকুন্দরামের এই উক্তি থেকে মনে হয় কবি হিমাচলবাসিনী ভীমাদেবী থেকে স্বতন্ত্র বুঝাবার জন্য তিনি 'বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাই বলে তিনি তমলুকের ভীমাদেবীকে ৫১ পীঠের এক পীঠ বলে কোথাও বলেন নি।

আমার নিজগ্রাম বরগোদায় দেবী বর্গীশ্বরী আছেন। প্রবাদ ইনি নাকি তমলুকের বর্গভীমার ভগ্নি। একটি সুবর্ণময় নৌকার দু'পাশে দু'জন দেবী আরোহণ করে আছেন। বরগোদা তমলুক থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে একটি সুবৃহৎ ঢিপি আছে। অনেক প্রাচীন নিদর্শন এখান থেকে আমি আবিষ্কার করেছি। পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গীগণ এসে জঙ্গলের মধ্যে দেবীকে দেখতে পান। প্রবাদ, বর্গীরা নাকি এই দেবীর পূজা করে তবেই লুণ্ঠন করতে বেরুতেন। বর্গীদের আরাধিত ঈশ্বরী তাই বর্গীশ্বরী নাম। তমলুকের রাজা এই দেবীর পূজার্চনার জন্য কয়েক বিঘা জমি ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন। দেবীর কোন মন্দির পূর্বে ছিল না। মাটির বাড়ীতেই দেবী থাকিতেন। বর্ত্তমান গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ একটি ছোট পাকার মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। এই দেবীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম বরগোদা হয়েছে। তাই বলে বর্গীশ্বরী শুধু বরগোদারই আরাধ্যা দেবী নন। আশপাশের সাত গ্রামের অধিবাসীগণ এই দেবীকে তাঁদের আরাধ্যাদেবী বলে দাবী করে থাকেন। পূর্বকালে এই স্থানের সাথে তমলুকের বিশেষ ভাবে সংযোগ ছিল বলে অনুমিত হয়। 'বড়খাল' বলে একটি বৃহৎ খালের চিহ্ন আজো এই স্থানের সন্নিকটে

আছে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। যাই হোক বর্গভীমা ও বর্গীশ্বরীর মধ্যে যে একটি বিশেষ রহস্য নিহিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্গীশ্বরীর মধ্যে যে একটি বিশেষ রহস্য নিহিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্গীশ্বরীর মূর্তির পাশে একটি অশ্বপৃষ্ঠে বীরপুরুষের মূর্তি খোদাই করা আছে। অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটি অকালে সবিশেষ জানা সম্ভব হোত। তবুও এই মূর্তিটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

॥ তাম্রলিপ্তে জৈনধর্ম ॥

বৈদিক যুগের শেষভাগ ভারতের ধর্মজগতে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল। বৈদিক ধর্ম তখন অত্যন্ত জটিল, নীরস ও সাধারণের দুর্বোধ্য অনুষ্ঠান বহুল কর্মবিধিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় সমাজের উপর প্রভুত্ব করে এসেছিলেন, তাঁদের সে প্রভুত্ব ক্রমে হীনপ্রভ হয়ে উঠেছিল। তৎকালে ভারতের এই বেদবিরোধী ধর্মবিপ্লবের নায়ক ছিলেন ক্ষত্রিয়। সুতরাং একে একাধারে ক্রিয়াসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের এবং ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় সমাজের বিদ্রোহ বলা যেতে পারে।

বেদবিরোধী যে দু'টি প্রধান ধর্মমত তৎকালে ভারতে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান। তাম্রলিপ্তে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধপ্রভাবের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এবার জৈন ধর্মের কথা আলোচনা করব। জৈনদের মতে ঋষভদেব থেকে পর পর চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রায় সকলের সাথেই বাঙালীর সংযোগ ঘটেছিল। জৈন ধর্মের শেষ দুই তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। পার্শ্বনাথ কাশীর রাজবংশে খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। পার্শ্বনাথই জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এই পার্শ্বনাথ

স্বামী ৭৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মানভূম জেলাস্থিত সমেত শিখরে (বর্তমান পরেশনাথ পাহাড়) মোক্ষ লাভ করেন। পার্শ্বনাথের পর যে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয় তিনি মহাবীর নাম পরিচিত। মহাবীরের আসল নাম ছিল দয়াবতীর বর্ধমান। ইনি বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রকুলে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভবতঃ ইনি বুদ্ধদেবের থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

এই মহাবীর সম্পর্কে প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে বর্দ্ধমান মহাবীর রাঢ় প্রদেশে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর প্রতি বড় অসদ্ব্যবহার করেছিল, কোন সময়ে বাংলা দেশে যে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করে তা' সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না। দিব্যাবদানে অশোকের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর জৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পতিত বুদ্ধদেবের চিত্র এঁকেছে শুনে তিনি নাকি পাটলিপুত্রের সমস্ত জৈনগণকে হত্যা করে ছিলেন। এই গল্পটির মূলে কতদূর সত্য আছে তা' সঠিকভাবে জানা যায় না। এই থেকে অশোকের সময়ে উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায় বর্তমান ছিল এরূপ অনুমান করা অসম্ভব।

অশোকের সময় বাংলা দেশে জৈন প্রভাব না থাকলেও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে বঙ্গে জৈনধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্র মতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর (চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু) শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠিত করেন কালক্রমে তা' চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। এর তিনটির নাম তাম্রলিপ্তিক (তমলুক), কোটীবর্ষীয় (দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওকোট পরগণা), (পুণ্ডবর্দ্ধনীয় মালদহ ও বগুড়া জেলা) এবং চতুর্থটির নাম দাসীকর্বটিয় (সম্ভবতঃ মানভূম জেলা)[১]। এই তিনটি যে বাংলার

১ বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ, পৃষ্ঠা, ৪০৬।

তিনটি সুপরিচিত নগরীর নাম থেকে উদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নাই। কল্পসূত্রোক্ত এই শাখাগুলি কাল্পনিক নয়, সত্য সত্যই ছিল। কারণ, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ) ও দক্ষিণবঙ্গে (তাম্রলিপ্ত) যে খুব প্রাচীন কাল থেকেই জৈন সম্প্রদায় প্রসার লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে যে জৈন প্রভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বা তার পূর্বে ঐ জায়গায় একটি জৈন বিহার ছিল। হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকেও জানা যায় তাঁর সময়ে বাংলা দেশে দিগম্বর জৈনের সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে যে জৈনদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এককালে প্রবল আকার ধারণ করেছিল, তা' কয়েকটি জৈনমূর্তি থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। মেদিনীপুর জেলার বরভূমে ঋষভনাথের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এতে কেন্দ্রস্থলে মূল মূর্তির দুই পাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি ; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। (বাংলা দেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠাঃ ১৬২)

এছাড়া আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত উত্তররায়বাড় গ্রামে বীরবর রাজা সুরেশচন্দ্র রায় সাহিত্য বিনোদ মহাশয়ের প্রাচীন গড়ে একটি মন্দিরে আজো অবিকল অনুরূপ ভাবে দণ্ডায়মান একটি মূর্তি নিজে দেখে এসেছি। এই মূর্তি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়েছি।

তমলুকের নিভৃত পল্লীতে অনুসন্ধান করলে আরো বহু জৈনমূর্তি পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাম্রলিপ্তিয় সম্প্রদায় তৎকালে বিস্তৃত তাম্রলি রাজ্যের জৈনধর্মকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিলেন, এ অনুমান মিথ্যে নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাম্রলিপ্তের রাজন্যবৃন্দ

তাম্রলিপ্তের ইতিহাস সুদীর্ঘ সাড়ে তিন হাজার, চার হাজার বছরের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘ কালের বিস্তৃত ইতিহাস আজো আবিষ্কৃত হয়নি। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হলেও তাম্রলিপ্ত রাজের যে কি নাম ছিল স্পষ্টভাবে তা জানতে পারা যায় নি। একমাত্র জৈমিনি ভারতে বহির্ধ্বজের নাম সহ তৎপুত্র তাম্রধ্বজের নাম পাওয়া যায়। বর্তমান তমলুকের মাহিষ্য রাজবংশ এই তাম্রধ্বজের বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। এই দাবী কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার করে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই সুদীর্ঘ কালের বংশধারা আজো একই স্থানে বর্তমান আছে অভিন্ন ভাবে একথা বিশ্বাস করতে মন যেন চায় না। দ্বিতীয়ত, যদি এই রাজবংশ সেই সুপ্রাচীন কালের হয়, তা'হলে সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তের ধ্বংস সত্ত্বেও এই বংশের কেন ধ্বংস হোল না তা' জানা দরকার।

তমলুকের ইতিহাস লেখক সেবানন্দ ভারতী মহাশয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে লিখেছেন—"রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে বর্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত অভগ্ন ধারায় একই শোণিত প্রবাহ মহা ভারতীয় যুগের অবসানের সময় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা অপুত্রক ছিলেন, তাঁহারা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও একই বংশসম্ভূত সন্তানকে গ্রহণ করিয়া শোণিত-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান রাজারা "তাম্রধ্বজের সন্তান," "দেববংশ" বলিয়া খ্যাত। পৃষ্ঠা ৩৮।

এ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎপ্রণীত বিশ্বকোষের ১৪ ভাগে যাহা বলেছেন, তা' এই—

"ময়ূরধ্বজ নামে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় বিজনৌর জেলার অন্তর্গত দুর্গ সুরক্ষিত একটি প্রাচীন নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'রতনপুরের ময়ূরধ্বজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকে অনুমান করেন, সৈয়দ সলার মসউদ গাজির জৈন শক্র ময়ূরধ্বজ এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা, তাহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের।"

এ সম্পর্কে সেবানন্দ ভারতী মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন—অতএব এখানে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ দ্বিতীয় একটি ময়ূরধ্বজ নামক রাজার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। বোধ হয় ময়ূরধ্বজকে, কেহ কেহ বলিবেন, মহাভারতীয় কালের নাম, সুতরাং ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর নহেন। রতনপুরের ময়ূরধ্বজ ও তমলুকের ময়ূরধ্বজ যে একই ব্যক্তি তাহা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্ব যে মূল মহাভারতের বহু পরে রচিত হইয়াছে তাহা নির্বাদ সত্য। জৈমেনীয় আশ্বমেধিক রচনার পূর্ব্বে যে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ তাম্রলিপ্তের রাজাগণ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য তাঁহার রাজত্ব নর্মদাতট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বংশ তালিকায় প্রথম চারিজন রাজার নামের সহিত ধ্বজ সংযুক্ত থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, ঐরূপ নাম তাঁহাদের উপাধি বা উপনাম। কালে প্রকৃত নাম লোপ পাইয়া উপনাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" পৃষ্ঠা, ৩৮।

"বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার, পুরাতত্ত্ববিশারদ মহাশয় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা হোল—

"বহু ঐতিহাসিক এই তাম্রলিপ্ত যে বৈদিক যুগের চন্দ্রবংশীয়, ক্ষত্রিয়, রামায়ণের যুগের জলপ্লাবমান অর্থাৎ কেবর্ত দেশবাসী অর্থে কৈবর্ত নামে বর্ণিত, আবার মহাভারতে তাহারা মাহিষ্যিক বা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলির বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ও তাহারাই বৈদিক যুগের অসুর এবং মহাভারতীয় যুগের তাহারই বংশধর তাম্র-

ধ্বজের অখণ্ড রক্তধারা বহন করিয়া আসিতেছেন একথা না জানিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, নিঃশঙ্কনারায়ণের রাজত্বকালের পর কৈবর্তরাজ কানু ভুঁইয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, পূর্ববঙ্গের মাহিষ্য পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্ত ও উত্তর ভারতের ও রাজপুতনার সকলেই একই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের বংশধর। এই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৈবর্ত যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় মাহিষ্য এবং ব্রহ্মখণ্ড ও বৃহদ্ধর্ম সংহিতার রাজপুত জাতিকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তান বলা হইয়াছে। ইহার ভাবগত অর্থ এই যে এই তিনটি পৃথক নাম হইলেও একই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের ইহা স্থানগত নামান্তর মাত্র। কর্মত ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় এবং বশ্যের বৃত্তি অবলম্বী। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺নিখিল নাথ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত এবং ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের ইতিহাসে এই প্রাচীন রাজবংশের রাজা নিঃশঙ্ক নারায়ণ রায়ের নাম পর্যন্ত বাদ দিয়া কানু ভুঁইয়া এই রাজ্যে অধিকার করেন বলিয়া এক কাল্পনিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, এই রাজগণ সমগ্র বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, রাজা কানু ভুঁইয়ার পর তাহার পুত্র ধাঙ্গড় ভুঁইয়া তাহার পর তৎপুত্র মুরারী রায় ভুঁইয়া (১৪১০-১৪৯৫) তাহার পর তৎপুত্র যদুনাথ রায় (১৫৯৩-১৫২৭) তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করেন। তাহার পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত রায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জমিদারে পরিণত হন। এই বংশ এখন তমলুকের রাজ্যহারা হইলেও রাজা ও রাজপুত্র নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

এই জমিদারীও ক্রমে ক্রমে বিভক্ত হইতে হইতে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত যৎসামান্য জমিদারী ছিল তাহাও জমিদারী উচ্ছেদ আইনে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও লোকে এখনও তাঁহাদিগকে রাজা নামে অভিহিত করে।** ইঁহারা এখনও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় মাহিষ্য জাতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ও ইঁহারা

চিরকালই কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয় সুতরাং কৈবর্ত্তরাজ কানু ভূঁইয়া কস্মিনকালেও তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করেন নাই। তিনি তাহার পিতা নিঃশঙ্ক নারায়ণের উত্তরাধিকার সূত্রে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।" ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭০—৭১।

এই সম্পর্কে কিছু মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে রাজবংশের বংশ তালিকা উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। তবে গোড়াতেই স্বীকার করে রাখা ভাল, যে বংশ তালিকা এখানে উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি তা'ও নির্ভুল নয়। কারণ ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলেছেন, রাজবংশের কোন প্রাচীন বংশ তালিকা নাই। তাঁর সামনেই স্মৃতিমন্থন করে রাজবংশের বংশ তালিকা প্রস্তুত করে তাঁকে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে সেবানন্দ ভারতী মহাশয় বলেছেন —"মদীয় গুরুদেব প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, রাজাদের অর্পিত মুদ্রিত বংশলতার সহিত তাহার যে অনৈক্য আছে, পূর্ব প্রদর্শিত বংশলতায় তাহা দেখান হইয়াছে। মদীয় গুরুদেব যখন তমলুক রাজবংশলতা সংগ্রহ করেন, তখন তিনি রাজবাটীর প্রাচীন হস্তলিখিত বংশলতার সহিত ঐক্য করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া আমাকে বলিয়া ছিলেন।" পৃষ্ঠা, ৪২।

যাহাহোক, আমরা রাজবংশে রক্ষিত মুদ্রিত বংশলতা ও প্রাচীন বংশলতা, এ'দুটিই আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে উদ্ধার করছি। বলা বাহুল্য এজন্য আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক-গণের কাছে এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ঋণী। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। 'রাজবংশাবলী' রাজবাড়ীর প্রাচীন ভাটগণই রক্ষা করেছিলেন।

তাম্রলিপ্তের রাজ-বংশলতা

১। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ
|
২। তাম্রধ্বজ
|
৩। হংসধ্বজ
|
৪। গরুড়ধ্বজ
|
৫। বিদ্যাধর রায়
|
৬। নীলকণ্ঠ
|
৭। জগদীশ
|
৮। চন্দ্রশেখর
|
৯। বীরকিশোর
|
১০। গোবিন্দদেব
|
১১। যাদবেন্দ্র
|
১২। হরিদেব
|
১৩। বিশ্বেশ্বর
|
১৪। নৃসিংহ
|
১৫। শম্ভুচন্দ্র
|
১৬। দীপচন্দ্র

১৭। দিব্যসিংহ
|
১৮। বীরভদ্র
|
১৯। লক্ষ্মণসেন
|
২০। রামসিংহ
|
২১। পদ্মলোচন
|
২২। কৃষ্ণচন্দ্র
|
২৩। গোলকনারায়ণ
|
২৪। বলিনারায়ণ
|
২৫। কৌশিকনারায়ণ
|
২৬। অজিত নারায়ণ
|
২৭। কৃষ্ণকিশোর
|
২৮। চন্দ্রাক
|
২৯। মৌঞ্জিকিশোর
|
৩০ মার্কণ্ডকিশোর
|
৩১। ইন্দ্রমণি

৩২। সুধন্বা (পুত্র)

৩৩। রাণী মৃগয়াদেই (কন্যা)
(ইনি সুধন্যা রায়ের মৃত্যুর পর রাণী হন।) ইঁহার স্বামীর নাম জমিনভঞ্জ রায়

৩৪। ভানু রায়
|
৩৫। লক্ষ্মীনারায়ণ
|
৩৬। রাণী চন্দ্রা দেই (কন্যা)
|
(ইঁহার স্বামী নিঃশঙ্কনারায়ণ)
|
৩৭। নিঃশঙ্কনারায়ণ
|
৩৮। কানু রায় (ভূঁয়া)
|
৩৯। ধাঙর রায় ভূঁয়া
|
৪০। মুরারি রায় ভূঁয়া
|
৪১। হরবার রার ভূঁয়া
|
৪২। ভাঙ্গর রায় ভূঁয়া
(১৪০৪ খৃঃ—৮১০ সনে মৃত)
|
৪৩। ধিতাই রায় ভূঁয়া
(১৪০৪—১৪৫৫)
|
৪৪। জগন্নাথ রায় ভূঁয়া
(১৪৫৫—১৪৯৫)
|
৪৫। যদুনাথ রায় ভূঁয়া
(১৪৯৬—১৫২৭)
|
৪৬। রামভূঁয়া রায়
(১৫২৭—১৫৬৪ খৃঃ)

৪৭। শ্রীমন্ত ভূঁয়া রায়
(১৫৬৪—১৬১৬ খৃঃ)

৪৭। ত্রিলোচন
(ইহার চার আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং রাজাসন গ্রহণ করেন)

৪৭। শ্রীমন্ত ভূঁয়া রায়

৪৮। কেশব (১৬১৬—৪৫)

৪৯। হরি রায় (১৬১৬—৫৪)

শ্যাম মনোহর অনন্ত রূপ দুর্গা দাস

৫০। রাজা গম্ভীর রায় (১৬৫৫—১৭০২ খৃঃ সালে সাড়ে ছ'আনা অংশ)

৫০ রাজারাম রায় (১৬৫৫—১৭০২ খৃঃ) (সাড়ে ন'আনা অংশ)

৫১। প্রতাপনারায়ণ রায় (১৭০৩—৩৭ খৃঃ সাড়ে ছ'আনা অংশ)

৫১ নরনারায়ণ রায় (১৭০৩ - ১৭৩৭ খৃঃ সাড়ে ন'আনা অংশ এবং ১৭৩৭—১৭৩৯ খৃঃ সমগ্র রাজ্যের রাজা হন)

৫১ নরনারায়ণ রায়

৫২। রাজা কৃপানারায়ণ (রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া) (১৭৩৯—৫২ খৃঃ) (=১৭৮৩ খৃঃ রাণী)

৫৩। রাজা কমলনারায়ণ রায় (১৭৩৯—৫৭)

(১৭৫৭—১৭৬৭ খৃঃ পর্যন্ত খোজা দিদার আলী বেগ রাজ্য দখল করিয়া থাকেন)

রাণী সন্তোষপ্রিয়া রায়

(রাজা নরনারায়ণের মহিষী ও কমলনারায়ণের মাতা,

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আদেশে রাজ্য ফেরৎ পান)

১৭৬৭—১৭৭০ খৃঃ

|

৫৪। রাজা আনন্দনারায়ণ রায়

(রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক পুত্র)

১৭৭১ খৃঃ অংশ, ১৭৯৫ সমগ্র রাজ্য

|

রাজা রুদ্রনারায়ণ (জ্যেষ্ঠারাণী হরিপ্রিয়ার দত্তকপুত্র বঁহিচবেড়ে গড়)

|

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ

|

হরনারায়ণ গোপাল শশিভূষণ

৫৫। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (১৮৫৭ খৃঃ মৃত, কনিষ্ঠা রাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার দত্তক-পুত্র, গড় পদ্মবসান)

|

উপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৯০ খৃঃ মৃত)

৫৬। রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ (১৮৯০ খৃঃ মৃত)

॥ রাজবাটী থেকে সংগৃহীত মুদ্রিত বংশাবলী ॥

শ্রীশ্রীহরি জিউ

রাজবংশাবলী

ইয়াদ দাস্ত হকিকত মৌরসি জমিদারি

জমিদারান পরগণে তমলুক

সরকার গোয়ালপাড়া

মহাল খানিষা সরিফা।

সুরু জমিদারি

১। রাজা মউরধজ।

২। রাজা তাম্রধজ পেসরে মউর ধজ।

৩। রাজা হংসধজ পে তাম্রধজ।

৪। রাজা গুরুড়ধজ পে হংসধজ।

৫। রাজা বিদ্যাধর রায় পে গরুড়ধজ রায়।

৬। রাজা নিলকণ্ঠ রায় পে বিদ্যাধর রায়।

৭। রাজা জগদীশ রায় পে নিলকণ্ঠ রায়।

৮। রাজা চন্দ্রশিখর রায় পে জগদীশ রায়।

৯। রাজা বিরকিশর রায় পে চন্দ্রশিখর রায়।

১০। রাজা গোবিন্দদেব রায় পে বিরকিশর রায়।

১১। রাজা যাদবেন্দ্র রায় পে গোবিন্দদেব রায়।

১২। রাজা হরিদেব রায় পে যাদবেন্দ্র রায়।

১৩। রাজা বিশ্বেশ্বর রায় পে হরিদেব রায়।

১৪। রাজা নৃসিংহ রায় পে বিশ্বেশ্বর রায়।

১৫। রাজা শম্ভুচন্দ্র রায় পে নৃসিংহ রায়।

রাজা দিপচন্দ্র রায় পে শম্ভুচন্দ্র রায়।

রাজা দির্বসিংহ রায় পে দিপচন্দ্র রায়।

রাজা বিরভদ্র রায় পে দির্বসিংহ রায়।

লক্ষ্মণসেন রায় পে বিরভদ্র রায়।

রাজা রামসিংহ রায় পে লক্ষণ সেন রায়।

রাজা পদ্মলোচন রায় পে রাম সিংহ রায়।

রাজা কৃষ্টচন্দ্র রায় পে পদ্মলোচন রায়।

রাজা গোলক নারায়ণ রায় পে কৃষ্টচন্দ্র রায়।

রাজা বুলিনারায়ণ রায় পে গোলক নারায়ণ রায়।

রাজা কৌসিক নারায়ণ রায় পে বুলিনারায়ণ রায়।

রাজা অজিত নারায়ণ রায় পে কৌসিক নারায়ণ রায়।

রাজা কৃষ্টকিশোর রায় পে অজিতনারায়ণ রায়।

রাজা চন্দ্রার্ক রায় পে কৃষ্টকিশোর রায়।

রাজা মৌজি কিশোর রায় পে চন্দ্রার্ক রায়।

রাজা মার্কণ্ড কিশোর রায় পে মৌজি কিশোর রায়।

রাজা ইন্দ্রমণি রায় পে মার্কণ্ড কিশোর রায়।

রাজা স্বুধর্ণা রায় পে ইন্দ্রমনি রায়।

মৃগয়া দেই, স্বুধন রায়ের ভগিনী, ইহার স্বামী কুঙর জমীন ভনজ রায়।

রাজা রায় ভানু রায় পে কুঙর জমিন ভঞ্জ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় পে রায়ভানু রায়।

(ইহার দুই পুত্র বিনা বিবাহে বাল্যকালে মরিয়াছে)

ইহার কন্যা চন্দ্রাদেই, ইহার স্বামী রাজা নিশঙ্ক রায়।

রাজা কানুভূয়া রায় পে নিশঙ্ক রায়।

রাজা ধাঙ্গড় ভূয়া রায় পে কানুভূয়া রায়।

রাজা মুরারিভূয়া রায় পে ধাঙ্গড়ভূয়া রায়।

রাজা হরবারভূয়া রায় পে মুরারিভূয়া রায়।

রাজা ভাঙ্গড়ভূয়া রায় পে হরবার ভূয়া রায়।

ইনি সন ৮১০ সালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন সংখ্যা পাওয়া গেল।

এই ৪১ পুরুষ জমিদারের নামের সংখ্যা আছে। কে কয়েক সন জমিদারী করিয়াছেন তাহার তপশীল পাওয়া গেল না।

রাজা ধিতাই ভূয়া রায় পে ভাঙ্গড় ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৮১১ সাল নাং সন ৮৬১ সাল জমিদারীতে কায়েম ছিলেন।

রাজা জগন্নাথ ভূয়া রায় পে ধিতাই ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৮৬২ সাল নাং সন ৯০৪ সাল জমিদারিতে কায়েম ছিলেন।

রাজা যদুনাথ ভূয়া রায় পে জগন্নাথ ভূঁয়া রায়।

ইস্তক সন ৯০৫ সাল নাং সন ৯৩৩ সাল জমিদারিতে কায়েম ছিলেন।

রাজা রামভূয়া রায় পে যদুনাথ ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৯৩৪ সালে নাং সন ৯৭২ সাল জমিদারীতে কায়েম ছিলেন।

ইহার দুই পুত্র। বড় পুত্র শ্রীমন্ত রায় এবং ছোট পুত্র ত্রিলোচন রায়। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের ৮ পুত্র।

রাজা শ্রীমন্ত রায় পে রামভূয়া রায়।

ইহার জমিদারী ষোল আনা। ইস্তক সন ৯৭৩ সাল নাং সন ১০২৪ সাল ৫২ বৎসর।

ইহার এক পুত্র রাজা বরায়ের জমিদারির কৃতাংশ না হইতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বাকি সাত পুত্রের ৸০ বার আনার বিতং

কেশব রায় জ্যেষ্ঠ পুত্র	৶০
শ্যাম রায়	⁄১০
মনোহর রায়	⁄১০
হরি রায়	⁄১০
অনন্ত রায়	⁄১০
রূপ রায়	⁄১০
দুর্গাদাস রায়	⁄১০
ত্রিলোচন রায়।	

ইহাদিগের জমিদারী হিস্বওয়ারি বাটাওয়ারি মাফিক ইং সন ১০২৫ সাল লাগাৎ ১০৬১ সাল ৩৭ বৎসর। ইহার মধ্যে শ্রীমন্ত রায়ের ৬ পুত্র ও ভাই ত্রিলোচন রায় পরলোক গমন করিলেন। হরি রায় জমিদারি করিলেন নাং সন ১০৬১ সাল।

রাজারাম রায় পে হরি রায় ॥/১০

গম্ভির রায় পে মনোহর রায় ।৵/১০

হরি রায়ের পরলোক হইলে ইহাদিগের জমিদারী ইং সন ১০৬২ সাল নাগাৎ সন ১১০৯ সাল ৪৮ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ রায় পে রাজারাম রায় ॥/১০

রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় পে গম্ভির রায় ।৵/১০

ইহাদিগের জমিদারী ইং সন ১১১০ সাল নাগাৎ সন ১১৪৩ সাল ৩৪ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ রায় পে রাজারাম রায়।

ইহার জমিদারীর ইস্তক ১১৪৪ সাল নাং সন ১১৪৬ সাল। এই সন ইনি পরলোক গমন করিলেন। ৩ বৎসর। রাজা নরনারায়ণের দুই রাণী ও দুই পুত্র। ছোট রাণীর পুত্র কৃপানারায়ণ রায় জ্যৈষ্ঠ; বড় রাণীর পুত্র কমলনারায়ণ রায় কনিষ্ঠ। ইহাদিগের জমিদারি ইস্তক সন ১১৪৬ নাং সন ১১৬৫ সাল ২০ বৎসর মাফিক তপশীল।

কৃপানারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার ইস্তক সন ১১৪৬ সাল নাং সন ১১৫১ সাল ৬ বৎসর।

কমলনারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার ইস্তক সন ১১৫২ সাল নাং সন ১১৫৩ সাল ২ বৎসর।

কৃপানারায়ণ রায় ও কমলনারায়ণ রায় উভয় ভ্রাতার নিস্পি নিস্পি জমিদারি ইস্তক সন ১১৫৪ সাল নাং সন ১১৫৯ সাল ৬ বৎসর।

সন ১১৫৯ সালে কৃপানারায়ণ রায় পরলোক গমন করেন।

কমলনারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার হইলেন ইস্তক সন ১১৬০ সাল নাং সন ১১৬৫ সাল ৬ বৎসর।

সন ১১৬৫ সালে কমলনারায়ণ রায় বর্তমান থাকিতে শ্রীযুক্ত নওয়াব নাওদার সাহেব মৌরাসি জমিদারি নজর করিয়া রাণী সন্তোষপ্রিয়া মাদরে রাজা কমলনারায়ণ রায় মোতফা ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপানারায়ণ রায় মোতফা ইহার দুইজনার নামে জমিদারি অর্দ্ধাঅর্দ্ধি বাবোজিম বাটওয়ারা সাবেক সন ১১৫৪ সাল মাফিক বহাল করিয়া দিলেন।

রাণী সন্তোষপ্রিয়া মাদরে রাজা কমলনারায়ণ রায় ॥০ ও রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপানারায়ণ রায় ॥০

হিস্বে রাণী সন্তোষপ্রিয়া জমিদার মাদরে রাজা কমলনারায়ণ রায় মোতফা আনন্দনারায়ণ রায় মোতনন্না রাণী সন্তোষপ্রিয়া এহেঁ জব্দ রাজা কেশবনারায়ণ রায় পে রাজা শ্রীমন্ত রায় ইহাতে আপন হিস্বা ॥০ আট আনীর জমিদারিতে সন ১১৭৭ সালে মোকরর করিয়া দখলীকার করিলেন। কতকদিন পরে রাণী মজফর পরলোক গমন করিলেন। আনন্দনারায়ণ মজকর শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের হুজুরে সরফররাজ হইয়া ॥০ আট আনা জমিদারির সরবরাহ করিতে ছিলেন। সন ১১৭৮ সালে শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নিসিল টিন সাহেবের হুজুরে রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপানারায়ণ মোতফা নালিস করিয়া আনন্দনারায়ণ মজকুরের ॥০ আট আনা জমিদারির এক আনা সাহেব মজকুর দিয়াইলেন রাণী মজকুর লইয়া ॥/০ নয় আনার জমিদার হইলেন। আনন্দনারায়ণ মজকুরের ।৵০ সাত আনা জমিদারি রহিল। ইস্তক সন ১১৭৭ সাল মাহ অগ্রহায়ণ হইতে সরকারের মাল ওয়াজিযে সরবরাহ করিতেছেন।

হিস্বে রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জমিদার জওজে রাজা কৃপানারায়ণ রায় মোতফা ॥০ আনার জমিদারি করিতেছিলেন। সন ১১৭৮ সালে শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নিসিলটন সাহেব হুজুরে নালিশ হইবাতে রাজা

আনন্দনারায়ণ রায় মোতমন্না রাণী সন্তোষপ্রিয়া মোতফা হিস্বা ॥০ আট আনার জমিদারি হইতে /০ এক আনা সাহেব মজকুর দিয়াইলেন। রাণী মজকুরা /০ এক আনা জমিদারি লইয়া ॥/০ আনার জমিদার হইয়াছিলেন। ইস্তক সন ১১৭৭ সাল নাং সন ১১৮৮ সাল মাহ অগ্রহায়ণ ১০ বৎসর ৪ মাস গড় বহিচ বেড়া বহখাহর দোহিস্বা সরীকৎ রাজা আনন্দনারায়ণ রায় জমিদারকে দুর্গা ভবানী পূজাদি করিতে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া গড় মোকামে দখল না দিয়া কিল্লা কলিকাতা আফিলে নালিশ করিলেন। শ্রীযুক্ত সাহেব গভর্ণর ও সাহেবান কৌশলে তজবিজ করিয়া আনন্দনারায়ণ মজকুরকে গড় মোকামে পূজাদি করিতে দখলে হুকুম দিলেন। দিলেন। রাণী মজকুর দফাৎ হুকুম আদল না করিয়া সরকারের পিয়াদাকে তলোয়ার যখমি করাতে সাহেব গভর্ণর ও সাহেবান কৌশলে রাণী মজকুরকে ॥/০ নয় আনা জমিদারী হইতে সন ১১১৮ সালে মাহ পৌষ বেদখল করিয়া মহাল খাস হইয়াছে।

ঐ রাজার মৃত্যুর পর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় জমিদার হইয়া সন ১২৬২ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইহার দুই পুত্র, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সন ১২৯৫ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় নিঃসন্তান, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দুই পুত্র, রাজা যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় ও রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নিঃসন্তান।

আমরা দু'টি কোর্ষিনামাই এখানে প্রকাশ করলাম। এই দু'টি কোর্ষিনামা থেকে জানা যায় বর্তমান রাজগণ ৫৮ পুরুষ-এ চলছেন। ঐতিহাসিকগণ প্রতি চার বছরে একশত বছর গণনা করেন, এই হিসাবে ধরলে বর্তমান রাজবংশ ১৪৫০ বছরের পুরানো বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই হিসাবও নির্ভুল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধ আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আদি রাজা ময়ূরধ্বজ যদি সে সময়ের লোক হন তা'হলে কি করে তা' সম্ভব হ'য়। যদি পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী মহাশয়ের যুক্তি আমরা গ্রহণ করি, অর্থাৎ তিনি বলেছেন পুরাকালে "বিষ্ণুপুরাণে"র "প্রাধান্যেন ঈরিতাঃ" এই নিয়মানুসারে বংশের বিখ্যাত রাজগণই পুত্র বা গোত্রাপত্য কীর্তিত হয়েছেন। অর্থাৎ সকলের নাম পরপর উল্লেখ না করে বংশের মধ্যে যাঁরা কীর্তিমান পুরুষ কেবলমাত্র তাঁদের নামই হিসাব রাখার বা কোর্ষিনামাতে সংরক্ষিত করা হোত। যেমন বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়েছে—

"বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।
পুনরুক্তবহুত্বাং তুন ময়া পরিকীর্তিতা ॥ ৪৪ ॥"

অর্থ—"বংশে বংশে নামের সংখ্যা কীর্তন করিলাম না, কেননা নামের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, বিশেষতঃ অনেক রাজার নামই সমান অর্থাৎ একরূপ।"

এই যুক্তি মেনে নিলেও প্রশ্ন উঠে অনেক। প্রথমত আমরা তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে সব প্রাচীন প্রমাণ পেয়েছি, তাতে আজ পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজের কোন নাম পাইনি। এই সব প্রমাণের মধ্যে বৌদ্ধ ভ্রমণকারীদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীর কোথাও তাম্রলিপ্ত রাজের কোন নাম উল্লেখ করেন নি। এতজন ভ্রমণকারী পর পর তাম্রলিপ্তে এসেছেন, অথচ তাঁরা কেউই একবারও কোন রাজার নাম উল্লেখ করবেন না, তাই বা কেমন করে সম্ভব হয়। যদি ধরে নি তাঁরা বিদ্বেষবশতঃ ইচ্ছে করেই তাম্রলিপ্ত রাজের নাম উল্লেখ করেননি, তা'হলেও একটা কিন্তু থেকে যায়। পৌরাণিক যুগে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক কিছু কাহিনী রচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাম্রলিপ্ত রাজ সম্পর্কে একটিও অলৌকিক কোন কাহিনী পেলাম না।

তবে ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় "তমোলুক ইতিহাসে" এই

সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে বলেছেন, "ফলতঃ যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাত অন্তত তিন বংশের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।" পৃঃ ৮৩।

এই বোধহয় সন্দেহটি জাগার একমাত্র কারণ কোর্ষিনামাতে পদবি পরিবর্তন। প্রথম চারপুরুষ-এর শেষে 'ধ্বজ' আছে। তারপর "রায়" হয়েছে। তারপরও 'ভুঁঞ্যা'—এই তিনটি পদবি দৃষ্ট হয়। এই জন্য তিনি সন্দেহ করেছেন, খুব সম্ভব তিনটি বংশ এই রাজ্যের সিংহাসনে পরপর আরোহণ করেছেন। কিন্তু এই ধারণা তাঁর সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, সম্প্রতি আমি এমন একটি বংশের কোর্ষিনামা আবিষ্কার করেছি, যাতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে একই বংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদবি পারবর্তন করেছেন তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী। এই বংশটি হোল বিরুলিয়ার বিখ্যাত "জানা" বংশ। এই বংশের বিস্তৃত ইতিহাস আমরা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করব। এই কোর্ষিনামা আবিষ্কার তাম্রলিপ্ত তথা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। কারণ, এই বংশের শাখা উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের। এই বংশের ইতিহাস থেকে তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। যে তথ্যগুলি আজ পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। তবুও যদি আমরা এই কোর্ষিনামার কথা ছেড়েওদি, তা'হলেও ত্রৈলক্য রক্ষিত মহাশয়ের সন্দেহের উত্তরে একটি প্রমাণ দেখাতে চাই যে, আজো অনেক ব্যক্তি কোর্টে "এফিডেবিট" করে নিজ 'পদবি' ত হামেষাই পরিবর্তন করছেন। অতএব তখন একই বংশ যে প্রয়োজনে বিভিন্ন পদবি গ্রহণ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি আছে। তাম্রলিপ্তের এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বহু রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে তাঁরা নিজেদের পদবি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এবার আর একটি সন্দেহ হচ্ছে—যদি মহাভারতীয় যুগের

বংধরগণ আজো অভিন্ন ধারায় তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করে আসছেন, তা'হলে আমরা বিভিন্ন রাজার সন্ধান পাই কেন ?

সম্প্রতি একটি প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত তথা বাংলার নাবিকগণের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক উল্লেখ পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থটির নাম "শুই-চিং-চু" (Commentary on the water classic) এবং পণ্ডিত L. Petech মহোদয় কর্তৃক এটি ইটালি থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। "শুই-চিং-চু"র বর্ণনা থেকে জানা যায়, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের কোন নৃপতি চীন রাজসভায় দূত প্রেরণ করে ছিলেন।

অধ্যাপক পরেশ দাশগুপ্ত এবিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন, "প্রাচীন তাম্রলিপ্ত থেকে ইয়াংসি নদীধৌত সুদূর নানকিং-এ দূত প্রেরণের এই কাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতবর্ষ থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে স্থলপথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অবশ্য ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। "শুই-চিং-চু"র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "তান্-মেই" (তাম্রলিপ্ত)-র নৃপতিকে "পীত-দরবারের" (চীন রাজসভা) সম্রাট তাম্রলিপ্তের রাজা বলে স্বীকার করেন।" প্রাচীন তাম্রলিপ্তিতে মূর্তি আবিষ্কার। যুগান্তর, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬০।

"শুই-চিং-চু"তে কোন রাজার নাম উল্লেখ নাই। তাই এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা বড় কষ্টকর। হেলেনীয় ভৌগোলিক টলেমীর (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) বৃত্তান্ত পাঠে মনে হয়, তাঁর সময় এই নগরে "মণ্ডলাই"গণ রাজত্ব করতেন। "মণ্ডলাই" কথাটির সংগে মণ্ডলাধিপতির সাদৃশ্য আছে বলে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ করেন। এই মণ্ডলাধিপতিগণ কুষাণ সম্রাট-গণের অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করে জানা যায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে "দেবরক্ষিত" নামধারী কোন এক শ্রেণীর নৃপতিগণ তাম্রলিপ্ত ও পূর্ব ভারতের সমুদ্র-তীরবর্তী অন্যান্য কোন কোন স্থানে রাজত্ব করতেন। যেমন—

"কোশল-ওড্র-(পরোদ্রক) তাম্রলিপ্তান্।
সমুদ্রতটপুরিশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি ॥"

শুধু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নয় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতীয় বণিকগণ কোন কোন রাজা কর্তৃক চীন দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে নিজেদের অধিপত্য বিস্তার করে ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যই তৎকালে রাজদূতের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে একজন ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ লাকুপেরি (Professor Terrien De Lacouperie, Ph D., Litt. D.) চীনের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য চালাতেন। এমন কি চীন দেশের বহুস্থানে ভারত তথা তাম্রলিপ্ত রাজের উপনিবেশও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত রাজ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা নাই বটে তবে ভারতীয় বণিকগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। "রণজয়" উপাধি থেকে মনে হয় ইনি খুব সম্ভবত তাম্রলিপ্তের কোন রাজা ছিলেন। এই গ্রন্থ (Western origin of the Early Chinese civilisation, P. 89.) থেকে জানা যায় ভারতীয় বণিককূল (রাজন্যবৃন্দ) চীন দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। লাকুপেরি অনেক গবেষণা ও প্রগাঢ় অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছেন—

"কিয়াও-চৌ (Kia-tchou) উপসাগরের চতুঃপার্শ্বে প্রায় ৬৮০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সমুদ্রযাত্রী ভারতীয় বণিকগণ ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। তত্রত্য চীনের সামন্ত-রাজগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান য়ুরোপীয় বণিককুলের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় বণিককুলও সাহস ও শক্তিপ্রভাবে তথায় রাজ্যপত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সকল উপনিবেশী রাজন্য ও বণিকগণ "লঙ্-য" নামে চীনা ভাষায় খ্যাত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সিংহলীয় 'লঙ্কা' শব্দই 'লঙ্-য-'রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সিংহলের আর্য সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, ঐ সময়ে সিংহলে সেরূপ সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। সুতরাং 'লঙ্-য' বণিকদিগকে আমরা সিংহলী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। উহা ভারতীয় 'রঞ্জ' বা 'রণজয়' শব্দ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ চীনদিগকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহারা 'রণজয়' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। (কিংবা রণজয় নামক কোন রাজা বা জাতি এই রাজ্যপত্তন করে ছিলেন।) কিয়াও-চৌ উপসাগরের উত্তরকূলে চি-মিএ (Tsi-mich) বা চি-মো (Tsi-moh) নামক স্থানে তাঁহাদের বাণিজ্য-বন্দর টঙ্কশালা স্থাপিত ছিল। আরব সমুদ্র হইতে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত সকল বন্দরে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। তাঁহারা সকলেই হিন্দু। তাঁহাদের একজন প্রধানের নাম কুতলু বা কুতূহল। (এই কুতূহল কি কোলাহল রাজার নাম? যিনি এককালে মেদিনীপুর ও তমলুকের রাজা ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ ত এই কোলাহলকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলে অনুমান করেন। এই একাদশ শতাব্দী কি তা'হলে ঠিক নয়? এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করছি।) ৬৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে সেই বণিকপ্রধান পবিত্র গাভীসহ সান্তুঙ্গ উপদ্বীপের লু-বংশীয় চীন রাজকুমারের সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। চীন রাজকুমার মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, চীনদেশে তাঁহার উপাখ্যান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উক্ত বণিক্‌গণের উপনিবেশ চীনরাজের অধিকার-ভুক্ত হইতে পারে নাই, এ কারণ তাঁহারা অনেকটা স্বাধীনভাবেই অতিবাহিত করিতেছিলেন এবং চীনরাজকে যেরূপ কর বা বাণিজ্য শুল্ক দিবার বিধি দিল, তাঁহাদিগকে সেই বিধির মধ্যে পড়িতে হয় নাই।

চীনের মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল

শক্তিশালী বণিক্‌সম্প্রদায় ৬৭৫ হইতে ৬৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে স্ব স্ব বাণিজ্যসুবিধার্থ চীনদেশে সর্বপ্রথম ধাতবমুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। নিকটবর্তী চীনজনপদের সামন্ত রাজবর্গের সহিত তাঁহাদিগের বেশ সদ্ভাব ছিল, ঐ সকল চীনরাজও স্ব স্ব জনপদে উক্ত হিন্দু মুদ্রার আদর্শে ধাতবমুদ্রা চালাইয়া ছিলেন।

৫৮০ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাপূর্বাব্দের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের চীন রাজগণ ও বাণিকসম্প্রদায় মিলিত হইয়া একটি মুদ্রাসঙ্ঘ গঠন করিয়া ছিলেন, চীনের অভ্যন্তরবাসী বণিকগণও এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি এক পৃষ্ঠে চীন ও অপর পৃষ্ঠে ভারতীয় বণিকগণের চিহ্নাঙ্কযুক্ত তখনকার বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লঙ্‌-য (বা রণজয়) উপনিবেশের বণিকগণ ৪৭২ হইতে ৩৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আবার বৃহদায়তন মুদ্রা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ সকল সুপ্রাচীন মুদ্রা হইতে উক্ত মুদ্রাসঙ্ঘে আরও দুইটি নগরের চীনবণিকগণের যোগদানের সন্ধান পাওয়া যায়। রণজয়ের প্রধান সহর চি-মো নগরের টাঁকশাল হইতে উৎকীর্ণ সেই সময়ের বহু সংখ্যক মুদ্রার পরিচয় লাকুপেরি সাহেবের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে[১]।

চীন ও ভারতীয় হিন্দু লিপিযুক্ত মুদ্রা হইতে সন্দেহ থাকিতেছে না, যে সেই সুদূর অতীতকালে ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে নানা স্থানে যথেষ্ট বাণিজ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চীন বণিক্‌গণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল, নচেৎ চীনবাসী সহজে ভারতীয় বণিকমুদ্রার অনুকরণে কখনই অগ্রসর হইতেন না। যে চীন বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতে নানা বিষয়ের উদ্ভাবয়িতা বলিয়া প্রাচীন সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ, সেই জাতি যে বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতে বাণিজ্য-সম্পর্কে

1. Western origin of the Chiness civilisation, by Prof. Terrien de Lacouperie, P. XII, XLVII, 224 ff.

ভারতীয় বণিকগণের নিকট হইতে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।** বহুসহস্র বর্ষ পূর্বে যেমন ভারতীয় পনি নামক বণিকজাতি হইতে মিসর, গ্রীস, ও বাবিলনে আর্য্যসভ্যতালোক প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ বহু প্রাচীনকালে ভারীয় বণিকগণ হইতেই আর্যসভ্যতা চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, চীনদেশের মুদ্রাতত্ত্ব ও নানা চীনগ্রন্থ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে চীন জাতির অদম্য আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুবণিকগণও কতকটা খর্ব হইয়া পড়েন এবং প্রায় ৫৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে তাঁহাদের নিকটবর্তী জনপদবাসী চীনরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বণিক সমাজের উপর পুনঃপুনঃ বিপ্লবঝটিকা বহিতে আরম্ভ হইল। ৪৯৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে অপর একজন চীনপতি তাঁহাদের উপনিবেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সেই চীনপতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই ৪৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দে যুত্রহ্ বংশীয় আর একদল চীনবীর আসিয়া এখানকার বাণক উপনিবেশ বিধ্বস্ত করিয়া যান। এই সময় লঙ-য ও চি-মো পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বণিকেরা কেই-কি ও তুঙ্-যেহ্ বন্দরে আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আড়াইশত বর্ষের অধিককাল তাঁহারা পুরুষ-পরম্পরায় উক্ত স্থানেই সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ঐ সকল স্থানও চীন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই সময় হইতে চীনরাজপুরুষগণ ভারতীয় বণিক্‌গণকে অতি বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের অর্থশোষণের জন্যও তাঁহারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছিলেন। তৎপর ১৪০ হইতে ১১০ খৃষ্টপূর্বাব্দ মধ্যে ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী অন্তর্বিপ্লবে এই স্থান এক কালেই উৎসাদিত ও দুর্দ্দশার চরমসীমায় পতিত হইয়াছিল,

মানসম্ভ্রম ও আত্মরক্ষার্থ হিন্দু বণিককুল সকলেই চীনাধিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলে হিন্দুরাজশাসিত অন্নম্ বা কম্বোজ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।" বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পৃষ্ঠা, ৬১—৬৪।

তাম্রলিপ্ত রাজ সম্পর্কে আর একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। মেজর উইলফোর্ড সাহেব এ সম্পর্কে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ১০০১ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্তের জনৈক রাজা চীনদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন। পেগুর কাছে কল্যাণ-নামক গ্রামে এই তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই শাসনে তাম্রলিপ্তের কোন রাজার নাম উল্লেখ নাই। (Hamilton's East India Gazetteer, 11, P. 682)

'পাণ্ডব দিগ্বিজয়' নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের রাজার প্রিয় কবি রামচন্দ্র রচনা করে ছিলেন। এই গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত-এর রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

"ভীমাদেবীর প্রসাদে দেবদত্ত[১] নামে একজন তাম্রলিপ্তের রাজা হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ধনদত্ত দশ কোটি অর্থের অধিকারী হয়ে তাম্রলিপ্তবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করেছিলেন। এই ধনদত্তের

১। বিষ্ণু, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি থেকে জানা যায়, দেবরক্ষিত ও তদ্বংশীয়গণ তাম্রলিপ্তাদি জনপদের রাজা হইবেন (কোশলোড্র তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি।'—বিষ্ণু, ৪।২৪ ; 'কোশলাংশ্চাড্র পৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান সসাগরাণ। চম্পাঞ্চৈব পুরীং , রম্যাং ; ভোক্ষ্যন্তি দেবরক্ষিতম্॥" বায়ু, ৯৯।৬৮৫), 'হর্ষচরিতে' আছে—দেবাসুরক্তা দেবকী বিষচূর্ণচুম্বিত মকরন্দকর্ণেন্দীবর দ্বারা সুহ্মপতি দেবসেনকে বিনষ্ট করেন। তাম্রলিপ্ত সুহ্মের অন্তর্গত। তাম্রলিপ্তরাজ দেবদত্ত, দেবরক্ষিত ও দেবসেন কি একই ব্যক্তি ?

পত্নী শিবানী দেবী। কুলিশ দত্ত রাণী শিবানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণরেখাতীরবর্তী বালিশ বোলেশ্বর বা বালিশাহী ?) ও কাশযোষ (কাশিযোড়া) এই তিনটি প্রদেশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। কুলিশদত্তের অধস্তন একত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে তমলুকে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর পরশুধার নামক চিত্রগুপ্ত বংশীয় এবং অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ কায়স্থ তাম্রলিপ্ত ও কাশযোষাদির রাজা হন। এই রাজা পরশুধার বহুদূর থেকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিয়ে বহু যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞকালে কৌশিকী নদীর তীরস্থ মাড়বপুর থেকে জনৈক কন্যাদায়গ্রস্থ সনাঢ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এসে রাজার কাছে লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করেন। রাজা পরশুধার ব্রাহ্মণকে "দূর দূর" করে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তুমি কন্যা উৎপাদন করেছ, আর আমি তার বিয়ের জন্য তোমায় দেব লক্ষ মুদ্রা। দূর হও ভণ্ড ব্রাহ্মণ।' এর পরও সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ লক্ষ মুদ্রার জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন পরশুধার অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার এই দুরব্যবহারে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—'আজ থেকে তাম্রলিপ্তের সমুদ্রে চড়া পড়বে। ভূমি হবে শস্যহীনা। উৎপন্ন হবেনা লবণ। কলির ৪৫০০০ বর্ষ শেষ হলে এখানে হবে ম্লেচ্ছের আধিপত্য। পরশুধার-এর বংশ নির্বংশ হবে। ভীমাদেবী গমন করবেন নিজধামে। অধিবাসীগণ অর্থ ও বলহীন হবে ইত্যাদি।[১]

১। দেবদত্তাদয়ঃ প্রারাভাগ্যবন্তোহি তত্রৈব।
তাম্রলিপ্তেমহীপত্যং প্রাপুর্ভীমাপ্রসাদতঃ ॥ ৭৪
দেবদত্তস্য পুত্রোহভুদ্ধনদত্তো মহীপতিঃ।
দশকোটিপতিভূত্বা ননন্দ তাম্রলিপ্তকে ॥ ৭৫
ধনদত্তস্য ভার্য্যায়াং শিবান্যাং তাম্রলিপ্তকে।
জাতকুলিশদত্তস্ত ত্রীণ্ দেশান্ প্রশশাস সঃ ॥ ৭৬

তারপর, "পাণ্ডব-দিগ্বিজয়" বা 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' পাঠে আরো জানা যায়, তাম্রলিপ্তে গোপীচন্দ্র নামক একজন রাজা ছিলেন।

হুগংদিদেশং স্বর্ণরেখা তটিনী পার্শ্বতো নৃপ।
বালিশভূমিং মহীপঃ শাসনং কৃতবান্ স চ॥ ৭৭
সমবাহী তটিনীপার্শ্বে বালিশ গ্রাম এবহি॥ ৭৮
কাশযোষশ্চ দেবশ্চ পালিতস্তেনভূভৃতা॥ ৭৯
কুলিশদত্তস্য বংশেষু একত্রিংশচ্চ পুরুষাঃ।
তাম্রলিপ্তং চভূত্বাহি জগ্মুস্তে যশোমন্দিরং॥ ৮০
অতঃপরং চিত্রগুপ্তবংশে পরশুধারাখ্য সংজ্ঞকঃ।
জাত কায়স্থকুলে মতিমান্ চারুবিদ্যা বিশারদঃ॥ ৮১
কাশযোষাদি দেশাংশ্চ পরশুধারো মহীপতিঃ।
শাসনং সংযতশ্চক্রে তাম্রলিপ্তি স্থিতঃ সচ॥

* * * *

অদ্য প্রভৃতি তাম্রলিপ্তে সমুদ্রোহি মমাজ্ঞয়া।
মধ্যে মধ্যে স্রোতসাচ পুরয়িষ্যতি ভূমিকাং॥ ৪০
শস্যহীনা বসুমতী ভবিষ্যতি হি দুর্ম্মতে।
ক্ষারভূমিঃ ক্রিয়াহীনা নরাণাং শ্লীপদ প্রদা॥ ৯৮
বিবৃদ্ধশ্চরসো নিত্যং; শুষ্কো বদ্ধশ্চতে গলে।
মহান্ হ্রস্বশ্চ পঙ্গুশ্চ সর্বজন্তুষু জায়তে॥ ৯৯
স্কন্ধাবাররূপাচেয়ং কুভূপস্য সরিদ্বরা।
ভঞ্জনং নাশনং চাস্যাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১০০
ফলে বর্ষাণি যাস্যন্তি সহস্রাণি চ বৈ সদা।
বেদ সংখ্যানি বাণ সংখ্যকানি শতানি চ॥ ১০১
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তোহি ভাবিনঃ।
তব বংশাহি নির্বংশাভবিষ্যন্তি তদা খলু॥ ১০২
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলহীনা ভাবিণো মনুজাঃ সদা॥ ১০৩

—পাণ্ডব দিগ্বিজয় বা দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।

তিনি ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে রাগে এক ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদ করলে দেবী অধোমুখী হয়ে থাকেন। এর কিছুদিন পরে রাজা গোপীচন্দ্র পাংগাভূমিতে[১] গিয়ে গঙ্গাসাগরের স্রোতে মন্ত্রেশ্বরের[২] কাছে সপরিবারে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। সেই সময়ে কাঁথির পশ্চিমে কাকড় দেশের কৈবর্তরাজা[৩] একহাজার কৈবর্ত সেনা সঙ্গে নিয়ে পুরো তিন দিন ধরে রাজধানী লুণ্ঠন করেন এবং পুড়িয়ে দিয়ে যান। এ সম্পর্কে মেদিনীপুরের ইতিহাস লেখক মন্তব্য করেছেন, এই মাহিষ্যরাজাই (কৈবর্ত) কালু ভূঁইয়া। তিনি তমলুকে মাহিষ্য রাজবংশের স্থাপনকর্তা। ঐতিহাসিক যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের এই অনুমান আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, কালু ভূঁঞা থেকে পঞ্চম রাজা ভাঙ্গড় ভূঁঞা রায় ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তা'হলে এরূপ অনুমান

১। পাংগাভূমি বলতে লবণ প্রস্তুত স্থানের নাম। পাংগা এই অর্থে গুঁড়া লবণ, হিজলী অঞ্চলে দেশজ লবণকে পাংগা লবণ বলিত, 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' আছে 'মালবংগিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশ যোজনত্যয়ে। পাংগাভূমি মধ্যভাগে লবণং বহুজীবতে॥, ৯০৪

২। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পাঠে জানা যায়—শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম যাত্রার পথে তমলুকে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রেশ্বরকূলে বিষ্ণুদর্শন করে সুবর্ণরেখা নদী পার হন। নদীর পরপারে বারাসতে (বারাজিত?)—এ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রসিকানন্দের জন্মভূমিতে পৌঁছেছিলেন। এই গ্রাম ও পরগণা মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার বর্তমান রোহিনী গ্রামের ঠিক সম্মুখীন সুবর্ণরেখার পশ্চিম পারে অবস্থিত। পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৫)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—প্রথমোক্ত মন্ত্রেশ্বর কোথায়? বর্ধমান জেলায় একটি মন্ত্রেশ্বর বা মন্তেশ্বর আছে। মন্তেশ্বরের শিব বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঙ্গলোক্ত এই মন্ত্রেশ্বর সুবর্ণরেখা নদীর নিকটবর্তী।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

করা অসমীচীন হবে না যে কালু ভুঁঞা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু মাহিষ্যগণ মেদিনীপুর অঞ্চলে এর অনেক আগে আগমন করেছিলেন এবং রাজ্যস্থাপন করেছিলেন।

কৈবর্ত অর্থাৎ মাহিষ্যগণের আদি বাসস্থান উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এঁদের পূর্বপুরুষগণ অযোধ্যার সরযূ কিম্বা গোগ্রী নদীর ধারে বাস করতেন।** বিভিন্ন কারণে এই জাতির পূর্বপুরুষগণ স্থানান্তরে বসবাসের জন্য দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ মধ্যভারতে আসেন। জনশ্রুতি দ্বারা জানা যায় খুব সম্ভবত ৮২২ শকাব্দে এঁরা সর্বপ্রথম মেদিনীপুর জেলায় আগমন করেন। এবং পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে তাতে রাজত্ব করেন। এই পাঁচটি রাজ্য হোল—(১) তাম্রলিপ্ত বা তমলুক (২) বালিসীতা (৩) তুর্কা (৪) সুজামুঠা (৫) কুতবপুর।[১]

এবার একটি অনুশাসন পত্রের কথা উল্লেখ করব। এই অনুশাসন পত্র থেকে জানা যায় উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় রাজগণ তাম্রলিপ্তের অধিপতি ছিলেন। পণ্ডিত উইলসন সাহেব ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখেছেন, কলভিন্ সাহেব যে অনুশাসন পত্র

১ "27. The Kaibarttas are probably an offshoot of race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestor lived on the banks of the Saraju or Gogri, in oudh, and there is still a caste in that part of the country known by name of Kaura, the descendants of those whom their forefathers left behind them when they migrated south-wards. When the forefathers of the Present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay alone the eastern limit of the tabbland in central Indiad and tradition assigns their first applarance in the district of Midnapore to Sakabda 822. They were led by five chiefs who established as many separate chieftaincies in the district—1. Tamralipta or Tamluk,

পান, তদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদি পুরুষ নন। প্রথম যিনি কলিঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম অনন্তবর্মা বা কোলাহল। তিনি গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই অনন্তবর্মা বা কোলাহল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিঙ্গে গিয়ে প্রথম উপস্থিত হন। পরে সমগ্র উড়িষ্যা বিজয় করেন। এই গঙ্গাবংশ খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত উড়িষ্যায় একাদিক্রমে পাঁচশত বছর অত্যন্ত গৌরবের সংগে রাজত্ব করেন।[১] কোন কোন ঐতিহাসিক এই অনন্তবর্মাকে মাহিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। "মিঃ হাণ্টার, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ৺নিখিলনাথ রায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ৺ধর্মানন্দ মহাভারতী তাঁহাদের ইতিহাসে ও প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বঙ্গের মেদিনীপুরবাসী মাহিষ্যগণই গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গ জাতির বংশধর।" বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা, ৩৫।

2. Balisita. 3. Turka. 4. Sujamutta. 5. Kutabpur."—District census Report—Report on the census of the District of Midnapore, 1891, P. 4.

১ "An inscription procured since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choranga was not the founder of Ganga Vansa family, but that the first who came into Kalinga, was Ananto Verma—also called Kolahala, Sovereign of Ganga Rorhi—the low country on the right bank of the Ganges—Tumlook and Midnapore ; this occured at the end of the eleventh century of our era, and from that till the beginning of the Sixteenth the same eamily occupied the province of Orissa."

H. H. Wilson's Introduction to Mackenzie collection P. CXXXVIII—CXXXIX ও বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৩১—২৩২ পৃষ্ঠা।

তাম্রলিপ্তের বর্তমান রাজবংশ ছাড়া আমরা এখন আরো এতগুলি রাজবংশের যখন সন্ধান পাচ্ছি এবং তাঁরা সকলেই তাম্রলিপ্তে বেশ কিছুদিন ধরে রাজত্বও করেছিলেন, তখন বর্তমান রাজবংশকে কেমন করে তাম্রলিপ্তের আদি রাজবংশ বলে গ্রহণ করি? যাঁরা বলেছেন বর্তমান রাজবংশ মহাভারতের ময়ূরধ্বজের বংশধর, তাঁদের এই অভিমত অত্যন্ত দুঃখের সাথে অস্বীকার করতে এখন আমরা বাধ্য হচ্ছি। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্তমান রাজবংশের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

সপ্তম অধ্যায়

তমলুকের বর্তমান রাজবংশ

আমি পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি তমলুকের বর্তমান রাজবংশ মহাভারতোক্ত ময়ূরধ্বজের বংশধর নয়। অধিকন্তু আরো প্রতিবাদ করেছি ঐতিহাসিক যোগেশ চন্দ্র বসু ও ত্রৈলক্য রক্ষিত মহাশয়ের অভিমতকে। তাঁরা উভয়েই বলেছেন নিঃশঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তখন কালু ভূঁঞা তমলুকের সিংহসনে আরোহণ করেন। এবং তিনিই মাহিষ্য বা কৈবর্তরাজা ও বর্তমান মাহিষ্য রাজবংশের স্থাপন কর্তা। এই মত কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কৈবর্তগণ রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকেই নিম্নবঙ্গের অধিবাসী এ প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতেই আছে। মাহিষ্যগণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। নৌযুদ্ধবেত্তা বলে সুপ্রাচীন কাল থেকে এঁদের খ্যাতিও আছে। রামায়ণে আছে—

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যুনাস্তিষ্ঠান্ত্বিত্যভ্য চোদয়ৎ॥"

রামায়ণ, দ্বিতীয়কাণ্ড ৮৪ সর্গ।

অনুবাদ—"বিস্তর কৈবর্তযুবা যাইয়া এখনি,
পাঁচ সাত তরী পরে করি আরোহন,
সতর্ক হইয়া থাক্ হ'য়ে অস্ত্রপাণি,
দৃঢ়তররূপে করি, কবচ ধারণ।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪ সর্গ

রামায়ণের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় কৈবর্ত জাতি অত্যন্ত নৌবিদ্যা বিশারদ ত ছিলই অধিকন্তু নৌযুদ্ধবেত্তাও। নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হতে হলে নদী বা সমুদ্রের তীরে বসবাস না করলে সম্ভব হয় না।

তমোলুক ইতিহাসের ৮৫ পৃষ্ঠায় ত্রৈলক্য রক্ষিত মহাশয় লিখেছেন—"ময়ূরবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের শেষ রাজা নিঃশঙ্ক-নারায়ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে প্রতাপশালী আদিম রাজা কালুভূঞা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই প্রথম কৈবর্ত রাজা এবং কৈবর্ত রাজবংশের স্থাপন কর্তা।"

নিঃশঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান এমন কথা কোথাও লেখা নাই। তিনি কি প্রমাণ থেকে এই মন্তব্য করলেন জানিনা। তবে "A statistical account of Bengal, vol. III, P. 67 পৃষ্ঠায় এই মন্তব্যের সমর্থন মিলে। এছাড়া আর কোন প্রমাণ নাই।

যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় বলেছেন কাকরদেশ থেকে এসে কালুভুঁঞা তমলুক তিনদিন ধরে লুণ্ঠন করেন এবং তিনিই কৈবর্ত রাজবংশের স্থাপনকর্তা। কৈবর্ত রাজা তমলুক আক্রমণ করেছিলন[১] এ তথ্য সত্য এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই কৈবর্তরাজ যে স্থায়ী ভাবে তমলুকে বাস করেছিলেন এবং ইনিই কালু ভুঁঞা এমন কথা কোথাও লেখা নাই। তাই আমরা এই তথ্য গ্রহণ করতে পারিনি তা' পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তা'হলে বর্তমান রাজবংশের স্থাপন কর্তা কে? এবং তিনি কতদিন আগে তমলুকে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন? অপরপক্ষে আরো কতকগুলি সমস্যাও আছে। যদি কালু রায় ভুঁঞা নিঃশঙ্কনারায়ণের পুত্র হন, তা'হলে তিনি 'ভুঁঞা' উপাধি গ্রহণ করলেন কেন এবং 'রায়' পদবিই বা ত্যাগ করলেন কেন?

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ ৫ম রাজা বিদ্যাধর রায় থেকে ৩৭ম রাজা নিশঙ্কনারায়ণ রায় পর্যন্ত এই ৩৩ জন রাজাকে ক্ষত্রিয় রাজা বলে মনে করেন এবং এই ৩৩ জন রাজার পদবি ছিল রায়। এর

১। মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৯২—১০৩ পৃঃ।

পরবর্তী রাজা কালু রায় ভূঁঞা বা কানু রায় ভুঁঞা কৈবর্ত রাজা। এই বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ হোল 'ভূঁঞা' উপাধি।

এখন দেখা যাক এই "ভূঁঞা" উপাধির ইতিহাস কি। "প্রাচীন কালে বিজিগীষু রাজা, তাঁহার শত্রু এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত রাজাদিগকে লইয়া একটি মণ্ডল কল্পনা করা হইত, উক্ত মণ্ডলে দ্বাদশ জন নৃপতি থাকিতেন।"[১] ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থানে এক এক রাজার অধীনে দ্বাদশ জন সামন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে ইহাই দৃষ্ট হয়। বাংলার বারভূঁইয়া সম্বন্ধে এইরূপ স্থির হয় যে, পাল রাজগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাংলার বারভূঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন সময়ে বার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্যন্ত তাহার পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ নির্মাণ ও পুষ্করিণী খননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বার-ভূঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (Daltan's Ethnology of Bengal) এবং সেই সময়ে পাল-রাজগণ সমগ্র বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর থাকায় সম্ভবতঃ ভূঁইয়াগণ

১ মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং।
এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।"
"উদাসীন প্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।
অষ্টৌচান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতা।"

মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়

তাঁহাদের অধীনে সামন্তরাজ রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বারভূঁইয়ার ও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিবাহাদি উৎসবে বারভূঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলী কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বার-ভূঁইয়াগণ সামন্তরাজই ছিলেন। ইঁহাদের প্রাধান্য ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারভূঁইয়াগণ অনেকদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার তিনজন প্রাচীন ভূঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে।[১] * * * পালবংশের পর সেনবংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভূঁইয়াগণের অধিকার ছিল, কিন্তু সে সময়ে মূল বারভূঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধহয় এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভূঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধহয় তাঁহাদের সংখ্যার ও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বারভূঁইয়া নামে অভিহিত হইতেন। পাঠান রাজত্বকালে তাঁহাদের অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্যের পুরস্কার স্বরূপ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েকজন হিন্দু ভূঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বারভূঁইয়া নামে কথিত

১। Taylor's Topography of Dacca.

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (Founders of Pal Dynasty of the Kings of Bengal) are the next rubrs spoken of Three of them took their abode in this distirct of the north of Buriganga and Dhabswari where the sites of their capital are still to be seen."—Hunter's Statistical Account of Dacca.

হইতেন।" প্রতাপাদিত্য, নিখিলনাথ রায়, ১৩১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।

ভূঁইয়া উপাধি গ্রহণের এই যদি ইতিহাস হয়, তা'হলে তমলুক রাজগণ যে পাল রাজগণের আমল থেকে তাঁদের পদবির সাথে ভূঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। আরো লক্ষ্য করা যায় যে এই বংশে ৩৯ রাজা কালু রায় থেকে ৪৬ রাজা রাম রায় পর্যন্ত এই নয় জন রাজা মাত্র ভূঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাই বলে এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় না যে এই নয় জন রাজা এই বংশের নয়। কারণ, পরবর্তী রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকাল (৯৭৩ নং ১০২৪ সাল, ৫২ বৎসর) খ্রীষ্টাব্দ ১৫৬৪ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত ৫২ বৎসর। এই সময় সম্রাট আকবর বাংলা থেকে পাঠান শক্তির উচ্ছেদ সাধন করেন। রাজা তোড়লমল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার "আসল জমা" তুমার প্রস্তুত করেন। তদনুসারে ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বাংলাদেশ ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত হয়। আর ঠিক এই সময় থেকে ভূঁইয়া প্রথারও প্রচলন বন্ধ হয় এবং জমিদারী প্রথার প্রবর্তন হয়। তাই শ্রীমন্ত রায় 'ভূঁইয়া' উপাধি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইজন্য শ্রীমন্ত রায়ের পরবর্তী রাজাগণও তাঁদের নামের শেষে ভূঁইয়া উপাধি ব্যবহার বন্ধ করেন। বর্তমান রাজবংশের কোর্ষিনামাতে কানু রায় ভূঁঞা লেখা আছে। এ থেকে মনে হয় তাঁরা রায় পদবি ত্যাগ করেননি এবং রায় পদবির সংগে সংগে "ভুঁইয়া" উপাধিও পাল রাজগণের সময় থেকে ব্যবহার করেছিলেন।

এবার তা'হলে প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান রাজবংশ কতদিনের এবং কোন সময় তাঁরা এখানে এসেছিলেন? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, রাজবংশে যে কোর্ষিনামা আছে, তার উপর মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। স্মৃতি মন্থন করে এই কোর্ষিনামা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই ঠিক পর পর যে

রাজাদের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে এমন মনে হয় না। হয়ত অন্য বংশের রাজাদের নাম এই কোর্ষিনামাতে ঢোকা বিচিত্র নয়, কিংবা একই বংশের একই পুরুষের দু'তিনজন রাজার নাম পর পর সন্নিবেশিতও হতে পারে। তবে এবিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে একটি মত খাড়া করা যেতে পারে। এবং এই মতকে জোরদার করতে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিতও করা যায়। আমি এখানে সেই মতটির সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের District census Report-এর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় কৈবর্তগণ ৮২২ শকাব্দে মেদিনীপুর জেলাতে সর্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগমন করেন এবং তাঁরা পাঁচটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তা'হলে আজ থেকে ১০৬৪ বছর আগে সর্বপ্রথম মাহিষ্য অর্থাৎ কৈবর্তগণ এখানে এসেছিলেন। যদি এই জনশ্রুতিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, তা'হলে বাংলাদেশে তখন রাজত্ব করতেন পাল রাজবংশধর রাজ্যপাল। বাংলাদেশে রাজ্যপালের রাজত্বকাল ৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অবশ্য এই রাজত্বকাল আনুমানিক ভাবে ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের মতেই করা হয়েছে। যদি এই মত গ্রহণ করি তা'হলে রাজ্যপাল আজ থেকে ১০৫৩ বছর আগে বর্তমান ছিলেন। এবং এই রাজ্যপালের সময়ই কৈবর্তগণ মেদিনীপুরে এসেছিলেন। তা'হলেও প্রশ্ন উঠে, প্রবাদ আছে তীর্থ অনুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ থেকে বার জন এসেছিলেন করতোয়া নদীর ধারে। এঁদের মধ্যে অনেকেই পালবংশীয়। পাল সম্রাটগণ জাতিতে কি? এবং রাজ্যপাল যে দক্ষিণ বঙ্গ এবং উড়িষ্যা জয় করেছিলেন তারি বা প্রমাণ কি?

মেদিনীপুর অঞ্চলে কৈবর্তগণ মাহিষ্য বলে পরিচিত। তা'হলে পালরাজগণ কি মাহিষ্য? অনেক মাহিষ্য ঐতিহাসিক পালরাজগণকে 'মাহিষ্য' বলে খাড়া করেছেন এবং এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণ

দেখিয়েছেন। এইসব প্রমাণ উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। যাই হোক এ সম্পর্কে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মত উল্লেখ করছি। মজুমদার মহাশয় 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এর ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"গোপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণের তাম্র শাসনে উক্ত হইয়াছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু" সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার পিতা বপ্যট শত্রুর দমন এবং বিপুল কীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল যে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পিতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবতঃ পিতার অনুসরণ করিয়া প্রধান ও সুনিপুণ যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই সঙ্কট সময়ে বংশমর্যাদাহীন যুদ্ধানভিজ্ঞ তরুণ বয়স্ক কোন ব্যক্তির রাজপদে নির্বাচন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালে পালগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল সমসাময়িক একখানি গ্রন্থে 'রাজভটাদি বংশপতিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পালরাজগণ খড়গবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর। কিন্তু এখানে রাজভট শব্দ রাজসৈনিক অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক। * * * প্রায় চারিশত বর্ষ পরে রচিত রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমি পালরাজগণের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে গোপাল বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন।"

একাদশ শতাব্দীতে গণপতি শাস্ত্রী খ্রীষ্টপূর্ব ৭ থেকে ১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের রাজগণের জাতি সম্বন্ধে যে ইতিহাস লিখেছেন, তার নাম মঞ্জুশ্রী মূলকল্প। এই পুস্তকের ৮৮৩ শ্লোকে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের জাতি সম্পর্কে এইরূপ লেখা আছে—

ততঃ পরেণ ভূপালা গোপালা দাস জীবিনঃ।
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো দ্বিজাতি কৃপণা জনাঃ॥

অর্থঃ অতঃপর দাস জাতির গোপাল রাজা হইলেন। তিনি যে ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপণ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই দাস অর্থে কৈবর্ত মাহিষ্যকেই বোঝায়। মনুর ১০।৪৪ শ্লোকে পুণ্ড্র এবং বঙ্গের একমাত্র অধিবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে সংস্কারহীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা দাস জাতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা তারানাথ গোপালকে বৃক্ষ দেবতার পুত্র অর্থাৎ কৃষক জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। এইসব থেকে মনে হয় গোপাল ব্রাহ্মণ ত ছিলেনই না অধিকন্তু কোন রাজবংশেও জন্মগ্রহণ করেন নি। তাই গোপাল যে ঠিক ঠিক জাতিতে কি ছিলেন তা' নিশ্চয় করে বলা বড় কঠিন। আজকের মত জাত বিচার তখন এত প্রবল আকার ধারণ করেনি। বস্তুত সেন রাজত্বের পূর্বে বঙ্গে জাতি বিভাগ ছিল না। তাই আমার মনে হয় আজ আমরা যাঁদেরকে মাহিষ্য বলে অভিহিত করছি তাঁরাই অতীতে ছিলেন কৈবর্ত। আবার কৈবর্তেরও আগে এই জাতির ছিল বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ। তারও আগে হয়ত পালগণ দাস জাতি ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে পালরাজগণ বৌদ্ধ বলে পরিচিত। বৈষ্ণব ধর্ম হলেও আজ বৈষ্ণব একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে, যদি একথা বলি, তা'হলে বোধহয় অন্যায় হবে না। তেমনি শত শত বছরের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির ও অনেক পরিবর্তন হয়েছে একথা অস্বীকার করলে চলবে কেন!

এখন যদি তর্কেরও খাতিরে ধরেনি মেদিনীপুরে মাহিষ্যগণ পালরাজগণের বংশধর এবং তাঁরা এসেছেন রাজ্যপালের সময়, তা'হলেই বা তার প্রমাণ কি? রাজ্যপালের রাজত্ব সম্পর্কে আজো বিশেষ কিছু আমাদের জানা নাই। তিনি কেমন রাজা ছিলেন,

তাঁর রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমন কোন হদিস আমর কোন ইতিহাসে পাইনি। তা'হলে উপায়!

সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'ভাতুরিয়া শিলালিপি' এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান দিয়েছে। রাজসাহী জেলার মোহনপুর থানার অন্তর্গত ভাতুরিয়া গ্রামে অবস্থিত একটি মসজিদে এই শিলালিপিটি পাওয়া যায়। রাজসাহীর তদানীন্তন পুলিশ সুপার মিঃ মির্জা মোখ্‌তার উদ্দীন আহমদ, এম-এ, এটাকে উদ্ধার করে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট তারিখে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে দান করেন। ইহা বর্তমানে সমিতির যাত্নঘরে সংরক্ষিত আছে। এই শিলালিপিটি রাজ্যপালের মন্ত্রী যশোদাসের। শিলালিপিতে রাজ্যপালের রাজ্য সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। এই শিলালিপি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ বাংলা ১৩৬৩ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী এম-এ, বি-টি মহাশয় দিয়েছেন।

রাজ্যপালের মন্ত্রী যশোদাসের সম্পর্কে দ্বিতীয় শ্লোক থেকে জানা যায় যে বৃহদ্বট্টা নামক স্থানের অন্তর্গত অট্টামূল দাস জাতির বাসভূমি ছিল। এই স্থান এখন কোথায় তা' বলা বড় ত্নঃসাধ্য। তবে উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির মধ্যে প্রশস্তিটির প্রাপ্তিস্থানের নিকটবর্তী কোথাও অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গোপালের পিতৃভূমি যে বরেন্দ্র ছিল একথা রাম-চরিতে সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছেন।

এই শিলালিপির অষ্টম শ্লোক হোল—

"রেড্রৈরুড্ডীনজীবৈরখ্যাতকপটৈঃ
ম্লেচ্ছৈরুচ্ছন্ন কল্পৈঃ পরিজন বিকলৈরঙ্গ কলিঙ্গ বঙ্গৈ
............পাণ্ড্য কর্ণাট লাটৈঃ।
সুক্ষৈঃ সোপপ্রদানৈরাসিভয় চকিতৈ গুর্জ্জর কৃতচাপৈ
র্যস্মিস্তন্ত্রাসিকারং বিদধতি দধিরে ভর্ত্তুরাজ্ঞা শিখারোক্তিঃ॥৮"

বঙ্গানুবাদ॥ যাঁহার (যশোদাসের) মন্ত্রিত্বকালে উৎপাদিত প্রায় ম্লেচ্ছগণ; যাহাদের আত্মীয় স্বজন বিকল প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অঙ্গ-বঙ্গ ও কলিঙ্গ; জীবন যাহাদের উড়িয়া গিয়াছিল সেই উৎকলবাসীরা, কপটতা যাহাদের দূরীভূত হইয়াছিল সেই পাণ্ড্য কর্ণাট ও লাটগণ; তরবারীর ভয়ে চকিত সুহ্মগণ (সুহ্ম) ধনুকের দ্বারা বিজিত গুর্জরগণ উপহার প্রদান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়াছিল।

রাজ্যপাল যে বিজয় অভিযান করেছিলেন এই শিলালিপি থেকে প্রথম তা' জানতে পারা যায়। ৮ম শ্লোকে স্পষ্টই লেখা আছে রাজ্যপাল অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় করেছিলেন। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন—"অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম প্রভৃতি পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশগুলিতে নূতন স্বাধীন রাজাদের আবির্ভাব হইয়াছিল।" এইসব স্বাধীন রাজাকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করে তৎস্থানে তৎবংশীয় সামন্ত নৃপতিগণকে অথবা যশোদাস বংশীয় কৈবর্তগণকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন এ অনুমান করা যেতে পারে। সুহ্ম দেশের মধ্যে তাম্রলিপ্তকে পূর্বে সুহ্ম বলে অভিহিত করাও হোত এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাই আমার মনে হয় রাজ্যপালের সময়েই কৈবর্তগণ অর্থাৎ বর্তমান মাহিষ্য রাজবংশ তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। তাম্রলিপ্তের আদি রাজা খুব সম্ভব বিদ্যাধর রায়। তা'হলেও সেই রাজ্যপালের সময় থেকে যে আজ পর্যন্ত অভিন্ন ধারায় বর্তমান রাজবংশ রাজত্ব করে আসছেন একথা বলা চলে না। এই রাজ-বংশের হাত থেকে অনেকবার তাম্রলিপ্ত হাত ছাড়া হয়েছে আবার কিছুদিন পরে এঁরাই যুদ্ধ করে হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক রাজ্য ফিরে পেয়েছেন।

যশোদাস সম্ভবত কৈবর্তপ্রধান ছিলেন। এই শিলালিপির

অষ্টম অধ্যায়

তমলুকের অন্যান্য রাজগণ

তমলুকের দ্বিচত্বারিংশৎ রাজা ভাঙ্গর রায় ভূঁঞা ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে (৮১০ সাল) পরলোক গমন করেন। এই রাজা ভাঙ্গর রায়ের সময় থেকেই কিছু কিছু সময়ের নিরূপণ পাওয়া যায়। এঁর পূর্ববর্তী রাজাদের কোন কালপঞ্জী আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই পূর্ববর্তী রাজাদের রাজ্যকাল সম্পর্কে কোন কিছু বলা অসম্ভব। ভাঙ্গর রায় যখন তাম্রলিপ্তের রাজসিংহাসনে আসীন তখন বঙ্গের মসনদে গয়েসউদ্দিনের পুত্র সৈফউদ্দিন হাম্‌জা সাহ। তাঁর রাজত্বেরও বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায়নি। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নির্বিবাদে দশ বৎসর রাজত্ব করে ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারপর বঙ্গের মস্‌নদে আমরা যাঁকে পাচ্ছি তিনি হলেন রাজা গণেশ। নবাব সৈফউদ্দিনের পোষ্যপুত্র দ্বিতীয় সামসুদ্দিনকে যুদ্ধে নিহত করে বাংলার সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৪০৯—১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় তমলুকের রাজা ছিলেন ধিতাই রায় ভূঁঞা। এঁর রাজত্বকাল ১৪০৪—১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। রাজা গণেশও ভূঁঞা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ভাতুরিয়াতে তাঁর জমিদারী ছিল। গণেশ জাতিতে কি ছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

ধিতাই রায় ভূঁঞার পর ১৪৫৫—১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জগন্নাথ ভূঁঞা এবং জগন্নাথের পর যদুনাথ (১৪৯৬—১৫২৭) ও রামভূঁঞা রায় ১৫২৭—১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তমলুকে রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্ব সম্পর্কে কোন কিছু বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়নি। তবে

রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ

জেলা গ্রন্থাগার (তমলুক)

শীতলামঙ্গলের একটি পৃষ্ঠা।
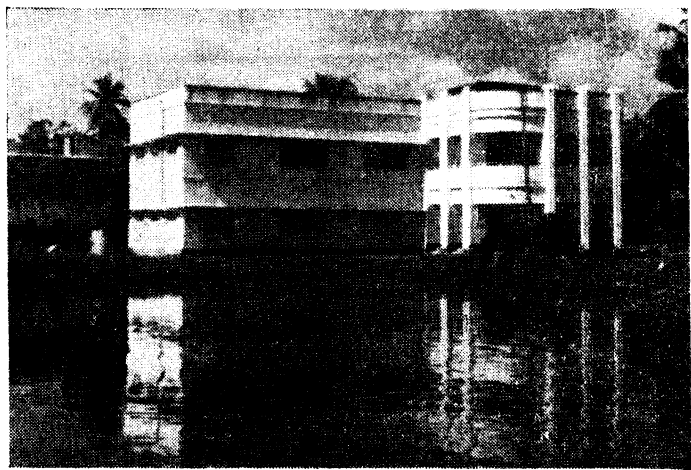
রাম ভূঁঞা রায়ই ভূঁঞা উপাধির শেষ রাজা। এঁর পরবর্তী বংশধরগণ আর 'ভূঁইয়া' উপাধি গ্রহণ করেননি।

রাজা রাম রায়ের রাজত্বকালে গৌড়ের বাদশাহ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (তিন মাস মাত্র), গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৫৩২—১৫৩৮), শেরসাহ (১৫৩২—১৫৫৩) এই তিনজন নৃপতি। এর পর দশ বৎসর চলে অরাজকতা। তবে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পরেও বাংলার মসনদে মহম্মদ সাহঁ নামক শেরসাহের এক আত্মীয় রাজত্ব করেন। তিনি মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপরাঘাট নামক স্থানে নিহত হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৫৫২—১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শেরসাহ খিজির খাঁর কাছ থেকে বঙ্গের রাজত্ব গ্রহণ করে বাংলা দেশকে দ্বাদশ মণ্ডলে ভাগ করে কাজি ফজলৎ নামক এক বিজ্ঞ রাজনীতি কুশল ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

রাজা শ্রীমন্ত রায়

(১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ)

রাজা শ্রীমন্ত রায় যে বৎসর তমলুকের সিংহাসনে আরোহণ করেন, ঠিক সেই সেই বৎসর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আদেশে কারাপ্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খাঁ রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য গোণ্ডয়ানা জয় করেন। রামভূঁঞা রায়ের দুই পুত্রের মধ্যে শ্রীমন্ত ছিলেন বড় এবং কনিষ্ঠ ত্রিলোচন। সুলেমান কররাণী তখন বাংলার মসনদে। তার রাজত্বকাল ১৫৬৩—১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর দায়ুদ খাঁ ১৫৭২—১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং উৎকলে রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব ১৫০৪—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকালে বাংলার মসনদে কম করে হলেও ৯ জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। আকবর বাংলা দেশ থেকে বারভূঁইয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করে ভূঁঞা প্রথার পরিবর্তে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন

করেন। ফলে শ্রীমন্ত রায়ের রাজ্য তমলুকও সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হয়। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তোড়লমল্ল শেরসাহের নির্ধারিত পথে বাংলাদেশকে কয়েকটি সরকারে ভাগ করেন। এই সরকার-গুলির মধ্যে জলেশ্বর সরকার অন্যতম। জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল ২০টি মহাল। এই কুড়িটি মহালের মধ্যে ৯ম মহাল হোল তমলুক।

আইন-ই-আকবরীতে দৃষ্ট হয় তৎকালে তমলুকের রাজস্ব ছিল ২৫,৭১,৪৩০৲ পঁচিশ লক্ষ একাত্তর হাজার চারিশত ত্রিশ সিক্কা টাকা। এই গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় তৎকালে তমলুকে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গও ছিল। এই রাজা শ্রীমন্ত রায়ের আমলেই ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করেন। তমলুক দিয়েই কালাপাহাড়ের সৈন্যদল উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেছিল। প্রবাদ আছে কালাপাহাড় অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করলেও বর্গভীমা মন্দির ধ্বংস করতে পারেননি। এছাড়া আর কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে এ বিষয়ে আর একটি বক্তব্য এই যে সম্ভবত এই সময় অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কি শেষ ভাগে শ্রীমন্তনারায়ণ নামে আর একজন ব্রাহ্মণ রাজা ভুরসুটে পাঁড়ুয়াগড়ে রাজত্ব করতেন। তিনি অসাধারণ বলশালী ও বুদ্ধিমান, বীরপুরুষ ছিলেন। ভুরি-শ্রেষ্ঠের ইতিহাস পাঠে জানা যায় তিনি নাকি বর্গভীমার মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে তমলুকের রাজা শ্রীমন্ত রায়ও রাজ্যের অনেক কল্যাণ করেছিলেন। তিনি তমলুকে জগন্নাথ দেবের মূর্তি ও 'শ্রীমন্ত দীঘি' নামে একটি বিরাট দীঘি খনন করেন। প্রবাদ আছে এই দীঘি নাকি একদিনে খোদিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক মন্দির ও ছোট ছোট পথ ঘাট নির্মাণ করে ছিলেন। এই সব দেখে মনে হয় বর্তমান বর্গভীমার মন্দিরও তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। ভুরসুটের শ্রীমন্ত ও তমলুকের শ্রীমন্তের মধ্যে বোধ হয় একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে ভুরসুটের শ্রীমন্তকে

বর্গভীমার প্রতিষ্ঠাতা বলে "ভূরিশ্রেষ্ঠের ইতিহাসকার বর্ণনা করেছেন,। এ বিষয়ে কিছু সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। শ্রীমন্তের সময়ে তমলুক রাজবংশে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। ফলে শ্রীমন্ত রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রিলোচন রায় জমিদারী ভাগাভাগি করে স্বতন্ত্র ভাবে রাজত্ব করেন। ত্রিলোচন চার আনা অংশের জমিদারী ভোগ করে ছিলেন। শ্রীমন্ত রায়ের সাত পুত্র ছিল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্ত রায় পরলোক গমন করলে নিম্নলিখিত ভাবে জমিদারী ভাগাভাগি হয়।

শ্রীমন্ত রায়ের ভাই ত্রিলোচন রায় ।০ আনা, জ্যেষ্ঠপুত্র কেশব রায় ।/০ শ্যাম রায় /১০, মনোহর রায় /১০, হরি রায় /১০, অনন্ত রায় /১০, রূপ রায় /০ ও দুর্গাদাস রায় /১০।

এই সাতজন ভাই পৃথক পৃথক সাতটি গড়ে রাজত্ব করেছিলেন। এই সাতটি গড়ের মধ্যে গড় পদুবসান, বাঁইচ্‌বেড়ে গড়, গড় ডিঙ্গলবেড়ে, গড় বেতালদীঘি ও গড় ভোলসোরা এই পাঁচটি গড়-এর চিহ্ন আজো বর্তমান আছে। কিন্তু অপর তিনটি গড়ের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

হন্টর সাহেব লিখেছেন ৪৮শ রাজা কেশব রায় মোগল বাদশাহ কর্তৃক ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন। (Statistical Account of Bengal, Vol, III, P. 228)। কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বংশবলীতে উক্ত রাজ্যচ্যুতির কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে মনে হয় খুল্লতাত ত্রিলোচন রায় ও কেশব রায় প্রভৃতি ভ্রাতাগণের মৃত্যু হলে হরি রায় ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জমিদারীতে কর্তৃত্ব করেন।

১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পরলোক গমন করলে তমলুক রাজ্য আবার দু'ভাগে ভাগ হয়। রাজা হরি রায়ের পুত্র রাজারাম রায় ॥/১০ আনা এবং রাজা হরি রায়ের ভ্রাতা মনোহর রায়ের পুত্র রাজা গম্ভীর রায় ।৵১০ আনা অংশ উভয়ে ভাগ করে নিয়ে ১৭০২

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। "তমলুক মঙ্গল" প্রণেতা রাজনারায়ণ রায় বলে একজন রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোর্ষিনামাতে এই নামে কোন রাজার নাম পাইনি। মনে হয় রাজারাম রায়ই রাজনারায়ণ রায় নামে অভিহিত ছিলেন। এই রাজারাম রায় সম্পর্কে "তমলুক মঙ্গল" প্রণেতা বলেছেন —

"কলা শাস্ত্রবিৎ কাব্যমোদী রাজা রাজনারায়ণ রঙ্গ রসিকতায় বহু ব্যয়ী ছিলেন! সদাশয় রাজা যাদবরাম অনেক ব্যক্তিকে বিত্ত স্বরূপ বহু সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি সংসার অস্থায়ী বলিয়া তিনি উপদেশ ছলে সর্বদাই যরী, রলা, ইরং, নয় বলিতেন। ইহার দুই দুইটি অক্ষরে একটি কবিতার আদি ও অন্ত অক্ষর আছে।[১] তমলুক রাজার মল্লশ্রেষ্ঠ দ্বাররক্ষক মস্তারাম প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন ঐ সকল নামের ছড়া এদেশে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে।"—তমলুক মঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৯।

এই সম্পর্কে উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে দু'টি ছড়া সন্নিবেশিত আছে। এই ছড়াগুলি সত্যি সত্যি কিছুদিন আগে পর্যন্ত তমলুকের বিভিন্ন স্থানে শোনা যেত। ছড়া দু'টির একটি হোল—

"দানে চন্দু অন্নে মান্নু সর্ব্বে রাজনারাণ।
মালে মস্তারাম সিদ্ধ বিত্তে যাদবরাম॥"

দানবীর চন্দু যে কে ছিলেন আজ আর তা' জানবার কোন উপায় নাই। অন্নদাতা মান্নুও আমাদের বিস্মৃতির তলে কোথায় তলিয়ে গিয়েছেন। বিত্তবান যাদবরামকে ও কোর্ষিনামায় কোথাও

১ যদুপাতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনস্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয়।

খুঁজে পেলাম না। তাই পূর্বেই আমরা বলেছিলাম তমলুক রাজবংশে রক্ষিত কোষ্ঠিনামাকে মোটেই বিশ্বাস করা চলে না। এমনি কত মহান যাদবরাম যে কালের কপোলতলে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন, তার কোন ইয়ত্তা নাই। তমলুকের প্রকৃত ইতিহাস জানার আজ আর কোন উপায় নাই। অত্যন্ত লজ্জার হলেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যদি না আমাদের দেশের ইতিহাস রক্ষা করতেন, তা'হলে আজ আমরা যেটুকু জানতে পারছি তা'ও জানতে পারতাম না।

রাজা নরনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ

(১৭০৩—১৭৩৭ ও ১৭০৩—১৭৩৭ খৃঃ)

রাজা রামরায়ের পুত্র নরনারায়ণ ও রাজা গম্ভীর রায়ের পুত্র প্রতাপনারায়ণ। এঁরা উভয়ে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তমলুকে রাজত্ব করেন। নরনারায়ণ সাড়ে ন'আনা অংশের ও প্রতাপনারায়ণ সাড়ে ছ'আনা অংশের রাজা ছিলেন। পরে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩ বৎসর কাল নরনারায়ণই সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে এবং মহারাষ্ট্রে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিন্ন পথ ধরেছে। যখন রাজা নরনারায়ণ রাজত্ব করছেন অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণে- ১ম বাজিরাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করছিলেন। ঠিক এমন সময় মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হোল। আর ঠিক এই বৎসরই রাজা নরনারায়ণ রায়ও পরলোক গমন করলেন। এঁর দু'রাণীর গর্ভে দু'টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোট গর্ভজাত পুত্র কৃপানারায়ণ জ্যেষ্ঠ ও বড় রাণীর গর্ভজাত পুত্র কমলনারায়ণ ছিলেন কনিষ্ঠ। এঁরা উভয়ে ২০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে

রাজা কৃপানারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলে রাজা কমলনারায়ণ রায়ই সমগ্র রাজ্যের মালিক হন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তমলুকে রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে রাজা নরনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে আমি একজন কবির সন্ধান পেয়েছি, তাঁর নাম দ্বিজ জগন্নাথ। কিছুদিন আগে আমি মামুদপুর গ্রাম থেকে এই কবির মণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেছি। যখন তাম্রলিপ্তে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করব তখন এবিষয়ে বিশদ ভাবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

যাই হোক, তমলুকে এর পর যিনি রাজত্ব করেছিলেন তিনি হলেন মুসলমান খোজা মির্জা দিদার আলি বেগ। এঁর কথা স্বতন্ত্র ভাবে নিম্নে আলোচনা করছি।

খোজা মির্জ্জা দিদার আলিবেগ

(১৭৫৭—১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ইংরাজী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। বাংলার ভাগ্যাকাশ তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেশের অবস্থা ভীষণ বিপদসঙ্কুল। এই বৎসরের ২৩-এ জুন বৃহস্পতিবার পলাশীর আম্রকাননে ক্লাইভ এবং সিরাজের সংগে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দেশ বৃটিশশক্তির অধিকারে আসে।

তমলুকের রাজবংশেও দেখা দেয় নানা অশান্তি। গৃহবিবাদ রাজবংশে প্রবল আকার ধারণ করে। এই গৃহবিবাদের মধ্যেই রাজা কমলনারায়ণ রায় দেহত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে নবাব দরবারে নিয়মিত তমলুক থেকে রাজস্বও প্রেরিত হোত না। এইসব নানা কারণে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মসনদী মহম্মদ খাঁর প্রিয় বন্ধু খোজা মির্জা দিদার আলি বেগ তমলুক জমিদারী গ্রহণ করেন। ফলে

তমলুকের রাজবংশ পতৃযবসানে অর্থাৎ বর্তমান রাজবাটী পরিত্যাগ করে বাঁহিচবেড়ে গড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দিদার আলিবেগ ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসর তমলুকের জমিদারী পরিচালনা করেন। তাঁর এই দশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি রাজ্যের বিশেষ করে কৃষিপ্রধান তমলুক অঞ্চলের জন্য চিন্তা করেন। তমলুক হোল নীচু জায়গা। ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি হলে কাশীজোড়া পরগণার জল গড়িয়ে তমলুক অঞ্চল হোত প্লাবিত। ফলে তমলুক অঞ্চলের সমূহ শস্য নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হোত। ইহার প্রতিরোধের জন্য তমলুকের পশ্চিম পাশে একটি সুউচ্চ বাঁধ তিনি নির্মাণ করান। এই বাঁধের চিহ্ন আজো বর্তমান আছে। ইহাকে 'খোজার ভেড়ি বাঁধ' বলে। কথিত আছে এই বাঁধের মাটি ভালভাবে জমাট করার জন্য হাত দিয়ে মাড়ান হয়েছিল। কাশীজোড়া পরগণার কথা পরিশিষ্ট ভাগে বিশেষ ভাবে আলোচনা করব। মির্জা দিদার আলি বেগ সাহেব মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। তিনি স্বধর্মে অনেক নিম্নজাতীয় হিন্দুকে দীক্ষিত করেন। ফলে তমলুকে মুসলমানের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দিদার আলি বেগ সাহেব ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় তমলুক রাজবাটীর দেউড়ির পশ্চিম দিকে। আজিও দিদার আলি বেগের সমাধি বর্তমান আছে। শোনা যায় আলি সাহেবের বংশধরগণ আজও খড়গপুরে অবস্থান করছেন। কোন মুসলমান পর্বোপলক্ষে মুসলমানগণ আজও এই আলি সাহেবের সমাধিতে এসে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন। রাজবাটী থেকে মুসলমানদের পর্বোপলক্ষে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়।

রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া

(১৭৬৭—১৭৭০ খৃঃ ও ১৭৬৭—১৭৮৩ খৃঃ)

দিদার আলিবেগ যখন মারা গেলেন, তখন বাংলা আর নবাবদের হাতে নেই। বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ তখন স্বদেশে। মীরজাফর বাংলার মসনদে। কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রজা আর নবাবকে অর্থের জন্য ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করেছেন। মীরজাফর যোগাতে পারছেন না অর্থ। ইংরেজদের নূতন গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর তাঁর কাউন্সিলের মেম্বারগণ পরামর্শ করলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে বসাবেন বাংলার মস্নদে। বিনিময়ে কোম্পানীকে দিতে হবে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী আর তাঁদের পরিষদবর্গকে নগদ করকরে দু'লক্ষ টাকা।

এরপর নানা গোলযোগের মধ্য দিয়ে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার লাভ করলেন দেওয়ানী সনন্দ। বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এলেন লর্ড ক্লাইভ। তখন বাংলার নবাব মীরজাফরের অপদার্থ পুত্র নাজিম-উদ্দৌলা। ক্লাইভ এসে বাংলা দেশে যে শাসন প্রণালী প্রবর্তন করলেন তা' হলো দ্বৈত শাসন-প্রণালী। এই শাসন ক্ষমতার ফলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এল দেওয়ানী,—অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার। পূর্ব প্রথানুয়ায়ী দেওয়ান দেশরক্ষার জন্য থাকতেন দায়ী,—সে কাজ ছিল সুবাদার বা নবাবের। কিন্তু দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজও গ্রহণ করলেন কোম্পানী। শুধু নবাবের হাতে থাকল বিচার ও শাসনের ভার।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন রাজা কমল-নারায়ণের মাতা অর্থাৎ রাজা নরনারায়ণ রায়ের মহিষী রাণী সন্তোষপ্রিয়া এবং রাজা কৃপানারায়ণ রায়ের মহিষী রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া

উভয়ে যুক্তভাবে আবেদন করলেন কোম্পানীর কাছে নবাব দরবারে। এই কাজে বিশেষ ভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। বিশেষ করে রাজস্ব বিষয়ে নন্দকুমারের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব-সময়ে হিজলী ও মহিষাদলের আমীন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে তমলুক অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। এদিকে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন। নন্দকুমার সম্পর্কে ক্লাইভের ধারণা কিরূপ ছিল তা' ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয় এমনি ভাবে বলেছেন—

"মীরজাফর মস্‌নদে বসিলে রায় দুর্লভ তাঁহার দেওয়ান হইলেন। মুতখ্‌খরীনে লিখিত আছে, মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করার পর নন্দকুমার ক্লাইভের মুন্‌শী ও দেওয়ান হন। এ-কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে; কারণ নন্দকুমার ইংরেজদিগের সহায়তা করায়, এবং তাহার ফলে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটায়, ক্লাইভ যে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সময়ে ক্লাইভ নন্দকুমারের উপর এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তাঁহাকে পুনর্ব্বার হুগলী, হিজলী প্রভৃতির দেওয়ানী প্রদান করিতে নবাবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ক্লাইভের অনুরোধে নবাব নন্দকুমারকে সেই সকল প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী। পৃঃ ৩১।

নন্দকুমারের প্রতি ক্লাইভের এই প্রসন্নতাই তমলুকের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। নন্দকুমার তখন তমলুক, মহিষাদল, প্রভৃতি অঞ্চলের দেওয়ান। তাই তিনি কোম্পানী এবং নবাবকে বিশেষ ভাবে বুঝাবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া পুনরায় তাঁদের জমিদারী ফিরে পান। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজ নন্দকুমারের এই উপকারের কথা রাণীদ্বয় ভুলেন নি। তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারকে ছ'খানি ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে আটখানি গ্রাম উপহার দেন। তা'

আজিও তমলুক জমিদারীর দক্ষিণাংশে তালুক বাসুদেবপুর ও তালুক গোপালপুর নামে বর্তমান আছে। নন্দকুমার বাসুদেবপুর তালুকে গ্রামবাসীগণের সুবিধার জন্য একটি হাট বসিয়ে ছিলেন, তা' 'নন্দকুমারের হাট' নামে আজিও বর্তমান আছে। কয়েক বছর আগে এই হাটের উপরে "মহারাজ নন্দকুমার উচ্চ বিদ্যালয়" দেশবাসীগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইহা নন্দকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। এই হাটের উপরে মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত দু'টি শিব মন্দির আজিও বর্তমান আছে। পরবর্তীকালে নন্দকুমারের উত্তরাধিকারীগণ তালুক বাসুদেবপুর মহিষাদল রাজাকে হস্তান্তর করেন। এক্ষণে দেশ স্বাধীন হওয়ায় মহিষাদল জমিদারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তগত হয়েছে।

যাই হোক নন্দকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ-এর প্রচেষ্টায় রাণীদ্বয় সমান ভাবে জমিদারী গ্রহণ করে শাসন করেন। রাণী সন্তোষ-প্রিয়া তমলুক পদুমবসান গড়ে অবস্থান করে বসবাস করেন। অর্থাৎ দিদার আলীর মৃত্যুর পর রাজপ্রাসাদ পুনরায় সংস্কার ও মার্জনা করে তাতেই ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজ্য শাসন করতে পারেননি। তাঁর রাজত্বকাল মাত্র তিন বৎসর। এই তিন বৎসর রাজত্বকালে তিনি প্রজাসাধারণের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। রাণী সন্তোষপ্রিয়া দেশসেবায় বেশ কিছু জমিদান করেছিলেন। বিভিন্ন গুণের আধার এই রাণী কিন্তু অপুত্রক ছিলেন। তাই তিনি আনন্দনারায়ণ রায়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই বাংলাদেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। তখন হোল বাংলা ১১৭৬ সাল। রাণীর হৃদয় এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষে একেবারে ভেংগে পড়েছিল। তাঁর রাজত্ব অত্যন্ত অশান্তিময় হয়ে উঠেছিল। দেশের এই ভীষণ দুর্দিনে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

রাণী সন্তোষপ্রিয়া পরলোক গমন করলে আবার গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দনারায়ণ রায়ের নামে নালিশ করে তার অর্দ্ধাংশ জমিদারীর এক আনা নিয়ে নেন। ফলে কৃষ্ণপ্রিয়া ৷৷/০ আনা জমিদারীর মালিক হন। কিন্তু গৃহবিবাদ তবু শান্ত হোল না। আনন্দনারায়ণ তমলুকে তুর্গোৎসব আদি শক্তি পূজা করতে পারতেন না। কারণ, এখানে বর্গভীমা দেবী বিরাজ করছেন। তাই তুর্গোৎসব ছিল নিষিদ্ধ। প্রতি বছর আনন্দনারায়ণ বাঁহিচবেড়ে গড়ে গিয়ে করতেন এইসব উৎসব। কিন্তু '৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁকে আর গড়ে প্রবেশ করতে দিলেন না। ফলে আনন্দনারায়ণ রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। নালিশের ফলে আনন্দনারায়ণ বাঁহিচবেড়ে গড়ে পূজাদি করার জন্য গেলে কৃষ্ণপ্রিয়ার ভৃত্যগণ সরকারের পাইকগণকে তরবারির আঘাতে হতাহত করে তাড়িয়ে দেয়। এই খণ্ডযুদ্ধই হোল কৃষ্ণপ্রিয়ার পক্ষে কাল। সকৌন্সিল গবর্ণর কৃষ্ণপ্রিয়ার ৷৷/০ আনা জমিদারী বেদখল করে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খাস রাখেন। তারপর নানা অশান্তির মধ্যে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া পরলোক গমন করে।

রাজা আনন্দনারায়ণ রায়

(১৭৭১—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)

রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যুর পর নানা বিপর্যয়ের মধ্যে আরম্ভ হয় রাজা আনন্দনারায়ণের রাজত্ব। দেশের জনসাধারণের অবস্থা তখনো অত্যন্ত শোচনীয়। তুর্ভিক্ষের নিদারুণ আক্রমনে শত শত নরনারী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে নানা গোলযোগ। এই সময়ের দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

নানা আলাপ-আলোচনা ও আবেদন-নিবেদনের পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বার্ষিক ১০,০৫,৫১৭৶৩ পাই (দশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ শত সতর টাকা তিন আনা তিন পাই) সদর জমা ধার্য করে তমলুক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রাজা আনন্দনারায়ণ রায় ইংরেজ সরকারের কাছে কবুলিয়ত লিখে দেন। (Certified copy of kabuliat executed by Raja Ananda Narayan Roy of Tamluk.)

ওয়ারেন হেষ্টিংস॥ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার গবর্ণর হয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস এলেন বিলাত থেকে। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন। আর বিচার কার্যের সুবিধার জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয় সমূহও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বে তমলুক জমিদারী মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরীর অধীন ছিল না। মুসলমান শাসনকালে হুগলীর দেওয়ানীর অধীনে ছিল। কিন্তু কোম্পানীর শাসনের আওতায় আসায় তমলুকে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হয়ে এলেন। তিনি কেবল রাজস্ব আদায় করতেন। বিচার ক্ষমতা থাকল তমলুক রাজের হাতে। পরে রাজা আনন্দ-নারায়ণ রায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তমলুক জমিদারী মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১]

এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন বিধি ব্যবস্থা রহিত হয়ে নতুন নতুন আইন প্রণীত হয়। সমাজে ও শাসনে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। এইসব নানা

১ Hunter's Bengal Ms. Records :—"5940. Letter from collector of Midnapur reporting that he has received charge of collections of mahals under the Salt Agent at Tamluk. July 8 (1796) No. 10"—Page 227.

বিপ্লবের মধ্যে দিয়াও রাজা আনন্দনারায়ণ নিজ পিতৃপুরুষগণের নানা প্রাচীন কীর্তিসমূহ রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বহুদিন অযত্নের ফলে প্রাচীন দেব মন্দিরাদি ধ্বংস হতে চলেছিল। তিনি এইসব দেবমন্দিরের সংস্কার করে দেবসেবার সুবন্দোবস্তের জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। তমলুক থেকে দশ মাইল পশ্চিমে বরগোদা গ্রামের গ্রাম্য ঐতিহাসিক দেবী বর্গেশ্বরীর সেবাদি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কয়েক বিঘা জমি স্বজাতীয় ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই বর্গেশ্বরী দেবী আজিও বর্তমান আছেন। রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বিক্রী করে আত্মসেবা করছেন। ফলে দেবীর পূজা আর পূর্বের মত হচ্ছে না। বর্তমান লেখক এই বর্গেশ্বরীর ঢিপি থেকে কয়েকটি প্রাচীন কালের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। তা' পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে আমরা আর একজন পুণ্যশীলা রাণীর সন্ধান পাই। তিনি হলেন মহিষাদল রাজ্যের রাণী জানকী দেবী। এই মহিষাদল রাজ্য সম্পর্কে পরিশিষ্ট ভাগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জানকী দেবী ছিলেন রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের পত্নী। তাঁর মৃত্যুর পর রাণীই মহিষাদল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করেন। এই দয়াবতী পুণ্যশীলা রাণীর বহু কীর্তি আজিও বর্তমান আছে। রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের সাথে রাণীর বিশেষ সৌহার্দ ছিল। রাণী তমলুক রাজকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রাজকার্য পরিচালন ব্যাপারে দু'জনে পরামর্শ করে সব সময় কাজ করতেন।

মাহিষ্য সৈন্যদল॥ তমলুক ও মহিষাদল এই দু'টি রাজ্য একত্রিত হয়ে এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলে শুধু যে মাহিষ্যগণ ছিলেন তা নয়, অন্যান্য জাতির বহু যুবকও যোগ দিয়ে ছিলেন। তবে মাহিষ্যের সংখ্যাই ছিল সমধিক। এই সৈন্য দলকে পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষরূপে সুশিক্ষিত করা হয়েছিল।

অতি অল্পদিনের মধ্যে মেদিনীপুরের প্রাচীন যুদ্ধ বিশারদ এই জাতি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা দেখিয়ে ছিল।

দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান ও হায়দর আলির সাথে ইংরেজের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে এই মাহিষ্যদল বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেয়। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সার জন শোর তমলুক রাজকে এইজন্য তাঁর অন্তরের ধন্যবাদ দিয়ে বিশেষ সম্মানিত করেন। রাণী জানকী দেবীও তাঁর ক্ষুদ্র রাজত্ব থেকে কোম্পানী বাহাদুরকে মাদ্রাজ প্রদেশে "ভেলোর মিউটিনী" দমনার্থ বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কর্ণেল পাওয়েল সাহেবের সিপাহী সৈন্যের সাথে মিলে সেনানী কুটের নায়কত্বে মাদ্রাজে এই সৈন্যদল অদম্য সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের দপ্তরে এই কাহিনীর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

লবণ উৎপাদন ॥ তমলুকের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে চড়া পড়ে নতুন ভূভাগের সৃষ্টি হয়। ফলে এতদঞ্চলের ভূমিতে মুসলমান শাসনকালে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন হোত। তারপর ইংরেজ রাজত্বকালে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ আর্কডেকিন সাহেবের চেষ্টায় কোম্পানী বাহাদুর লবণোৎপাদনের কাজ আরম্ভ করেন। লবণ বিভাগের প্রধান কার্যালয় এইখানেই স্থাপিত হয়েছিল। এইজন্য এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীগণ ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ থাকতেন এখানেই। প্রতি বৎসর বিশ লক্ষাধিক মণ লবণ উৎপাদন হোত। এতদ্দেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবিগণ এই লবণ

১ Military Despatch of Sir Eyere Coote to the court of Directors and the Report of the Governor General of the Home Department, British Blue book of 1806-7 from the Records of the Financial Department Library of the Government of Bengal and the Imperial Government.

উৎপাদন করে বিশেষ লাভবান হতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

যে সব জমিতে লবণ উৎপন্ন হোত, তা' 'নিমকমহাল' বা 'জলপাই' নামে অভিহিত ছিল বা আজো আছে। যখন তমলুক রাজের কাছ থেকে ঐ সমস্ত ভূমি কোম্পানী বাহাদুর নিয়েছিলেন, তখন সরকার তমলুক রাজকে বিশেষ মাসোহারা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এই মাসোহারা তমলুক রাজ বরাবর পাননি। পরবর্তী কালে লবণ ব্যবসা বন্ধ হলে "বোর্ড অব্ রেভিনিউ" থেকে যখন সেই জলপাই ভূমির নতুন জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার আদেশ হয়, তখন তমলুক রাজের বংশধরকে তা' প্রত্যর্পণ করাও হয়নি। রাজা আনন্দনারায়ণ রায় এই লবণ ব্যবসায়ে বহু টাকা আয় করতেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর অনুরোধে কেবল নির্দিষ্ট মাসোহারা ১৪৬৯১৸/০ টাকা পাইবেন এই আশ্বাস পেয়ে উক্ত জলপাই মহাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হবে।

রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের দুই স্ত্রী। কিন্তু উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন। তাই বড় রাণী হরিপ্রিয়া দেবী শ্রীনারায়ণকে ও ছোট রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী লক্ষ্মীনারায়ণ রায়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উভয়েই রাজ্যশাসন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ রায় সমগ্র রাজ্যের রাজা হন।

নিমক মহাল বা জলপাই অঞ্চল আজ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এইসব শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে বহু সুউচ্চ টিপি আজো পরিলক্ষিত হয়। এইসব টিপি খুঁড়লে বড় বড় ছাই গাদা ও লবণ উৎপাদনের বিশেষ প্রক্রিয়ার তৈরী মৃৎপাত্র আজো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্তমানে এইসব টিপি বা পোতাকে নিশ্চিহ্ন করে শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ও শেষ বংশধরগণ

(১৮২১—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী হরিপ্রিয়া দেবীর পোষ্যপুত্র নারায়ণ রায়ের মৃত্যু হলে রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া রায়ের পোষ্যপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। লক্ষ্মীনারায়ণের মত এমন অত্যাচারী ও ব্যসনাসক্ত রাজা তমলুকের সিংহাসনে আর কখনো কেউ বসেননি। তাঁর অনিয়মিত ব্যয়বাহুল্যে ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে রাজবংশ শ্রীহীন ও ধ্বংসের পথে অনুগমন করে। বিমাতা রাণী হরিপ্রিয়া দেবীর প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের অত্যাচারে রাণী হরিপ্রিয়া অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে তমলুক রাজবাটী পরিত্যাগ করে তিনি বাঁহিচবেড়ে গড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে দ্বিতীয়বার রুদ্রনারায়ণ রায়কে পোষ্য গ্রহণ করেন। ফলে লক্ষ্মীনারায়ণের সাথে রাণী হরিপ্রিয়ার গৃহবিবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। এই নিয়ে বহুদিন উভয়ের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলে। এইসব বিবাদের মধ্যেও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় সমগ্র জমিদারী পরিচালন করেন। তারপর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রুদ্রনারায়ণ সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি মতে অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন।

তমলুক রাজবংশের এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত শোচনীয়। গৃহবিবাদই শেষ পর্যন্ত এই বংশকে ধ্বংস করে। প্রজার প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে জমিদারী ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হতে থাকে। ১৮৪৬—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সুবৃহৎ জমিদারী টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত হয়। তৎপরে এইসব জমিদারী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অর্ধেক ও মহিষাদল রাজা অর্ধেক অধিকার করে নেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়। ইহার দুই পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ ও নরেন্দ্রনারায়ণ। উপেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ঐ বৎসর রাজা নরেন্দ্রনারায়ণও দু'টি পুত্র রেখে মারা যান। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের দু'টি স্ত্রী। ইহাদের গর্ভে হরেন্দ্রনারায়ণ, ষড়েন্দ্রনারায়ণ, বীরেন্দ্রনারায়ণ, ধীরেন্দ্রনারায়ণ, জীতেন্দ্রনারায়ণ, মনীন্দ্রনারায়ণ ও ফণীন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারী হস্তচ্যুত হওয়ার পর এই রাজবংশ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক্ষণে এই বংশে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক প্রবেশ করেছে। তাই বর্তমান রাজবংশধরগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-শিক্ষা লাভ করেছেন। কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ সুপ্রসিদ্ধ বিলাত ফেরৎ ডাক্তার। বিলাত থেকে ইনি কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পাশ করে এসে বাড়ীতেই চিকিৎসা ব্যবসা করছেন। ষড়েন্দ্রনারায়ণ তমলুকের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অল্প বয়সে বাস দুর্ঘটনায় এই অশেষ গুণসম্পন্ন রাজকুমার অকালে দেহত্যাগ করেন। অন্যান্য ভাইদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনীয়ার ও আর সকলে নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। এঁদের মধ্যে রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মানুষ। এঁরি প্রচেষ্টায় ও সর্বপ্রকার সাহায্যে তমলুকে একবার বঙ্গীয় কবি পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও আর একবার মেদিনীপুর কবি সম্মেলন বিপুল আড়ম্বর সহকারে সম্পাদিত হয়েছে। এই কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগের রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রবীণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখক ও এইসব সম্মেলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এ বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ এছাড়া বহু সমাজ হিতকর কাজের সাথেও

জড়িত আছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেম ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান মরণোন্মুখ জাতির তীর্থক্ষেত্র দাশনগরের প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর আলামোহন দাশের নব প্রবর্তিত "বাঙালী সমাজে"র একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সহঃ সভাপতি। এছাড়া তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দরিদ্র ছাত্রগণকে দানও করেছেন। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় ও নিরহংকার ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতিথিপরায়ণ এই রাজবংশধরের কাছ থেকে সমাজ আজ অনেক কিছুই পাওয়ার আশা রাখে।

তমলুক রাজবংশের কথা আমরা এখানেই শেষ করলাম। এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস আজো আবিষ্কৃত হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, আজিও অনুসন্ধান করলে মেদিনীপুরের সুদূর গাঁয়ের মধ্যে বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র পাওয়া যেতে পারে, যাতে এই রাজবংশের অনেক কীর্তি কথার উল্লেখ আছে। আমি অনেক অনুসন্ধান করে সামান্য দু'চারখানি প্রাচীন পুঁথি মাত্র সংগ্রহ করেছি। এইসব পুঁথি থেকে চার-পাঁচশ' বছর আগেকার তমলুকের আচার ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বীরুলিয়ার 'জানা' বংশের ইতিহাসে এতদঅঞ্চলের অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য জানতে পারা গিয়েছে। দ্বিজ জগন্নাথের 'আস্কটির পালা' ও কবি কুঞ্জবিহারী দাশের 'ফাসর‍্যার পালা'য় সেকালের অনেক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ চিত্র পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন কালের তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে কিছু জানতে হলে যেমন ভূগর্ভ খনন করা প্রয়োজন, তেমনি তমলুক রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে তমলুক অঞ্চলের লোক গাঁথা ছাড়া, প্রাচীন প্রবাদ ও পুঁথি-পত্র সংগ্রহ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। তা' না হলে এই বংশের সঠিক ইতিহাস আবিষ্কার করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

নবম অধ্যায়

ইংরেজ শাসনে তাম্রলিপ্ত

বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে। বাংলার নবাব তখন আজিম খাঁ। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৩২—১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজগণ বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি পান এবং পিপ্‌লি বন্দরে (বালেশ্বর) তাঁদের প্রথম কুঠি স্থাপন করেন। সে ইতিহাস আশ্চর্যজনক না হলেও বড় বিচিত্র। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু পাছে সুজার শক্তিবৃদ্ধি পায়, এই আশংকায় সাজাহান শায়েস্তা খাঁকে (নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ঠিক এই সময়ে সাজাহানের এক কন্যার সর্বাঙ্গ আগুনে পুড়ে যায়। গোব্রিয়েল বাউটন নামক একজন ইংরেজ ডাক্তার চিকিৎসা করে তাকে ভাল করেন। সাজাহান কন্যার আরোগ্যের পুরস্কার স্বরূপ বাউটনের প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করতে অনুমতি দেন। সেই অনুমতি পত্র নিয়ে বাউটন রাজমহলে এসে সুজার সাথে দেখা করেন। ঘটনাচক্রে ও ইংরেজদের ভাগ্যগুণে রাজমহলের রাজান্তঃপুরেও এক মহিলা গুরুতররূপে পীড়িতা ছিলেন। বাউটন তাকেও আরোগ্য করেন। ফলে সুজাও ইংরেজ জাতির উপরে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এবং অত্যন্ত সদয় হয়ে বাংলাদেশে ঢালাও ভাবে বাণিজ্য করার অবাধ অনুমতি দেন। সুজার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিজমান ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন।

এই বাণিজ্যের মানদণ্ডই ক্রমে ক্রমে কিরূপে রাজদণ্ডরূপে দেখা

দিয়েছিল, তা' ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। বাংলার মসনদে তুমুল আলোড়ন আর বঙ্গে বর্গীর অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে ইংরেজগণ ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয় ত করেছিলই অধিকন্তু আত্মরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে দুর্গ স্থাপনও করেছিল।

মেদিনীপুরে ইংরেজদের প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালে উড়িষ্যা যেতে হলে তমলুক দিয়েই যেতে হোত। প্রথমে কোম্পানী যখন সাঁওতাল যুদ্ধ ও উড়িষ্যা জয়ের জন্য অভিযান চালান, তখন কোম্পানীর সৈন্যসামন্ত জাহাজ ভর্তি হয়ে হাজির হোত তমলুকে। লালদীঘির বিস্তৃত পাড়ে ছাউনি ফেলিয়ে বিশ্রাম করত ২।১ দিন। তারপর স্থলপথে মেদিনীপুর হয়ে গমন করত উড়িষ্যার দিকে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এমনি একদল সৈন্য এসে হাজির হোল তমলুকে। এই প্রথম ভলন্টিয়ার সৈন্যদলের লেপ্টেনাণ্ট ছিলেন আলেক্‌জাণ্ডার ওহারা। তমলুকে তিনি সৈন্যদল সহ বিশ্রাম করছিলেন দু'একদিন। সহসা সামান্য রোগক্রান্ত হয়ে ৬ই অক্টোবর তিনি তমলুকেই দেহত্যাগ করেন। এই লেপ্টেনাণ্ট সাহেবকে খাটপুকুরের পূর্বপাড়ে কবর দেওয়া হয়। এই কবরখানা এখনো বিদ্যমান আছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তমলুক অঞ্চল এককালে নিমক মহল ছিল। এবং এখানে প্রচুর লবণ উৎপাদন হোত। মুসলমান আমল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল এই লবণ-উৎপাদন। মুসলমানের হাত থেকে রাজ্য যখন এল ইংরেজদের হাতে তখন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ আর্কডেকিনের তত্ত্বাবধানে লবণ প্রস্তুতের কাজ আবার নবোদ্যমে আরম্ভ হয়। এই সল্ট এজেন্টের নিমক মহল ভিন্ন অন্য কোন কার্যে কোন কর্তৃত্ব ছিল না।[১] সেই সময়ে এখানে লবণ উৎপাদনের প্রধান অফিস স্থাপিত হয়েছিল। এই অফিসের কাজ ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় বহু উচ্চপদস্থ বৃটীশ কর্মচারী ও দেশীয় শিক্ষিত

১ J. C. Price's History of Midnapur, Vol. I, P. 33.

কর্মচারীগণ এখানে আসেন। কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের মৃত লালমোহন, রাধানাথ, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এখানে এসে লবণ ব্যবসায়ের সেরেস্তাদারী কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তখন লবণ ছিল এদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তমলুক অঞ্চলে তখন প্রতি বৎসর গড়ে বিশলক্ষ মণের অধিক লবণ প্রস্তুত হোত। এই লবণ উৎপাদন করে তৎকালে তমলুকবাসী প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। কৃষক শ্রমিকগণ এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তমলুক রাজগণ যে এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কমল-নারায়ণ রায় যখন তমলুকের রাজা তখন থেকেই ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ব্যবসা বিশেষরূপে সংরক্ষণের জন্য হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক অঞ্চলের জমিদার ও রাজাগণের নিকট থেকে সমস্ত লবণোৎপাদক ভূমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক এজেন্সীর সল্ট এজেণ্ট হেন্‌রী, সি, হামিল্টন সাহেব ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর এই লবণোৎপাদন সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তা' পাঠ করলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

তমলুক, মহিষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গনগর ও শুমগড় এই কয়টি পরগণায় সল্ট এজেণ্টের অধীনে ৬ জন দারগা, ৪ জন মুহুরী এবং ৩২ জন চাপরাশী ও ৭৪ জন চৌকিদার নিযুক্ত ছিল, যাতে লবণ উৎপাদন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় ও কোনরূপ নষ্ট না হয়, সেদিকে সরকারের সতর্ক নজর ছিল। (Revenue Board circular no. 877 dated 20th September 1851)।

তমলুক রাজগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে লবণ উৎপাদন করতেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থানুযায়ী কোম্পানী লবণ ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ ও জলপাই ভূমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তমলুকের তদানীন্তন রাজা আনন্দনারায়ণকে বংশধর পরম্পরায় ১৪৯৬৲৷৴৹ আনা মাসহারা

দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন।[১] এই মাসোহারা Perpetual Allowance অর্থাৎ রাজগণ বংশানুক্রমে চিরকাল পাবেন এইরূপ কথা ছিল। ১৮৬৩ সালের ১০ই আগস্ট তারিখের ১৬৮নং পত্রে মিঃ স্মিথ বর্ধমানের কমিশনার বাহাদুরকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার কিয়দংশ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করছি। এই পত্র থেকে জলপাই ভূমি সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

"I shall now proceed to the expression of my own opinion, and will take up the permanent settled parganas. The paragana of Tamlook forms one Zamindari and the other paraganas mentioned above are in the Zamindari of Mahishadal. To arrive at a satisfactory conclusion on the subject, it is necessary to look back to the time of Decennial settlement and ascertain what were the conditions of settlement and state of Zamindaris.

7. The sum (to be paid to the Raja of Tamlook) converted into new standard rupee is Rs. 15761 and still continues to be paid.

১ "From the early records it appears that when the privilege of manufacturing salt was taken out of the hands of the zamindars of the District and monoopolized by Government, the Government received from zamindars of paraganas Mysadal and Tamlook large tracts of Jungle and waste lands for their manufacturing purposes allowing them in lieu remissions in the rent of their permanent settlement and also a monthly allowance usually termed "Mooshyera", the former as a consideration for the land actually appropriated by Government and the latter as compensation for the withdrawal of the manufacture of salt from within their respective zamindaries"—Notes on the Manufacture of salt in the Tamlook Agency by H. C. Hamilton,—Page 3,

8. I have gone into the subject at length, because a clear understanding of what the salt Mushahara is, is absolutely necessary to enable us to determine how far Government is entitled to withdraw it from landholders, when it relinquishes the salt trace and what claim Government has to the land if it withdraws the Mushahara. The salt Mushahara must, as it is evident from the above extracts, be regarded not only as compensation for the loss of salt trade but also as compensation for the loss of lands in the estates of Zamindars upon which the salt trade was carried on. The land yielded is other revenue than salt and in paying the Zamindar the salt Mushahara, Government only gave his share of such revenues as the land yielded, and that Government required that land for the salt trade, the Zamindars would either have received settlement or Malikana (Mushahara). It will not be urged that the grant of the Mushahara was in lieu of the right of making salt in those portions of the parganas which were put in their possession, for that would have been impossible. On the other hand, it will not be believed that any portion of the suddar Jama of the estate assessed on the salt lands of which the Government retained possession, the Zamindars woud never have consented to such a course.

*   *   *   *

10. The Mushahara may therefore, I think, be fairly regarded as the Malikana paid on the land held khash, but of a special nature, in-as-much as the lands were so kept, not because the Zamindars did not want them, but because Government did, It'is

also a Malikana on a part of an estate held khash attached to a part personally settled with provison in the engagement for the latter that it shall be paid. Copies of the Kabuliats are enclosed for your information and that if we settle (the salt lands) with any one else, we must continue to pay the Mushahara."

মিঃ স্মিথের পত্রানুযায়ী তমলুক রাজগণ এই মাসহারা প্রকৃতপক্ষে চিরকাল পাওয়ার অধিকারী। বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীগণ এই মত সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তমলুকের রাজা বাহাদুরগণ এই প্রতিশ্রুত মাসোহারা পাননি।

১৮৬৩ সালের ২২৯নং পত্রে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী আর, ডি, মন্‌গলস্‌ সাহেব, রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান সেক্রেটারী জি, আর, কলভিন্‌ সাহেবকে লিখেন,—এই মাসোহারার টাকা আপাততঃ দেওয়া বন্ধ করে উহা ১২৪১ ও ১২৪২ সালের রাজগণের দেয় রাজস্বের বকেয়া বাকী আদায় জন্য কেটে নেওয়া হোক। কার্যক্ষেত্রেও তা' হয়েছিল।

'মাল' জমি ও 'লবণকর' জমি কালেক্টর বাহাদুরের সেরেস্তায় পৃথক পৃথক তৌজিভুক্ত হয়েছিল। উক্ত মাল জমির আট আনা অংশ ১৮৪২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় অমিতব্যয়িতার বশবর্তী হয়ে মহাজনগণের নিকট বন্ধক দিলে অবশেষে ঐ টাকা পরিশোধ না হওয়ায়, সুদে ও আসলে অধিক বৃদ্ধি পায়। তখন মহাজন নালিশ করে আদালতে ডিক্রি করে। ফলে আবদ্ধিয় সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে ১৮৪৬ সালে নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নামে বেনামী খরিদ করেন। এরপর থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খরিদদারগণ মাসোহারা গ্রহণ করতে থাকলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সময় সাংসারিক বিপদে বিব্রত ও মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। ফলে তিনি এই বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করতেও

সমর্থ হননি। ক্রেতাগণ এই টাকা কোন আইনসঙ্গত নিয়মে কালেকটারী থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। যেহেতু মাসোহারার জমি ও তমলুকের মাল জমি পৃথক পৃথক তৌজিভুক্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই মাসহারার টাকা মাল জমি ক্রেতাগণকে দেওয়ায় ভুল করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই টাকা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তিনি সে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কোম্পানী তমলুক-হিজলী অঞ্চলের লবণ উৎপাদন বন্ধ করেন। ঐ সালের ১৬ই মে তারিখের ১৩৫নং পত্রে কলকাতা বোর্ড অফিসের বড় সাহেব তমলুক ও হিজলীর সল্ট্ এজেণ্টদিগকে অবগত করান যে, জলপাই জমি যেন তাঁরা জেলার কালেক্টর সাহেবের দখল দেন। এরপর উহা কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট তারিখের ১৬৮ নং পত্রে বর্ধমান জেলা কমিশনার বাহাত্বর, রেভিনিউ বোর্ডের বড় সাহেবকে লিখেন যে, ঐ লবণ সম্বন্ধীয় মাসোহারা কোন ক্রমেই খাশ করে নেওয়া যাবে না। এবং খালারীর (জলপাই) জমি রাজাদের অবগতি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির সংগে পুনরায় বন্দোবস্ত করাও যাবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি ঐ জমি অপর কারো সাথে বন্দোবস্ত করেন, তা'হলে মাসোহারার টাকা রাজগণকে চিরকাল দিতে হবে। মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টর বাহাত্বর মিঃ স্মিথ সাহেব তাঁর ১৮৬৩ সালের ১০ই আগস্ট তারিখে বর্ধমান জেলার কমিশনার সাহেবকে যে পত্র লিখেন, তাতেও উক্ত মন্তব্যের উপর সবিশেষ জোর দেন।

এই মাসোহারা ১৮০৪ সাল থেকে একাদিক্রমে অন্যূন ৭০ বছর রাজকুমারগণ নিয়মিতভাবে পেয়েছিলেন। পাট্টার সর্তানুযায়ী এই মাসোহারা গবর্ণমেণ্ট চিরকাল দিতে বাধ্য। কিন্তু সরকার তাঁর রাজত্বের শেষ পর্যন্ত তমলুক রাজবংশধরগণকে দেননি। এই মাসহারা না পাওয়ার প্রতিবাদে ১৮৮১ সালে একটি মোকদ্দমা—

ভারত-সচিব বনাম রাণী আনন্দময়ী দেবী—কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বিলাত পর্যন্ত গিয়ে আপীল নিষ্পত্তি হয়। (Vide I. L. R. 8c. 95.) এই নজির বলে কোম্পানী লবণ জমি ইচ্ছেমত বন্দোবস্ত করতে পারেন, কিন্তু রাজগণের প্রাপ্য মাসোহারা টাকা আইনসঙ্গত রূপে বন্ধ করার তাঁদের কোন অধিকার ছিল না। যাঁরা নিলাম খরিদ করেছিলেন, তাঁরা রাজাদের বংশগত সম্পত্তি নিলাম ধরে ছিলেন কিন্তু লবণ-সংক্রান্ত মাসোহারা কখনো খরিদ করেন নি। যখন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ সল্ট এজেন্ট মিঃ করলিকের সময় এখানের লবণ অফিস বন্ধ হয়ে যায়, তখন তমলুক রাজগণকে সর্তানুযায়ী জলপাই জমি পুনঃ বন্দোবস্ত লওয়ার কোন আদেশ জারি হয়নি। যদিও বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন আদেশ এসেছিল, সে সংবাদ রাজা বাহাদুরকে জানান হয়নি। বৃটিশ সরকার কারসাজি করে এই সমস্ত নিমক মহাল থেকে রাজাদের চিরতরে বঞ্চিত করেন।

ইংরেজ সরকারের প্রথম থেকে তমলুকে পুলিশ, পোষ্টাফিস, মুন্সেফী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস স্থাপিত হয়েছিল। মুন্সেফী আদালত পূর্বে মছলন্দপুরে ছিল, সেখান থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকের নিকাশী গ্রামে উঠে আসে। নিকাশী তমলুক থেকে ছ'মাইল পশ্চিমে ময়না যাওয়ার পথের উপরে পড়ে। এক্ষণে এইস্থানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। নিকাশীতে সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবার হাট বসে। এই নিকাশী থেকে বরগোদা গ্রামে দেবী বর্গেশ্বরীর মন্দির মাত্র দু'মাইল পথ। পূর্বে এইস্থানে বিচারালয় ছিল। যাজিও এইস্থান "কোর্টগোড়া" নামে সুপরিচিত। বর্গেশ্বরী দেবী সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নিকাশী গ্রাম থেকে মুন্সেফী আদালত তমলুকে উঠে আসে। নিকাশীর শেষ মুন্সেফ মুন্সী ওয়ারিশ আলিই তমলুকের প্রথম মুন্সেফ হন। তিনি প্রায় তিন বছর মুন্সেফ ছিলেন তারপর অবসর গ্রহণ করেন। পাঁশকুড়া থানার প্রতাপপুরেও মুন্সেফ আদালত

ছিল। এই আদালতের মুন্সেফ ছিলেন মিঃ বেল সাহেব। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপপুরের মুন্সেফী আদালত বন্ধ করে তমলুকে ওঠে আসেন। এরপর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সর্বপ্রথম ম্যাজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হয়। মিঃ এ্যালেন সাহেব সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ হন। তারপর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সাব্ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন বেঞ্চ (Independent Bench) ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রুরাল সব্ রেজিষ্ট্রারের অফিস সর্বপ্রথম নির্মিত হয়।

অনেক আগে থেকেই এখানে একটি সুবৃহৎ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হোত। এই সুবৃহৎ সংস্কৃত গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়। ইনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আজ প্রায় ৭০ বৎসর হোল এই সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রটি বিলুপ্ত হয়েছে। এখানে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় তমলুকে সংস্কৃত পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

যাই হোক, ইংরেজ আমলের কথায় আবার আমরা ফিরে আসি। সল্ট এজেণ্ট রবার্ট, চার্লস, হ্যামিণ্টন সাহেবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি শুধু সল্ট এজেণ্ট ছিলেন না, এদেশের বিবিধ জনহিতকর কাজও করেছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ই বর্তমানের হ্যামিণ্টন সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক ঝটিকা ও জলপ্লাবনে মেদিনীপুর অঞ্চল বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ঘরবাড়ী ও শস্যক্ষেত্র ভূমিসাৎ হয়। এই দুর্দান্ত ঝটিকা প্রবাহে হ্যামিণ্টন স্থাপিত বিদ্যালয়টি বিনষ্ট হয়। তখন সহৃদয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যাদবচন্দ্র ঘোষ (সিনিয়র স্কলার) মহাশয়ের অসীম যত্ন ও প্রচেষ্টায় মাটির বাড়ীর পরিবর্তে ইষ্টক নির্মিত বাড়ী প্রস্তুত হয়। এই সময় কর্মোপলক্ষে স্বর্গীয় পঞ্চানন

বসু মহাশয় এখানে বাস করতেন। বসু মহাশয়ের পুত্র সার্জন মেজর ধর্মদাস বসু এম-ডি.। এই বিদ্যালয়েই ধর্মদাস বসুর প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। পরবর্তী কালে ধর্মদাস বসু মহাশয় স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে "পঞ্চানন স্কলারসিপ্" নামে মাসিক ৮৲ টাকার একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। এই বৃত্তি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যিনি সরকার কর্তৃক সাহায্য পাননা একমাত্র তাঁকেই দেওয়া হয়। উক্ত বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর অনেক ছাত্র হওয়ায় আর একটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে "তমলুক মঙ্গল" রচয়িতা গিরিশচন্দ্র সরস্বতী মহাশয় লিখেছেন—"হাইস্কুলের নিম্নক্লাশে অনেক ছাত্র হইতে থাকায় ও কেবল বাঙ্গলা শিক্ষা করাইতে জনসাধারণের অভিপ্রায় নাই দেখিয়া তাৎকালিক বঙ্গ বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত মহাশয় প্রাগুক্ত বাঙ্গলা বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরাজী স্কুল করলে সাধারণের সুবিধা হইবেক বিবেচনা করেন, কিন্তু প্রথমে হেডমাষ্টারের বেতন কিরূপে সংগ্রহ হইবেক ভাবিয়া স্কুল মেম্বার এই পুস্তক লেখকের সহায়তায় তাঁহার আবাল্যপালিত ভাগিনেয় আণ্ডার গ্রাজুয়েট সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে কলিকাতা কলেজ হইতে অধ্যয়ন ছাড়াইয়া আনিয়া একপ্রকার অবৈতনিক হেডমাষ্টার করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ, তাহা মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করেন। এক্ষণে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় মাষ্টার পণ্ডিতের রীতিমত বেতনের অভাব হইতেছে না।" পৃঃ ৩১—৩২। ১৮৪৫ শকাব্দে মুদ্রিত।

তমলুকে এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মিশনারীগণ আর একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

হ্যামিলটন সাহেব বিদ্যালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি।

দেশবাসী জনসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দাতব্য-চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। এই হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় বর্তমান যেখানে পোষ্টঅফিস আছে তথায় স্থাপিত হয়েছিল। তৎপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টক নির্মিত বাড়ী প্রস্তুত হয়ে ডিস্পেন্সারী উঠে যায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান শহীদ স্তম্ভের অপর পাশে যেখানে হাসপাতাল সেখানে উঠে আসে। তৎকালের হাসপাতাল সম্পর্কে "তমোলুক ইতিহাস" লেখক ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় যে বিবরণ দিয়েছেন নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি।

"তৎকালে ডাক্তার ভোলানাথ বসু এম-ডি, প্রভৃতি সিভিল সার্জন ও ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত প্রভৃতি আসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। এজেন্সী অফিস (১৮৬২ খ্রীঃ) উঠিয়া গেলে এক একজন সিভিল-হস্‌পিটাল আসিষ্টাণ্ট দ্বারা উক্ত কার্য্য নির্বাহ হইত। কিন্তু তাহাতে শব-পরীক্ষার অসুবিধা হওয়ায় পুনর্বার দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে) এক একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্বাহ করিতেছেন। উক্ত হাসপাতালের পাকাবাটী নির্মাণ জন্য মহিষা-দলাধিপতির সুযোগ্য দেওয়ান দানশীল মৃত নীলমণি মণ্ডল[১] এককালীন ২৬০০ টাকা প্রদান করায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ,

১ নীলমণি মণ্ডল মহাশয়ের নাম তৎকালে বঙ্গদেশে বিশেষ সুপরিচিত ছিল। এই বিখ্যাত মণ্ডল বংশেই মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত ভীমচন্দ্র মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেছেন। ভীমবাবু গত ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট টেকনলজি" হিজলী বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৫৬।২১শে এপ্রিল তারিখে উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন সভায় সমাগত ভারতবর্ষের স্বর্গীয় প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার

বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বর্ণ পদক ও নিদর্শন পত্র সহ ২১৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পান।

এখন মহাত্মা নীলমণি মণ্ডল মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে "মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা" থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জন্য উদ্ধৃত করছি।

বাংলা ১২৩৬ সালে (ইং ১৮২৯ খ্রীঃ) ২৯শে চৈত্র তারিখে পরম ধার্মিক নীলমণি মণ্ডল মহোদয় দেউলপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতাপিতার ২য় সন্তান ও পাঠশালায় স্বল্প শিক্ষিত। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর মহিষাদলরাজ প্রজারঞ্জক স্বর্গত রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ মহোদয়ের অধীনে মাসিক ২৲ দুই টাকা বেতনে নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন।

পরে স্বীয় অপূর্ব প্রতিভাবলে এবং ভাগ্যলক্ষীর সুপ্রসন্নতায় উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতির ফলে উক্ত রাজ এষ্টেটের সর্বোচ্চ ম্যানেজার পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে উক্ত পদের মাসিক বেতন ২০০৲ টাকা ছিল। কিয়ৎকাল পরে উক্ত বেতন মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকা হয়। ঐ এষ্টেটে প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ কাল অবিচ্ছেদে বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করায় তদানীন্তন রাজা বাহাদুর ইঁহাকে হরিখালি নামক স্থানের খেয়াঘাট নিষ্কর দান করেন ও প্রচুর ভূমি দান করেন।

তদীয় জন্মভূমিস্থ দেউলপোতা মধ্য ইং বিদ্যালয়, তমলুক নগরীস্থ ডায়মণ্ড জুবিলী হস্‌পিটাল এবং দেউলপোতা, হরিখালি প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ পুষ্করণী ইত্যাদি তদীয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

সদাশয় নীলমণিবাবু শুধু যে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও ইহার উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকার ব্রতী ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্রকে অর্থ সাহায্য ও মাসিক বৃত্তিদান ও কৃষ্ণনগর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্য করিতেন।

ইঁহার দানের ইয়ত্তা নাই। কয়েকটি বৃহৎ দানের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। যথা—১। হরিখালিতে সাধারণের জন্য পুষ্করণী প্রতিষ্ঠা ৫০০০৲ টাকা। ২। দেউলপোতা বাটীতে তুলা মেরুদান ও হরিখালিতে দুবার অন্নসত্র ও বস্ত্রদান উপলক্ষে—২৩,৩৪৮ । ৩। নাকচরা চর ১টি, বাঁশখানা ২টি, খেকুট্যা ১টি, মছলন্দপুর ১টি, হরিখালি ২টি, পুরী

আর, ব্রাইট আই, সি, এস সাহেব মহোদয়ের দ্বারা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তাহার ভিত্তি স্থাপন হইয়া ডাক্তার অজয় কুমার সেন এল, এম, এস মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পাকা বাটী

যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বের সাড়িগ্রামে ১টি, সোনাচূড়া ১টি, মোট ন'টি পুষ্করিণী খনন—৪,৩০০৲ টাকা। ৪। হরিখালি হইতে গাড়ুঘাটা পর্যন্ত ২ মাইল রাস্তা তৈয়ার ২০০৲। ৫। কাবুল যুদ্ধে আহত সৈন্যের ভরণ-পোষণার্থ ১৬৪৲ টাকা। ৬। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ইলিয়ট সাহেবের তমলুক আগমন উপলক্ষে তদীয় স্মরণার্থে পুষ্করিণী খনন—১০০০৲ টাকা। ৭। তমলুক ডিস্পেন্সারী হস্পিটালের জন্য—২,৬০০৲ টাকা। ৮। দুর্ভিক্ষ সাহায্য দান ১৮৯৭ সালে ৫০০৲ টাকা। সর্বমোট ৩৮,১১২৲ টাকা।

ইহা ব্যতীত দেবালয় প্রতিষ্ঠা, তীর্থস্থান পরিভ্রমণে ৬০ জন স্ত্রীলোক ও ৩০ জন পুরুষসহ ৩০০ মাইল পুরীতীর্থ যাতায়াতেরও খরচ বহন, ১২৯৭ সালে অজন্মা হওয়ায় বহু গ্রামের লোকদের ২ বৎসর সাহায্য দান প্রভৃতি তাহার দানের ঠিক ঠিকানা নাই।

ইনি মহামান্য গবর্ণমেণ্ট হইতে যে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

"By command of his excellency the viceroy and Governor General in council, this certificate is presented in the name of her most Gracious Majesty Queen Victoria, Empress of India, to Babu Nilmoni Mondal Talukdar of Deulpota. Midnapur, and Manger of the Mahishadal Raj Estate, in recognition of his public spirit and generosity.

June 20th 1897 S/d. S. Mackeenzie
Lieutenant Governor of Bengal.

নীলমণি বাবু ১৩০৬ সালের ১৪ই আশ্বিন তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে মানবলীলা সংবরণ করেন। এই পরিবারের সুযোগ্য বংশধরগণ এখনও নানারূপ জনহিতৈষী কার্য্য করিয়া যাইতেছেন যেমন তমলুকের ডায়মণ্ড জুবিলি হসপিটাল গৃহের দ্বিতল গৃহনির্ম্মাণে ৭০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন ইত্যাদি।" পৃঃ ৩৫-৩৬।

মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৩। আষাঢ়।

প্রস্তুত হইয়াছে। বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতি এককালীন ৫০০৲ টাকা দান করিয়া স্ত্রীলোক রোগীর জন্য তাহার একটি কক্ষ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।" পৃঃ ১২১—১২২।

ইংরাজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই থেকে বিভিন্ন সভা-সমিতি হওয়ার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে তমলুক সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তখন এর পরিমাণ ফল ছিল ২১৬০ বর্গ একর বা তিন বর্গ মাইল; এবং অধিবাসীর সংখ্যা (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চের গণনামতে) ৭৮৭২ জন। এর মধ্যে ৪৩০৮ জন পুরুষ ও ৩৫৬৪ জন, স্ত্রীলোক। এর বার্ষিক আয় (১৯০০—০১ খ্রীঃ) ৮১৭২৷৶৩ টাকা। "মহাত্মা লর্ড রিপণের অনুগ্রহে তমোলুক মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাগণও নির্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর প্রথম নির্বাচন করেন। এই মিউনিসিপ্যালিটিতে ১২ জন কমিশনর আছেন, তন্মধ্যে ৮ জন করদাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত ও ৪ জন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এবং বেসরকারী (non-official) চিয়ারম্যানের দ্বারা ক্রমোন্নতির সহিত সুচারুরূপে কার্য্য নির্বাহ হইতেছে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রিজলিউসনেও প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে।" তমোলুক ইতিহাস, পৃঃ ১২৩

ইংরেজ শাসনকালে তমলুক সম্বন্ধে আর যে সব তথ্য জানা যায়, তা' হলো এখানে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেবল পথকর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঐ সংগে পূর্তকার্যের কর আদায়ের বিধি হলেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ঐতিহাসিক উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম-এ, (প্রেমচাদ রায়চাঁদ স্কলার) মহোদয়ের সময়ে প্রথম রোডকমিটি আরম্ভ হয়। এরপর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়ে লোকাল-বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোর্ডে ১৮ জন মেম্বর থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত ও ৬ জন গবর্ণমেণ্ট

দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বেসরকারী চেয়ারম্যান দ্বারা এই কার্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হোত।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মহানন্দ গুপ্ত, বি-এ মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই পুস্তকালয়টি বিদ্যালয় গৃহের সাথে একত্র সংযুক্ত ছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথমেই এখানে টেলিগ্রাফ ছিল। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যায় এবং উঠেও যায়। এর কয়েক বছর পর পুনরায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। সেই থেকে এর উত্তরোত্তর উন্নতিও হয়েছে এবং বর্তমান তমলুকে টেলিফোন যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবারের রেলওয়ে লাইনের সাথে তমলুকের ষ্টীমার সার্ভিস সংযুক্ত হয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনও হয়েছিল। কিন্তু পরে গবর্ণমেন্টের ব্যয় বাহুল্যের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল এই সংযোগ উঠে যায়। কিছুদিন হোরমিলার কোম্পানীর ঘাটাল লাইনের একটি ষ্টেশনও ছিল। তখন এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল মাত্র ছ'আনা। আর মেদিনীপুর যেতে হলেও উক্ত কোম্পানী ঐ ছ'আনাই ভাড়া নিতেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎবর্ষ রাজত্ব পূর্তি উপলক্ষে তমলুকে অতি আড়ম্বরের সাথে নৃত্য-গীত, বাজি পোড়ান, আলোকসজ্জা, দরিদ্রদিগকে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ এবং অভিনন্দন পত্র প্রদান ইত্যাদি কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল।

তমলুকে পূর্বে অনেকবার ভূমিকম্প হয়েছিল। সেসব ভূমিকম্পে তাম্রলিপ্তের ক্ষয়ক্ষতির কথা বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কিন্তু বাংলা ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ৪টা ৫৭ মিনিটের

সময় যে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে প্রায় ৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এই ভূমিকম্পের ফলে তমলুকের অনেক ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছিল। সেই সংগে বাংলা তথা কলকাতার হাইকোর্ট গৃহের শীর্ষদেশের চূড়া, সেণ্টপল গীর্জার শীর্ষদেশ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাড়ীও ভগ্ন হয়েছিল। কিন্তু তমলুকে দেবী বর্গভীমার মন্দিরের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। কেবলমাত্র ১২৭২ সালের প্রবল ঝটিকায় মন্দিরের চূড়াটি ভূমিসাৎ হয়। তৎপর উহা সুবর্ণ-নির্মিত হয়।

ইংরেজ শাসনকালে তমলুকের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল, একথা বলা যায় না। তবে ইংরেজগণ এই নগরী যে এককালে ঐতিহাসিক বন্দর ছিল, তা তাঁরা শিক্ষিত মানুষের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন। এবং এর উন্নতির জন্য যৎসামান্য চেষ্টাও করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজ আমলেও যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সেই সংগে এখানের অধিবাসিগণ যথেষ্ট ধনী ছিলেন না। লাভের অধিকাংশই ইংরেজদের পকেটে গিয়েছে। বুদ্ধিমান ইংরেজ জাতি শুধু যে লবণ ও রেশম ব্যবসা করেই অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাই নয়। এই মহাকুমার কোন কোন স্থানে নীলের চাষ করেও প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন। হরিদাসপুরের নিকট ও পাঁশকুড়া থানার কোথাও কোথাও আজো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দশম অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাম্রলিপ্ত

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বাংলা দেশের মধ্যে মেদিনীপুরের ত্যাগ ও বীর্য সর্বাগ্রগণ্য। মেদিনীপুরের এই বিপ্লবের ও স্বাধীনতার ইতিহাস আজো বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই ইতিহাস প্রণয়ন করা যেমন কষ্টকর তেমনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়েরও প্রয়োজন। তা' ছাড়া এই যুগের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিকল্পনা ছাড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই আমরা এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাম্রলিপ্তের (তমলুক) অবদানের কথা আলোচনা করব। এই আলোচনা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য হয়ত অনেক কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিতে হবে। তাই গোড়াতেই রসিক পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

মেদিনীপুর তথা তমলুকের ইতিহাস মুখ্যতঃ বিপ্লবের ইতিহাস —বিদ্রোহের ইতিহাস—বিক্ষোভের ইতিহাস।

সেই সুদূর রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে আরম্ভ করে হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, ইংরেজ এমনকি বর্তমানের স্বাধীনোত্তর জাতীয় সরকারের ইতিহাসেও মেদিনীপুরের বিপ্লবী আত্মার রক্তাক্ষরের স্বাক্ষর। উষ্ণ শোণিতের প্রবহমান্ ধারা—অন্যায় অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহসের কাহিনী অম্লান। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরা আজো আছে অক্ষুণ্ণ।

বিপ্লবী মেদিনীপুরের এই ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায় হোল ১৯০৪—৫ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে বিদেশী অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও প্রয়াস।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯২১ থেকে ১৯৩০—৩১ পর্যন্ত। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই এই অধ্যায়ের বিশিষ্ট রূপ।

তৃতীয় অধ্যায় ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩—৩৫ পর্যন্ত। এই অধ্যায় হোল বিদেশী শাসককুলের চরম অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ, প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প, মেদিনীপুরের মুক্তিপাগল যুব-শক্তির মরণ পণ অভিযান।

চতুর্থ অধ্যায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২—৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অহিংস ও সহিংস উভয় পন্থায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য গণ-বিক্ষোভ।

আর পঞ্চম অধ্যায় হোল স্বাধীনোত্তর ভারতে মেদিনীপুরের অবদান।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাম্রলিপ্তের কথা লিখতে গেলেই প্রথমে যাঁর নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়, তিনি হলেন ভারতের চির নমস্য অমর বীর শহীদ্ ক্ষুদিরাম। এই বিপ্লবী শহীদের প্রথম ছাত্র জীবন আরম্ভ হয়েছিল তমলুক হ্যামিলটন হাই-স্কুলে। ৭ বছর বয়সের সময় ক্ষুদিরাম পিতৃমাতৃহীন হন। দিদি অপরূপা গ্রহণ করেন এই অনাথ বালকের লালন-পালনের ভার। ভগিনীপতি অমৃতলাল রায় মহাশয় ছিলেন আদালতের সেরেস্তাদার। মেদিনী-পুরের হবিবপুর অঞ্চল থেকে দাশপুর থানার হাটগেছ্যা গ্রামে এসে দিদি-বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর ক্ষুদিরাম তমলুকে আসেন। কারণ, তাঁর ভগিনীপতি অমৃতবাবু দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। ফলে গ্রামের বাড়ী থেকে স্ত্রী পুত্রাদি নিয়ে এসে সপরিবারে বাস করেন। এই প্রসংগে "শহীদ যুগল" প্রণেতা নগেন গুহরায় যা' লিখেছেন, তা' বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন—

"তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিত মোহন এবং শ্যালক ক্ষুদিরাম তমলুক হ্যামিল্টন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে (এখনকার ক্লাস ফোরে) ভর্তি হইল।" পৃঃ ১২

দিদি অপরূপার লিখিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, তমলুকে বিদ্যাভ্যাস কালে ক্ষুদিরামের চরিত্রের কতকগুলি বিশেষত্ব তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়। দুরন্ত বালকের যাবতীয় লক্ষণ ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ক্ষুদিরাম পড়াশুনায় ছিল সাধারণতঃ অমনযোগী। কিন্তু যেদিন তাঁর পড়বার ইচ্ছে হোত, সেদিন ধ্যানস্থ তপস্বীর ন্যায় বালক ক্ষুদিরাম পাঠে মগ্ন থাকতো। তখন ক্ষুদিরাম ও ললিতের গৃহশিক্ষক স্বর্গীয় আশুতোষ রায়। শিক্ষকগণের মধ্যে তখন সেকেলে পদ্ধতিতে ছাত্রগণকে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং তৎসমুদয় প্রয়োগ দ্বারা ছাত্রদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করতেন। আশু মাষ্টার ছিলেন এই শ্রেণীর শিক্ষক।

ক্ষুদিরাম সময়ের অধিকাংশ ভাগই অতিবাহিত করত খেলা-ধূলায়। পাঠে অমনোযোগিতা, একগুঁয়েমি ও দুরন্তপনার জন্য প্রায় প্রতিদিনই গৃহশিক্ষকের হাতে তার শাস্তিভোগ হোত। আশু মাষ্টারের রুদ্র-মূর্তি দর্শনে বালকগণের প্রায় সকলেই বলিদানের ক্ষুদ্র ছাগ-শিশুর ন্যায় ভয়ে কম্পিত হোত। নগেনবাবু লিখেছেন—"কিন্তু এই অসাধারণ বালক তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। তাঁহার উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত ছাত্র-শাসনের যাবতীয় অস্ত্র ক্ষুদিরামের উপর প্রয়োগ করিয়াও তিান ইপ্সিত ফল লাভ করিতে পারেন নাই।" পৃঃ ১২

দিদি অপরূপা বলেন—"মাষ্টার আশু রায়ের চৌদ্দ পোয়া (যতটা সম্ভব পা ফাঁক করে দু' হাতে ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা), এক ঠেঙ্গা (এক পায়ের হাঁটুর ওপর পা'টাকে আড়াআড়ি রেখে ঝুঁকে হাতের তর্জনী আঙ্গুলের ও একটি পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা), গাধার টুপী, বেত, যত শাস্তি আছে, সব হার মেনেছিল ক্ষুদিরামের একগুঁয়েমির কাছে।"

"তমলুকে হ্যামিল্টন উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় একদিন বিশ্রামের সময় ক্ষুদিরাম কয়েকজন মহাধ্যায়ীকে লইয়া বিদ্যালয়ের নিকটস্থ

একটি বাদাম গাছে উঠিয়াছিল। গাছ হইতে পড়িয়া ছেলেরা হাত-পা ভাঙ্গিতে পারে আশঙ্কা করিয়া একজন শিক্ষক আসিয়া ছেলেদের গাছ হইতে নামিয়া আসিতে বলিলেন। ক্ষুদিরাম সে-সময় গাছের আগ-ডালে সটান দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছিল, আবার কখনো বা দুই হস্ত অঙ্গুলি-বদ্ধ করিয়া যুক্ত করতল মস্তকের উপর স্থাপন করিতেছিল। নিম্নে দাঁড়াইয়া দলে দলে ছেলেরা বিস্ময়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল। শিক্ষক মহাশয়ের ডাকে ছেলেরা সকলেই গাছ হইতে নামিয়া আসিল। শুধু নামিল না ক্ষুদিরাম, সে তখনো বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখায় দাঁড়াইয়া খেলার সাথীদের ভীরুতার জন্য তাহাদের বিদ্রূপ করিতেছিল। শিক্ষক মহাশয় ক্ষুদিরামকে গুরুতর শাস্তি দানের ভয় দেখাইলে সে ধীরে-সুস্থে সতর্কতার সহিত বৃক্ষ হইতে অবতরণের অপেক্ষা না রাখিয়াই কি যেন ভাবিয়া মাটির উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া গেল এবং শরীরের নানা স্থানে সে খুব আঘাত পাইল। তৎসত্ত্বেও বালক ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া শিক্ষক মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে-মুখে আঘাতের সামান্য অনুভূতিও প্রকাশ পাইল না। এমনি ছিল বীর বালক ক্ষুদিরামের সহন-শক্তি!

আর একদিন ক্ষুদিরাম ক্লাস-শিক্ষকের নিকট দাঁড়াইয়া রিডিং পড়িতেছিল। ইত্যবসরে তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট একটি দুষ্ট ছেলে টুলের ছোট একটি ছিদ্রের মধ্যে এমনভাবে কাঠ-পেন্সিল বসাইয়া রাখিল, যেন বসিবার কালে পেন্সিলের সরু অগ্রভাগের খোঁচা লাগে। পড়া শেষ করিয়া বসিতে যাইবার সময় ক্ষুদিরামের মল-দ্বারে পেন্সিলের খোঁচা লাগিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল। ক্লাসের শিক্ষক অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া যখন সেই অপরাধী ছাত্রটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ক্ষুদিরাম তাঁহাকে বারণ

করিল। অবিচলিত ধৈর্যের সহিত বালক ক্ষুদিরাম এই গুরুতর আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল।" শহীদ যুগল, পৃঃ ১৫

ক্ষুদিরাম বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। তমলুকে অবস্থানকালে এই সব গুণের বিকাশ তাঁর চরিত্রে দেখা যায়। মেদিনীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় তাঁর ইংরেজী পুস্তক "Boy Revolutionary of India" পুস্তকে ক্ষুদিরামের তমলুকে অবস্থান সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেই সমস্ত তথ্য এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক উক্ত পুস্তক পাঠ করলে সবিশেষ অবগত হবেন। ক্ষুদিরাম তমলুক শহরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। তারপর তাঁর ভগিনীপতি তমলুক থেকে মেদিনীপুর সহরে বদলী হয়ে আসেন। ফলে ক্ষুদিরামও তমলুক ছেড়ে মেদিনীপুরে চলে আসেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হওয়ার পরমুহূর্তেই লাহোর কংগ্রেস ঘোষণা করল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। আর ২রা জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে গৃহীত হোল নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি—

"পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার বার্তা ভারতের দূর গ্রাম-গ্রামান্তরে বহন করিয়া লইবার জন্য এই সমিতি ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন করা হইবে,—এই ঘোষণা করিতেছেন।"

ঐ সালের ১৯শে মার্চ মহাত্মাজী ডাণ্ডী অভিযান করলেন। মেদিনীপুরে এসেও লাগল তার ঢেউ। মহাত্মাজীর আহ্বানে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভীষণ আকার ধারণ করে। তমলুকে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যাপকভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি ১৩৩৮ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' শারদীয় সংখ্যা থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"তমলুক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা; ইহাতে ছয়টি থানা ও ১৩০০ গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ, উহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬ জন।

মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ১৯শে মার্চ (১৯৩০) তারিখে মেদিনীপুরে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও রসদ-সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে কয়েকজন কর্মীর চেষ্টায় একটি আইন অমান্য সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি মহাত্মাজীর আদেশ ও নিখিল ভারত কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে তমলুক ও কাঁথিতে নিরপেক্ষভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

তমলুক আইন অমান্য সমিতি গঠিত হইবার পর বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ হইতে শ্রীযুত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অজিতকুমার মল্লিক প্রথম লবণ আইন অমান্য করিবার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিবার জন্য তমলুক গমন করেন। ইহার পরেও বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ্ বর্তমান আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। ৫ই এপ্রিল ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় তমলুক যাত্রা করেন। ইহা ছাড়া শ্রীযুত জীতেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবী, শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, শ্রীযুত প্রভাতকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীযুত ভগবতীচরণ সোম, শ্রীযুত ললিতমোহন মিত্র ও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মকসুদ হোসেন প্রভৃতি নেতৃবর্গ তমলুকে আসিয়া সভা আহ্বান করিয়া জনসাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য অর্ডিন্যান্সের ফলে এবং তমলুকের কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ না থাকায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিবরণ আশানুরূপ প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু দৈনিক বুলেটিনের সাহায্যে মহকুমার সর্বত্র সংবাদ প্রচারিত হইত।

মহাত্মাজীর অন্যতম প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণদাসজী তমলুকে

আসিয়া গ্রেপ্তার হন। জেলা আইন অমান্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মাইতি, তাঁহার সহকর্মিগণের সহিত ধৃত হইবার পর শ্রীযুত ললিতমোহন সিংহ ও শ্রীযুত বিনোদবিহারী দাসগুপ্ত বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ্ হইতে তমলুকে প্রেরিত হন।

৬ই এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে দৈনিক প্রায় ৩০টি কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত হইত। জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পুলিশের সর্বপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও মদ, গাঁজা প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং ও চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন পুর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। প্রথমে কেবল স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক লবণ প্রস্তুত হইত, পরে সর্বসাধারণের ভিতর ইহা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। বর্ষা হেতু কয়েক মাস লবণ প্রস্তুত বন্ধ ছিল। বর্ষা শেষ হইলে পুনরায় মহকুমার সর্বত্র লবণ প্রস্তুত আরম্ভ হয়।

তমলুক হইতে দেড় সহস্রাধিক ব্যক্তি কারাবরণ করিয়াছেন, শত শত ব্যক্তি নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছেন, বহু বাড়ী ভঙ্গ ও ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বহু শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছিল। দুই-এক টাকা ট্যাক্সের জন্য গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তির ১৫০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত অপহৃত হইয়াছে। বহু গ্রামবাসী বন্দুকের গুলীতেও হতাহত হইয়াছে, মন্দির অপবিত্র ও বিগ্রহ ভগ্ন হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যেও দেশবাসী দৃঢ় ও অটল থাকিয়া তাহাদের কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

"স্বাধীনতা দিবসে" (১৯৩১) তমলুকে ১০০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল, একজনের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও তাহারা ঐ দিবস আদালতের সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

॥ বিস্তৃত বিবরণ ॥

যে সময় মহাত্মাজী ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রথম লবণ আইন অমান্য করেন, ঠিক সেই সময় মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মাইতির সভাপতিত্বে তমলুক সহরে একটি আইন অমান্য সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার একখানি গৃহ কংগ্রেস অফিস করিবার জন্য দান করেন। তমলুকের রাজা শ্রীযুত সুরেন্দ্র-নারায়ণ রায় তাঁহার একখানি বৃহৎ অট্টালিকা স্বেচ্ছাসেবকদের থাকিবার জন্য দান করেন।

৩০শে মার্চ হইতে মহকুমার সর্বত্র সভাদি করিয়া স্বেচ্ছাসেবক ও রসদ সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। ৩০শে মার্চ বালুঘাটা, নন্দকুমার, দেউলপোতা নামক স্থানে তিনটি সভার অধিবেশন হয় এবং ৬ই এপ্রিলের পূর্বে প্রায় ১৫০০০ হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হয়।

তমলুক সহর হইতে ১১ মাইল দূরবর্তী নরঘাট নামক স্থান প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র নিরূপিত হইয়াছিল। ৬ই এপ্রিল ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী শ্রীযুত হংসধ্বজ মাইতির নায়কত্বে বিরাট শোভাযাত্রা সহ তমলুক সহর হইতে বাহির হইয়া নরঘাট অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করে। শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ৬ই এপ্রিল ৭।৮ হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রা চালনা করিয়া নরঘাট পর্যন্ত যান, প্রায় ২০০ শত সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা ২ মাইল পথ নির্বিবাদে হাঁটিয়া মিছিলের সঙ্গে গিয়াছিলেন। বৈকাল ৩ ঘটিকার সময় মিছিল নরঘাটে পৌঁছে। ৪ ঘটিকার সময় ৫ জন বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক যথা—শ্রীযুত হংসধ্বজ মাইতি, (নায়ক) শ্রীযুত ইন্দ্রজিত সিংহ, শ্রীযুত রাখালচন্দ্র নায়ক, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ডাকুয়া, ও শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মাইতি প্রথম লবণ প্রস্তুত করিতে যান। লবণ

প্রস্তুতের সময় ৫ জন পুলিশ কর্মচারী সে স্থানে আসিয়া প্রস্তুত লবণ লইয়া চলিয়া যায়। ঐ দিবস সর্বপ্রথমে প্রস্তুত ১ তোলা লবণ ৫০০৲ শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

৬ই এপ্রিল হইতে দৈনিক লবণ প্রস্তুত হইত, পুলিশ দৈনিক আসিয়া হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া দিত এবং অক্ষম হইলে স্বেচ্ছাসেবক-দিগকে প্রহার করিত। নিরীহ স্বেচ্ছাসেবকদের উপর এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া সরবেড়িয়া গ্রামবাসী শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র সামন্ত পদত্যাগ করেন।

১৫ই এপ্রিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডি তমলুকে আসিয়াই বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেন ও বিচারে ১॥ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঐ দিবস পূর্বোক্ত শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র সামন্ত গ্রেপ্তার হইয়া ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বৈকালে লবণ প্রস্তুতের সময় একদল পুলিশ আসিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের প্রহার করে। ঐ দিবস একদল পুলিশ গ্রামের মধ্যে যাইয়া গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সাহায্য করিতে নিষেধ করে। পুলিশ, আশী বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। যে ঘরটিতে স্বেচ্ছাসেবক থাকিত, তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৬ই এপ্রিল লবণ প্রস্তুতের সময় দ্বিতীয় দলের নায়ক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সামন্তকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

১৮ই এপ্রিল কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাসী হয়। শ্রীযুত কুমার-চন্দ্র জানা ও শ্রীযুত ললিতকুমার ধারা বক্তৃতা করিবার সময়েই গ্রেপ্তার হইয়া যথাক্রমে ৬ মাস ও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ তারিখে নরঘাটে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী দাসী, ও চারুশীলা দেবী ১৪৪ ধারা অমান্য করেন। সভার সময় পুলিশ জনতাকে এরূপ-ভাবে প্রহার করে যে, ফলে ৭।৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং

একটি ১০ বৎসরের বালকের কপাল ফাটিয়া অজস্র ধারায় রক্ত পড়িতে থাকে।

২০শে এপ্রিল আইন অমান্য সমিতির ডিরেক্টার শ্রীযুত চণ্ডীচরণ দত্ত বি-এল গ্রেপ্তার হন। লবণ প্রস্তুতের সময় প্রহারের ফলে ২৩ জন লোক অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

২২শে এপ্রিল মহিষাদল থানায় ৩নং ইউনিয়নের অন্তর্গত রাউতুড়ী গ্রামে অন্য একটি নতুন কেন্দ্র খোলা হয়। সেখানেও পুলিশ নরঘাটের ন্যায় পূর্ণ মাত্রায় দমননীতি চালাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

ক্রমে তমলুকবাসীদের লবণ প্রস্তুতের কেন্দ্র বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। কেবলমাত্র মে মাসের মধ্যে সমগ্র মহকুমায় ৯টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। যথা:—নরঘাট, রাউতুড়ি, তমলুক সহর, ডিহিশুমাই, রাজারামপুর, বাড়বাসুদেব, বাবুপুর, রাসগাছতলা ও কেশপাট। প্রত্যেক কেন্দ্রেই পুলিশের অত্যাচার চলিতেছিল। দৈনিক ৩০।৪০ জন করিয়া গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ করিল। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আইন অমান্য সমিতির সভাপতি শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাইতি, সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও তমলুকের রাজা শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় গ্রেপ্তার হন। মহেন্দ্র বাবুর ১৫ মাস ও সতীশ বাবুর ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই সময় বাবুপুরে একটি হাঙ্গামা হয়। একদিন বাবুপুর কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুতের সময় পুলিশ আসিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে থাকে, ইহাতে জনৈক গ্রামবাসী উত্তেজিত হইয়া পুলিশের উপর ঢিল নিক্ষেপ করে। পরে প্রায় ১০০ শত সশস্ত্র পুলিশ সেখানে যাইয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীকে প্রহার করতঃ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। প্রহারের ফলে ফণীন্দ্রনাথ সরকার নামক সত্যাগ্রহীর রক্তবমন হয়। এমতাবস্থায় গ্রামবাসিগণ কেহই স্বেচ্ছাসেবকদের স্থান দিতে পারে না। স্বেচ্ছাসেবকগণ অনাহারে কাল কাটাইতে লাগিল। এই

সময় শ্রীযুত কৃষ্ণদাসজী তাঁহার একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া বাবুপুরে উপস্থিত হন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির পুলিশের নিকট হইতে লইবার জন্য ৩ দিন প্রায়োপবেশন করেন। ৩য় দিনে তিনি গ্রেপ্তার হইয়া ৬ মাসের কারাদণ্ডে দীক্ষিত হন। এরূপ অত্যাচারের মধ্যেও দৈনিক লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

এইভাবে যতদিন না পর্যন্ত বৃষ্টির প্রভাবে সমস্ত লবণ কেন্দ্রগুলি জলমগ্ন হইয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত এইরূপ নির্যাতনের মধ্যেই লবণ প্রস্তুত চলিতেছিল। উপরোক্ত লবণ কেন্দ্রগুলি ভিন্ন আতাপালায় (সূতাহাটা) ও উদ্ধবমালে বিপুল সমারোহে লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল। এইভাবে জুন মাসের মধ্যে সমগ্র মহকুমায় প্রায় ৩০টি কেন্দ্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

জুন মাসের প্রথম হইতেই তমলুক মহকুমার প্রায় সমস্ত মদ, গাঁজা ও তাড়ীর দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়। এই সমস্ত পিকেটিং করিবার অপরাধে বহু স্বেচ্ছাসেবক প্রহৃত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিল।

১৫ই জুন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় বহু পুলিশ আইন অমান্য অফিস, স্থানীয় হাই স্কুল ও বর্গভীমা মন্দির ঘেরাও করিয়া ১১জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া বেলা ৪টার সময় প্রহার দিয়া সকলকে ছাড়িয়া দেয়।

এইরূপ পিকেটিং করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য মহকুমার অধিকাংশ স্কুলে পিকেটিং করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য দৈনিক ১৫।২০ জন সত্যাগ্রহী প্রহৃত হয়। অনেককেই কারাবরণ করিতে হয়। ৫ই জুলাই বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত গৌরীদাস ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হইয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সদর মহকুমার অন্তর্গত ঘেরাই নামক গ্রামে একদল পুলিশ উপস্থিত হইয়া একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিনা কারণে বেদম প্রহার করে। ইহা দেখিয়া

গ্রামবাসিগণ শঙ্খধ্বনি করে। ফলে ৫।৬ হাজার লোক সমবেত হয়। এই জনতার মধ্য হইতে জনৈক গ্রামবাসী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কয়েকটি ঢেলা নিক্ষেপ করে। ইহাতে পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায়। গ্রামবাসিগণ পলায়ন করে। গুলীতে ১০ জন নিহত ও প্রায় অর্দ্ধশতাধিক লোক জখম হয়। এই ১০ জনের মৃত্যুর ফলে গ্রাম হইতে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে। মৃতদেহগুলি শৃগাল কুকুরে ছিন্ন-ভিন্ন করে, পরে কয়েকজন গ্রাম-বাসীর চেষ্টায় তাহাদের দাহকার্য শেষ হয়।

জুন মাসের শেষ ভাগ হইতে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর তথা তমলুক মহকুমায় চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রচার চালাইতে থাকে। এই সময়ে বহু চৌকিদার পদত্যাগ করিয়া তাহাদের হুদ্দাপোষাক এস-ডি-ওর নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করে। ২২শে জুন পাঁশকুড়া থানার জনৈক চৌকিদার শ্রীগোবর্দ্ধন দাস পদত্যাগ করে। এদিকে আইন অমান্য সমিতির ট্যাক্স বন্ধের জন্য প্রচারকার্য চলিতে থাকে। অন্যদিকে পুলিশবাহিনী ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটাছুটি করিতে থাকে। ৩রা জুলাই মহেন্দ্রনাথ মাইতি নামক মহিষাদল থানার জনৈক চৌকিদার পদত্যাগ করে।

চৌকিদারের পদত্যাগ ॥ শ্রীক্ষেত্রমোহন দাস, থানা—তমলুক, গ্রাম—হিজলবেড়্যা শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাইতি, থানা—তমলুক, গ্রাম—কুরপাই, শ্রীগোপালচন্দ্র বেরা, থানা—তমলুক, গ্রাম—কুরপাই, শ্রীশিবু দাস, থানা—তমলুক, গ্রাম—জয়কৃষ্ণপুর, শ্রীসারদা ঘড়া, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—ঘাটোয়াল, শ্রীগোবর্দ্ধন ঘড়া, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—টিকারামপুর, শ্রীচৈতন্য মণ্ডল, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—ইচ্ছাপুর, শ্রীঅমর ফকির, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—কাঞ্চন পুর, সতুদ্দিন মিঞা, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—লাইকুড়ী, শ্রীচিন্তামণি

মণ্ডল, থানা—তমলুক, শ্রীঅমরনাথ বাড়ী, থানা—তমলুক, গ্রাম—খামারচক, সন্ন্যাসী সিংহ, থানা—তমলুক, গ্রাম—হরশঙ্কর, শ্রীচরণ মণ্ডল, থানা—তমলুক, শ্রীকৃত্তিবাস দয়ালী, থানা—তমলুক, শ্রীবিপিনচন্দ্র শাসমল, থানা—তমলুক, গ্রাম—গড়কিল্লা, শ্রীসারদা প্রসাদ দাস, থানা—তমলুক, গ্রাম—টুল্যা, শ্রীশশীভূষণ বর, থানা—তমলুক, গ্রাম—খামারচক, শ্রীধরণী মণ্ডল, থানা—তমলুক, গ্রাম—রাজহাটী, শ্রীহারু দাস, থানা—তমলুক, গ্রাম—রসিকপুর, শ্রীকৃষ্ণ দাস (দফাদার), থানা—তমলুক, গ্রাম—মিরিকপুর, শ্রীহারাধন সামন্ত, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—রাউতুড়ী, শ্রীযোগী দাস, থানা—মহিষাদল, গ্রাম—বাড়বঁইচবেড়িয়া, শ্রীগোপাল চন্দ্র দীণ্ডা (সহকারী পঞ্চায়েৎ) থানা—মহিষাদল, গ্রাম—রাউতুড়ী, ৪নং ইউনিয়নের ১৩ জন চৌকিদার, মহিষাদল, এতদ্ভিন্ন বহু চৌকিদার, দফাদার, আদায়কারী ও প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

॥ চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় আরম্ভ পুলিশের বিরাট বাহিনীর অভিযান ॥

তমলুক মহকুমার চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের জন্য অন্যান্য জেলা হইতে ৫০০ শত পুলিশ আনিত হয়। তাহারা প্রতি থানায় দলে দলে যাইয়া ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে প্রহার করে। তাহাদের বাড়ী হইতে সমস্ত জিনিষ ও আসবাবপত্র ক্রোক করিয়া লইয়া যায়।

॥ চাউলখোলায় পুলিশের গুলী ॥

অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে চাউলখোলা গ্রামের চৌকিদার চাকুরী ছাড়িয়া দেয়। তাহাকে ধরিবার জন্য সুতাহাটা থানার বড় দারোগা একদল পুলিশ সহ উক্ত গ্রামে উপস্থিত হয়। পুলিশ দেখিয়া গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনি করে। ইহাতে বহুলোক সমবেত

হয়। বহুলোক সমবেত হইতে দেখিয়া দারোগা সকলকে চলিয়া যাইতে বলে। ইহাতে তাহারা চলিয়া না যাইয়া বিপুল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে। এই ধ্বনি শুনিয়া বড় দারোগা পুলিশকে প্রথমে প্রথমে ফাঁকা গুলী করিতে বলে। ইহাতে গ্রামবাসিগণ পলাইতে থাকে। দারোগা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া জনতার উপর গুলী চালায়। ইহাতে ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও ১০।১২ জন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলার এ ডি এম প্রায় শতাধিক সহস্র পুলিশসহ ময়না থানায় ট্যাক্স আদায় করিতে যান। গ্রামবাসী ট্যাক্স না দেওয়ায় উক্ত থানায় ২২ খানা ঘর ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

॥ তমলুকে নবম অর্ডিন্যান্সের প্রত্যুত্তর দান ॥

নবম অর্ডিন্যান্সের প্রত্যুত্তরকল্পে তমলুক মহকুমায় নিম্নলিখিত অধিবাসিগণ প্রকাশ্যে আইন অমান্য সমিতির কার্যের জন্য নিজেদের বসতবাটীগুলি হাসিমুখে দান করিয়াছিলেন। দান করিবার পূর্বে তাঁহারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন।

১। শ্রীযুত কুমারচন্দ্র জানার বসতবাটী (সুতাহাটা থানার অন্তর্গত বাসদেবপুর গ্রামনিবাসী)।

২। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রাসগাছতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র পাত্রের বসতবাটী।

৩। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রাসগাছতলা গ্রামের "গঙ্গামন্দির" নামক বাড়ীখানা।

৪। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কালিদান গ্রামনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সাঁতরার বসতবাটী।

৫। উক্ত যতীন্দ্রনাথ সাঁতরার গোলাবাড়ীর পশ্চিমাংশ।

৬। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কেশবপাট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বসতবাটি।
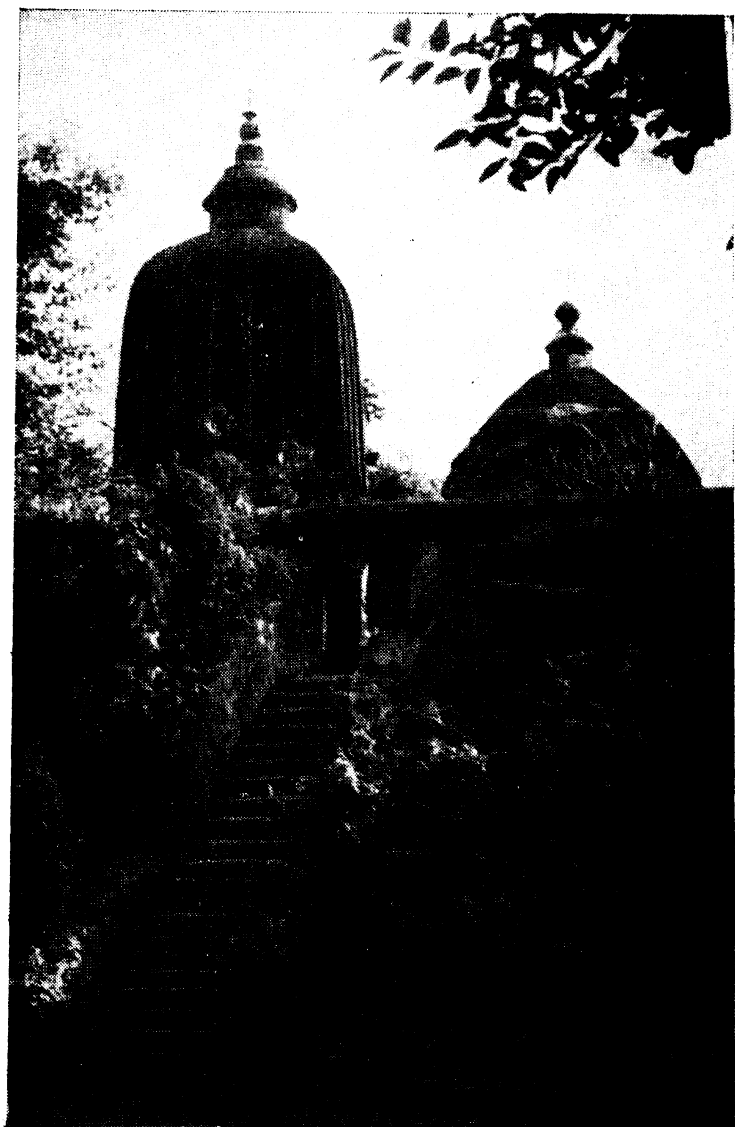
পাশ থেকে বর্গভীমা মন্দির

বিষ্ণুমূর্তি (হা. স্কুল)
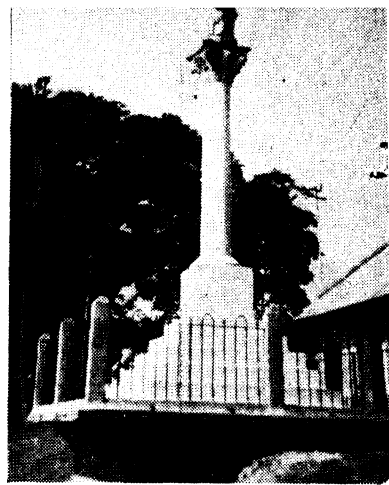
মাতঙ্গিনী স্মৃতি স্তম্ভ

অশোক স্তম্ভ (হা. স্কুল)
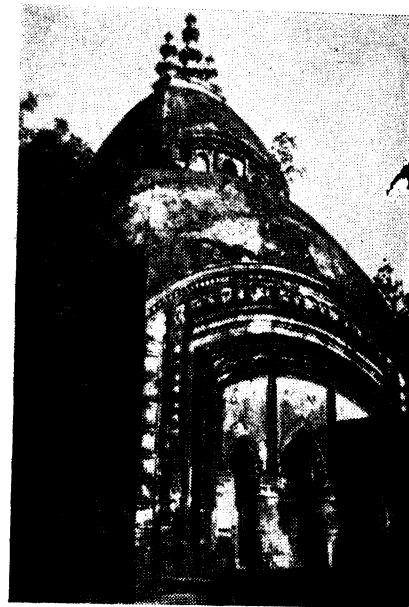
জগন্নাথ মন্দির

৭। সুতাহাটী থানার অন্তর্গত বাড়বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ননীগোপাল কুইতির বসতবাটী।

৮। মহিষাদল থানার অন্তর্গত সরবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত শ্রীপতিচরণ বোয়াল ১ খানি নূতন বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ইউনিয়নের প্রেঃ পঞ্চায়েৎ উহা ভাঙ্গিয়া সমস্ত খড় ও বাঁশগুলি আত্মসাৎ করে।

॥ স্বাধীনতা দিবসে তমলুক (১৯৩১) ॥

৬ই এপ্রিল তমলুক মহকুমায় পুলিশের অত্যাচার চলা সত্বেও ২৬শে জানুয়ারী দেশবাসিগণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। সহরের চতুর্দ্দিকে পুলিশের পাহারা থাকা সত্বেও প্রায় ৪০০০ হাজার লোকের শোভাযাত্রা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহর পরিভ্রমণ করতঃ আদালতের সম্মুখে পতাকা উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পুলিশ লাঠি চালাইয়াছিল। প্রায় ৩০০ শত লোক আহত হইয়াছিল ও ১০০ শত জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল। একটি ১২ বৎসর বালকের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। অনেকের হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে ১০০ জন ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকেই প্রহৃত হইয়াছিল। ঐদিনই বিচারে তাহাদের ৪০ জনের দেড় মাস ও তিন মাস করিয়া জেল হয় ও অবশিষ্টকে প্রহার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মহকুমার প্রায় সমস্ত ইউনিয়নে "স্বাধীনতা দিবস" উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সুতাহাটী থানার অন্তর্গত বাড়বাসুদেবপুর গ্রামে, নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত নন্দপুর গ্রামে, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কালীদান গ্রামে, তমলুক থানার ডিমারি নামক হাট, ময়না থানার অন্তর্গত পরমানন্দপুর গ্রাম, মহিষাদল থানার অন্তর্গত রাউতুরী ও ব্যবত্তা নামক গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শোভাযাত্রায় বহু মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন।

বিগ্রহ চূর্ণ "দক্ষিণ নারকেলদা—রাধাগোবিন্দজিউ।" পৃঃ ১২৯—১৩৩।

এই হোল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরপরের ইতিহাস যেমন বীরত্বপূর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর। নানা সভাসমিতি ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তমলুকের বিপ্লবী দলের কাজ পুরোদমেই চলছিল। অবশেষে এলো ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই সাল "আগষ্ট বিপ্লব" বা বিয়াল্লিশের আন্দোলন" নামে বিখ্যাত। মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন' "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" অর্থাৎ ভারত স্বাধীন করব না হয় বরণ করব বীরমৃত্যু। ভারত স্বাধীন করার জন্য কংগ্রেসের এই শেষ সংগ্রাম। ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট হয়ে উঠলো শঙ্কিত। এই আন্দোলন দমন করার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করলে তাঁরা। ১৫ই আগষ্ট এক অধিবেশন করে স্থির হবে এই সংগ্রামের সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালী। ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট তার আগেই এই সংবাদ জানতে পেরে প্রত্যেকটি কংগ্রেস নেতাকে করলেন কারারুদ্ধ। কংগ্রেস পারল না "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

কিন্তু নেতাহীন ভারতবাসী তাই বলে চুপ করে রইলো না। এতদিন যে অন্যায় অত্যাচার চুপ করে সহ্য করছিল তারা, এবার সে অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য সংঘবদ্ধ হলো। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই গ্রেপ্তারের সংবাদ। ভারতের অন্তরাত্মা জেগে উঠল। উদ্বুদ্ধ হলো তারা আত্মশক্তিতে। ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল বিপ্লবের দাবানল। বুঝি টনক নড়ল ইংরেজ সরকারের। সমস্ত মারণাস্ত্র নিয়ে এই বিপ্লব দমন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই মেদিনীপুরের উপরে কড়া নজর ছিল ব্রিটিশ সরকারের। আইন করে তাই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো মেদিনীপুরের সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে।

জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় তমলুককে বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। এবং মেদিনীপুরে চলতে থাকে সামরিক শাসন। বাজেয়াপ্ত করলো সমস্ত মটরযান। এপ্রিল মাসে সহসা এক অসম্ভব আদেশ জারি হোল। যত নৌকা আছে সরিয়ে ফেলতে হবে সব। যদি এসে পড়ে জাপানীরা ব্যবহার করবে এই নৌকা। দেখতে দেখতে সমস্ত সাইকেলও কেড়ে নেওয়া হোল। ক্ষতিপূরণ মাত্র ১২৲ টাকা। তাও কেউ নিল আর কেউ নিল না। এদিকে প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীকে খোঁড়া করে রাখল সরকার। জনসাধারণ ভাবল, তাইত—সত্যি যদি জাপানীরা এসে পড়ে। তা' হলেত ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে সরকার। তখন দুর্দশা চরমে উঠবে তাদের। প্রতিকার চাই এর। নেতারা গড়ে তুললেন এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নাম হোল 'বিদ্যুৎ বাহিনী।' দেখতে দেখতে পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিল এতে। এই "বিদ্যুৎ বাহিনী"র প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র সামন্ত মহাশয়। বর্তমানে এম-পি। তিনি কোলকাতায় ধৃত হলে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি অজয় কুমার মুখার্জী এই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এঁর পর সুশীলচন্দ্র ধাড়া মহাশয় নেতৃত্ব করেছিলেন।

প্রথম অধিনায়ক সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' মেদিনীপুরের জনসাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুরে এই নবগঠিত জাতীয় সরকার পুরো দু'বৎসর কার্যকরী ছিল। এতে ৩টি বিভাগ ছিল : ১। সমর বিভাগ ২। গোয়েন্দা বিভাগ ও ৩। এম্বুলেন্স বিভাগ। শেষোক্ত বিভাগে রীতিমত ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি চিকিৎসার সর্ববিধ ব্যবস্থা ছিল।

এই জাতীয় সরকারের সমস্ত বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এর বিচার বিভাগ। মেদিনীপুরের প্রত্যেক থানার অধীন জাতীয় সরকারের একটি আলাদা বিচার বিভাগ ছিল। এই জাতীয় আদালতে মামলা দায়ের করতে হলে মাত্র ১৲ টাকা

ফি দিতে হত। এইসব আদালতে রীতিমত দেওয়ানী আর ফৌজদারী দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল। এ ছাড়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতও ছিল। এই সব জাতীয় আদালতে সুতাহাটাতে ৮৩৫টি মামলা, নন্দীগ্রামে ২২২টি মামলা, মহিষাদলে ১০৫৫টি মামলা, তমলুকে ৭৯৪টি মামলা মীমাংসিত হয়।

জাতীয় সরকারের আর একটি বিভাগের নাম ছিল যুদ্ধবিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল, সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা। গোয়েন্দা বিভাগ ছিল খুব ঝানু, কার্যদক্ষ। এই সুসংগঠিত জাতীয় সরকারের কার্যকলাপ দেখে তদানীন্তন কুখ্যাত সরকার যে উক্তি করেছিলেন, তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য —"বাংলা দেশে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে যথেষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাবধানতা পদ্ধতি ও প্রাথমিক কৌশলী নীতি—আগে থেকে নির্দিষ্ট সঙ্কেত মত ঘেরাও করা ও পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ ইত্যাদি জাতীয় বাহিনীর বৈশিষ্ট্য। এই সব বিশৃঙ্খলাকারী বিদ্রোহীদের সঙ্গে আহতদের শুশ্রূষার্থে ডাক্তার এবং নার্স থাকত এবং এদের গোয়েন্দা বিভাগও খুব দক্ষ ছিল। (সরকারী রিপোর্ট)

এই সময় মেদিনীপুরের বুকে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের আসন্ন পদছায়া। জাতীয় নেতারা বুঝলেন, আজ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে খাদ্য-শস্য। তা' না হলে দেশ রক্ষে পাবে না এই দারুণ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে। আবেদন জানালো সরকারের কাছে তারা। দেশের খাদ্য-শস্য কোন মতেই বিদেশে পাঠান চলবে না। সরকার কিন্তু জাতীয় নেতাদের সে আবেদনে কর্ণপাত করলো না। জাতীয় সরকার অন্তরে অন্তরে উঠলো গর্জে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলো তারা, যেমন করে হোক প্রতিবিধান করতে হবে এর।

মেদিনীপুরের চালকল থেকে জেলার বাইরে রপ্তানী হচ্ছিল চাল। উত্তেজিত হয়ে গ্রামের লোক প্রতিবাদ করলো এর।

পুলিশ উত্তর দিল সে প্রতিবাদের। জনতার উপর চালালো তারা গুলী। ফলে মারা পড়ল ৩ জন। এ হোল ৮ই সেপ্টেম্বরের কথা। কংগ্রেস অফিসে সংবাদ এলো এই নির্মম হত্যার। সংগে সংগে একদল স্বেচ্ছাসেবক এলো ঘটনাস্থলে। তারা ফিরে চাইল ৩টি মৃতদেহ। ময়না তদন্তের পর ফেরৎ দেওয়া হবে আশ্বাস দিল পুলিশ। কিন্তু কার্যতঃ তা' না করে ভাসিয়ে দিল মৃতদেহগুলি জলে।

সারা মেদিনীপুরে প্রতিবাদে ঘোষিত হলো হরতাল। জাতীয়-কর্মীরা ডাক চলাচলের সুবিধার জন্য নিজেরাই স্থাপন করল স্বতন্ত্র ডাক-ব্যবস্থা। পুলিশ অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই জাতীয় সরকারের গোপন চিঠিপত্র তারা পারল না ধরতে। এমন সুন্দর সতর্ক ব্যবস্থা ছিল তাদের। এই সময়ে বিপ্লবীদল নিজেদের সংবাদপত্রও প্রকাশ করলো। নাম তার— "বিপ্লবী"। সাইক্লো-স্টাইল যন্ত্রে ছাপা হত এই কাগজ।

এইভাবে ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল আর একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতীয় সরকার। পরিশেষে বিপ্লবীরা স্থির করলো সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করে নেবে তারা। ২৭শে সেপ্টেম্বর সমস্ত কর্মীদের নিয়ে এক গোপন অধিবেশন হোল। স্থির হোল এতে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লব ঘোষণা করে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করে নেবে বিপ্লবীরা।

প্রস্তাব অনুযায়ী পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কাজ। সেদিন রাত্রিতে তমলুকে একটি প্রধান রাজপথ দেওয়া হোল কেটে। ভেংগে দেওয়া হোল ৩০টি পোল। সরকারী সৈন্যরা যাতে অগ্রসর না হতে পারে সেজন্য রাস্তার ২০টি জায়গায় রাতারাতি খনন করা হোল গভীর গহ্বর। আর সেই সংগে সরকারী সংবাদ আদান-প্রদান অচল করার জন্য কেটে দেওয়া হোল টেলিগ্রাফ তার। উপড়ে ফেলা হোল ১৯৪টি টেলিগ্রাফের থাম।

সেদিন ছিল বিয়াল্লিশের ২৯শে সেপ্টেম্বর। বেলা তিনটে। তমলুক শহরের বুক জুড়ে চললো মিলিত হিন্দু-মুসলমানের পাঁচটি শোভাযাত্রা। সহরের বিভিন্ন দিক থেকে পাঁচটি পথ ধরে। ধীর শান্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে তারা। মুখে তাদের—ইংরেজ ভারত ছাড়ো। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের চীৎকারে কেঁপে উঠলো ইংরেজ সরকারের অন্তরাত্মা।

ইংরেজ হুকুম দিল ভাড়াটে সৈন্যদের—চালাও গুলী। জনতা প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করলো। মনোবল অসীম তাদের, প্রতিজ্ঞায় অটল তারা। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে হাসিমুখে এগিয়ে গেল সম্মুখে। লক্ষ্য তাদের ইংরেজের থানা, কাছারী,—অধিকার করে স্থাপন করবে তাতে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা।

থানার সামনা সামনি এসে রামচন্দ্র বেরা পতাকা হাতে থানার দরজার উপর পড়ল লাফিয়ে। রামচন্দ্র বেরার বীরত্ব কাহিনী এমনি ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'মাতঙ্গিনী হাজরা' পুস্তকে—

"সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি সজোরে তাঁর বুকে এসে লাগল। তিনি থানার দরজার উপর পড়ে গেলেন। সৈন্যরা তাঁর দেহ টেনে থানার ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক ভাবেই রামচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এল।....দেখলেন, রক্তের কাদার মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন, কিন্তু শুয়ে আছেন তিনি থানার ভিতরেই। সেই অবস্থাতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন, আমি পৌঁছেছি' থানার ভিতরে এসে পৌঁছেছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলি এসে তাঁর বুকে লাগতে তিনি চিরকালের মতন ঘুমিয়ে পড়লেন।" পৃঃ ১৩

শহরের উত্তর দিক থেকে বাণ পুকুরের পাড় ধরে ইংরেজ ট্রেজারী দখল করার জন্য আসছিল আর একটি বিরাট শোভাযাত্রা। পরিচালনা করছিলেন তিয়াত্তোর বছরের এক বৃদ্ধা, তিনি হলেন

বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা। মাতঙ্গিনীর একহাতে শঙ্খ, অপর হাতে ভারতীয় জাতীয় পতাকা। তিনি আছেন শোভাযাত্রার পুরোভাগে সকলের আগে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ দেশের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই বর্বর বিদেশী সরকারের পুলিশ আর সৈন্যদল অহিংস মিছিলের উপর ছুঁড়ল গুলী। ব্রিটিশ সৈন্যদের পরিচালনা করছিলো অনিল ভট্টাচার্য। এগুতে বাধা দিল ভাড়াটে ব্রিটিশ কমাণ্ডার। মাতঙ্গিনী কিন্তু দুর্বার। তিনি এগিয়ে চললেন দ্বিগুন উৎসাহে গুলি চালাতে আদেশ করলো অনিল ভট্টাচার্য।

পুলিশকে উদ্দেশ্য করে প্রদীপ্ত কণ্ঠে মাতঙ্গিনী যা বলেছিলেন, কোন লেখক এমনিভাবে তার ভাষায় প্রকাশ করেছেন—"তোমরা না এদেশের ছেলে, আমার ছেলে? বিদেশীর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তোমাদের মায়ের দিকে তাকাও, দেশের দিকে ফিরে চাও। পরের গোলামী ছেড়ে দিয়ে এসো, যারা আমাদের গোলাম করেছে তাদের শিক্ষা দিই। দেশের ছেলে তোমরা, এদেশকে তোমরা না বাঁচালে, বাঁচাবে কে? বাছারা দেশের কাজে ফিরে এসো।"

কিন্তু বিদেশীর অন্নে পুষ্ট দর্পী অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধিরা, এই মহাপ্রাণা নারীর অনুরোধে কান দিল না। রক্তের নেশা তাদের পাগল করে তুলেছে। তারা প্রত্যুত্তর দিল গুলীর মুখে।

সৈনিকের গুলী বিদ্ধ করলো বৃদ্ধার দুই হাতে কিন্তু বৃদ্ধার মুষ্টি তো শিথিল হলো না। জাতীয় পতাকা ধূলায় লুটিয়ে পড়লো না—পতাকা, এ যে সমগ্র জাতির হতাশার আশা। নিরুৎসাহের উৎসাহ। বিস্মিত হলো সৈন্যদল। তাই নিরস্ত্র এই বৃদ্ধার ওপর তৃতীয়বার গুলী চালালো। কপাল ভেদ করে গুলী বেরিয়ে গেল এবার। ইংরেজের সকল অমানুষিকতাকে ব্যঙ্গ করেই উড়তে লাগলো পতাকা পাশের কাঁটার বেড়া আশ্রয় করে।

আর বীর রমণী মাতঙ্গিনীর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো ধূলায়। দেহ লুটিয়ে পড়লো, তবু পতাকার সম্মান তিনি রেখে গেলেন।"

আগষ্ট বিপ্লবের ২৯শে সেপ্টেম্বর শুধু মাতঙ্গিনী হাজরা আর রাম বেরা নয়, মোট ১০ জন প্রাণ দিয়েছিলেন ও ২২ জন আহত হয়েছিলেন। মৃত শহীদ ১০ জন হলেন—১। মাতঙ্গিনী হাজরা, ৭৩ গ্রাম, আলিনান ২। উপেন্দ্রনাথ জানা, ২৮ গ্রাম খঞ্চী ৩। পূর্ণচন্দ্র মাইতি, ২৪, গ্রাম ঘাটোয়াল ৪। রামেশ্বর বেরা ৪৫, গ্রাম—কিয়াখালী ৫। বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, ২৫, গ্রাম—নিকাশী ৬। নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, ৩৩, গ্রাম—ঐ ৭। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ১২, গ্রাম—মথুরী ৮। জীবনকৃষ্ণ বেরা, ১৮, গ্রাম—মথুরী ৯। পুরীমাধব প্রামাণিক, ১৩ গ্রাম—দ্বারিবেড়া ১০। ভূষণচন্দ্র জানা, ৩২ গ্রাম—পাইকপাড়া।

বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক সুশীলচন্দ্র ধাড়ার নেতৃত্বে মহিষাদলেও একটি বিরাট দল থানা দখল করতে অগ্রসর হয়েছিলো। তাদের পথরোধ করে এসে দাঁড়ায় মহিষাদল রাজার সশস্ত্র পাঠান-প্রহরীরা রাইফেল নিয়ে। তারা গুলীর পর গুলী করে। পাঁচবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েও সুশীলবাবু নবোদ্যমে পাঁচবারই আক্রমণ চালান। মহিষাদলরাজ সব থেকে বেশী বাধা দেন এবং গুলী চালান। ফলে মহিষাদলে ১৩ জন প্রাণ হারান এবং ৪৩ জন আহত হন। এই ১৩ জন হলেন—১। ভোলানাথ মাইতি—৩৬, বক্সীচক ২। হরিচরণ দাস, ৩২, ঐ ৩। আশুতোষ কুলিয়া, ১৮, মাধবপুর ৪। সুধীরচন্দ্র হাজরা, ২৭, কড়ক ৪। প্রসন্ন কুমার ভূঁইয়া, ৪৪, রাজারামপুর ৬। পঞ্চানন দাস, ৩৯, হরিখালী ৭। দ্বারকানাথ সাহু, ৫৭, তাজপুর ৮। গুণধর হাল্ডেল, ৪০, খাকদা ৯। সুরেন্দ্রনাথ মাইতি, ২৭, সুন্দরা ১১। যোগেন্দ্রনাথ দাস, ৩৫, ঐ ১২। রাখালচন্দ্র সামন্ত, ২৩, ঘাঘরা ১৩। ক্ষুদিরাম বেরা, ৩০, চিংড়িমারি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহিষাদলের আগষ্ট বিপ্লবের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—" ...এই আক্রমণে তিনি সবচেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিলেন, সরকারপুষ্ট মহিষাদলের রাজার কাছ থেকে এবং ধনিক শ্রেণীদের কাছ থেকে। তাই ধনিকশ্রেণীর উপর তাঁর এক বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হয়। জাতীয় সরকার গঠিত হলে তাঁর নির্দেশক্রমে ধনীদের ওপর একটা স্বতন্ত্র কর ধার্য হয়। সুশীলচন্দ্রের চেষ্টায় নতুন করে আবার আজাদ-সরকার গঠিত হয়। এবং ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি এই আজাদ সরকার চলতে থাকে। ইংরেজ-সরকার তাঁর গ্রেফ্‌তারের জন্য পরওয়ানা জারি করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরতে পারে না। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি স্বয়ং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং আজাদ সরকার ভেঙ্গে দেন।

যদিও স্বেচ্ছায় তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তবুও পুলিশ এই দুর্বিনীত বিপ্লবীর শাস্তির বহর এতটুকু কমাবার বাসনা দেখায় না। এই দুর্বিনীত বিপ্লবীকে চরম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয় এবং তার ফলে সাড়ে-সাত বৎসর তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।" পৃঃ ২৭

আগষ্ট আন্দোলন দমন করতে সরকার নারীর উপর যে কিরূপ পাশবিক অত্যাচার করেছিল তা' দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর" প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—" পুলিশের অত্যাচারের নিকট নারী ও শিশু বাদ পড়ে নাই। আসামী গ্রেপ্তার করিবার সন্ধানে আসিয়া পুলিশ বদ্ধগৃহে গহনা-পত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, বহু শত গৃহে পুলিশ আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। নির্য্যাতনের যেদিকটি সবচেয়ে কুৎসিত তাহা হইল নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার। নলিনীকান্ত রাহা নামক জনৈক পুলিশ অফিসারের প্ররোচনায় সৈন্য ও পুলিশ মহিষাদল ও অন্যান্য স্থানে নারীদের ধর্ষিত করে।

এই সমস্ত ধর্ষিতা নারীরা যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা হইতে অত্যাচারের জঘন্য দিকটি আরও বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ এত নির্ম্মম হইয়াছিল যে অন্তসত্বা নারীও তাহাদের কবল হইতে রেহাই পায় নাই। এমন কি পুলিশের বারংবার ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। নারীদের উপর অত্যাচার চালাইয়া বৃটিশ সরকারের পদলেহনকারী দেশীয় লোকেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। মহিষাদলেই ৭৪ জন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়।...ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করিত পুলিশ ও সৈন্যেরা শীতের রাত্রিতে গ্রামবাসীদের পুষ্করিণীতে উলঙ্গ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দিত, উঠিতে চেষ্টা করিলে বেওনেটের খোঁচা দিত, চাবুক দিয়া প্রহার করিত। পুলিশের অফিসারদের রুলের গুতা সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িত। তখন রুলটি মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া সবেগে ঘুরাইয়া দিত। এই অত্যাচারের পদ্ধতিটি আবিষ্কার করিয়াছিল জনৈক ইউরোপীয় অফিসার। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ৬ শত সৈন্য মহিষাদল থানার মাসুড়িয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম ঘেরাও করিয়া গৃহস্থদের বাড়ী আক্রমণ করে ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ঐ দিনেই সৈন্যেরা ৪৬টি নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। মহাত্মা গান্ধী এই সমস্ত ধর্ষিতা নারীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে একটিও ধর্ষিতা নারী পরিত্যক্ত হয় নাই। তাহাদের যথাযথ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা প্রশংসার বিষয়।" পল্লীজীবন পত্রিকা, ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ৪০শ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ। ১৩৬১ সাল, ইংরেজী ১৯৫৪।

এই অধ্যায়ের আমরা আর বেশী বিস্তৃতি করব না। আরম্ভেই বলেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রস্তুত করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের পরিকল্পনা করা ছাড়া কোন মতেই সম্ভব

নয়। পরিশেষে আমরা মেদিনীপুরবাসীদের প্রতি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মহাত্মাজী ও জহরলাল নেহেরু যে পত্র দিয়ে অভিনন্দন করেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করে এই অধ্যায় শেষ করব।

॥ **মহাত্মা গান্ধীর চিঠি** ॥

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের প্রতি

আপনাদের দেশে না যাইয়া যতদূর সম্ভব আমি আপনাদের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছি। আপনারা যেরূপ সাহস ও ধৈর্য সহকারে নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানইতেছি। এইরূপ সহিষ্ণুতার ফলেই নবজীবনসম্পন্ন নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। বৈষয়িক সম্পত্তির দ্বারা পরাধীনতার ক্ষতিপূরণ হয় না। অতীব আনন্দের কথা এই যে, আপনারা স্বাধীনতা ত্যাগ না করিয়া বৈষয়িক সম্পত্তি ত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। আশা করি, আপনারা লবণ তৈয়ার কর্তব্য বিস্মৃত হইবেন না।

এম, কে, গান্ধী

এলাহাবাদ ২-২-৩

মেদিনীপুর সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলালের চিঠি

স্বাধীনতা আমরা একদিন লাভ করিবই—তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রামের ধূলিজাল যখন বিদূরিত হইবে, তখন আমরা অনেক ছোটখাটো ঘটনার কথা ভুলিয়া যাইব কিন্তু ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ ভারতের নারীরা যে বীরত্ব ও ত্যাগ দেখাইয়াছেন, আমরা কদাপি সেই বীরত্ব ও ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণগুলি ভুলিতে পারিব না। এবং মেদিনীপুর জেলায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারিব না।

এলাহাবাদ, জওহরলাল নেহেরু

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

১৩৩৮ সালের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এই দু'টি পত্র সংগ্রহ করে দেওয়া হোল। পৃষ্ঠাঃ ১৮১ ও ১৮২।

দশম অধ্যায়

তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর, একথা আমি এই পুস্তকের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমি তমলুক ও এর আশপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর কথা আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করে আসছি, তা' যে মিথ্যে নয় একথা প্রমাণিত হবে। তৎকালে তাম্রলিপ্তের সাথে যোগাযোগ ছিল সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত। রোম, গ্রীস, ইরাণ, মিশর-এর সাথে ত এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ অপ্রতিহত ছিলই। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলে রাখছি যে সব নিদর্শন ও আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করব, তার অনেকগুলিই আজো তমলুক ও তার আশপাশের গ্রাম সমূহে বর্তমান আছে এবং সেগুলি উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তাম্রলিপ্তে যেসব প্রাচীন নিদর্শন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তার সর্বপ্রথম উল্লেখ আমি যেখান থেকে পেয়েছি, তা' এইস্থানে উদ্ধৃত করছি। তৎকালের বিখ্যাত মাসিক "সাহিত্য" পত্রিকায় "প্রাচীন তাম্রলিপ্ত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা আছে—

"১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রূপনারায়ণ পূর্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হয়। সেই সময় ভূগর্ভ হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্তি (Terra cotta) বাহির হইয়াছিল। সে সকল স্থানীয়

পাঠাগারে সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার উইল্‌সন ও মহকুমার প্রধান কর্মচারী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার মধ্যে কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সচ্ছিদ্র, সে সকলের উপর কিছুই লিখিত ছিল না—কেবল পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এই সকল মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটি বৃহৎ সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তরাজগণের সময়ের—তাহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। গুপ্তরাজারা লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ও কলিকাতায় অন্য অনেক প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ একটি ক্ষুদ্রতর স্বর্ণমুদ্রায় লিখিত অক্ষর গুলি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে মোগল সম্রাটদিগের সময়ের কতকগুলি মুদ্রাও ছিল। আরঙ্গজীব তাম্রলিপ্ত নগরে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাও এখন নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

সেই সময় যে সকল মৃৎমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে একটি মারের—মার বৌদ্ধদিগের মতে কতকটা খ্রীষ্টানদিগের শয়তানের মত; একটি বুদ্ধ জননী মায়াদেবীর—হস্তিদন্তের আকারে বুদ্ধদেব ইহারই গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বুদ্ধ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে, বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃহত্যাগী মন সংসারে বদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে যে সকল বিলাস চতুরা সুন্দরী দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যেও দুই জনের মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল।” পৃঃ ৪৩০, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১৩০৪।

উপরে আমরা যে অংশটি উদ্ধৃত করলাম, এই অংশটি ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল গুপ্তের “প্রাচীন তাম্রলিপ্ত” প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অংশ। ‘সাহিত্য’ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এটি সংক্ষিপ্ত

আকারে প্রকাশ করেছিলেন। উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত যে সচ্ছিদ্র মুদ্রাগুলির উল্লেখ লেখক করেছেন, কোন কোন ঐতিহাসিক ঐ মুদ্রাগুলিকে তমলুকের আদিম রাজাদের বলে অনুমান করেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—"সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রুত সংঘর্ষ হইয়াছিল।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ১১০১।

এছাড়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র কতকগুলি "পুরাণ" নামক মুদ্রা তমলুকে পেয়েছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রাগুলি বহু প্রাচীন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তমলুকে সম্রাট কণিষ্কের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। "এছাড়া কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্ত-রাজন্যের মুদ্রা দেখিলে তমলুকের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ১১০২।

তমলুকে আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব লিখেছেন,—"তমোলুক যে বৌদ্ধ বন্দর ছিল, তাহার আজ পর্যন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়; এবং জনৈক ইউরোপীয়ান্ কর্মচারী ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন যে 'তমলুক বাস্তবিকই বৌদ্ধ বন্দর ও তথায় পূর্ব্বাঞ্চলের বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল, এবং অনেক সুন্দর মঠ ছিল।'[১]

তমোলুক ইতিহাস লেখক ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় তাঁর ইতিহাসে একস্থানে লিখেছেন—"বাস্তবিকই নদের ভাঙ্গনে ও পুষ্করিণ্যাদি খনন কালে ১০।১৫ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে বহুসংখ্যক কূপ, প্রস্তর নির্মিত ভগ্নবিশিষ্ট স্তম্ভাদি বৌদ্ধদিগের সমকালীন প্রাচীন স্বর্ণ,

১ "—Even at this day the ancient Buddhist port (Tamluk) bears traces of its origin. In 1781 an English official reported to Government, 'that Tumluk was originally a Buddhist town and a large emporium of eastern trades and had many fine monasteries.'—Mr. Vansittart's report, Mr. H. Y. Baybey's M. S. Memorandum, P. 128. O. R.—Hunter's orissa. Vol. I. P. 310

রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এবং মৃত্তিকা নির্মিত বুদ্ধদেবের ও তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রতিমূর্তি আদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ইহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। ঐ সকল মুদ্রা (coins) এসিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরীক্ষায় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ-রাজাদের মুদ্রা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বেহাটের (Behat) মুদ্রার অনুরূপ।" [১] পৃঃ ৬৮

নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধ কুমার ভৌমিক মহাশয় তাঁর রচিত "মেদিনীপুর কাহিনী" পুস্তকে "অবলুপ্ত তাম্রলিপ্ত" প্রবন্ধে আর একটি বৌদ্ধযুগের মৃৎফলক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সে কাহিনীটি তাঁর কথাতেই প্রকাশ করছি—একটি বিশেষ পোড়ামাটির ফলকে প্রকাণ্ড গাছের ছবির সঙ্গে আছে চারটি বিরাট হাতী আর গাছের উপর আছে দু'টি বাঁদর; জাতকের কাহিনীর এ এক মূর্ত অভিব্যক্তি ঃ

এক সময় বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের পাশে গভীর বনে ছয় দাঁত-ওয়ালা বিরাট এক শ্বেতহস্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দাঁতের আধিক্যে আর চেহারার গুণে ঐ অঞ্চলের সমস্ত হাতীগুলোর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব করার সুযোগ ঘটে। ঐ সময় বোধিসত্ত্বের দু'জন স্ত্রী ছিল—একজনের নাম মহাসুভদ্দা অন্যজনের নাম চুল্লসুভদ্দা। দু'জন স্ত্রীকে বোধিসত্ত্ব খুব ভালবাসতেন। দু'সতীনেও ছিল বেশ ভাব—কিন্তু শেষে কোন কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হ'ল। ছোট স্ত্রী চুল্লসুভদ্দার ধারণা হ'ল, 'স্বামী বুঝি বড় স্ত্রী অর্থাৎ মহাসুভদ্দাকে বেশী ভালবাসেন।' এই সন্দেহে তার মনে অকারণ খেদ জন্মাল—নষ্ট হয়ে গেল তার স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, ভক্তি আর শ্রদ্ধা। কিভাবে স্বামীর উপর প্রতিহিংসা নেওয়া যায়

[১] From the proceedings, Asiatic Society of Bengal, for August, 1882.

এই ভেবে চিন্তে সে সারা হ'ল। শেষে একদিন সে মারা গেল। পরের জন্মে সে এক অপূর্ব সুন্দরা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। কাশীরাজের সঙ্গে তার হ'ল বিবাহ। চুল্লসুভদ্দা এখন কাশীরাজের রাণী। বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপে, তার গত জন্মের অনুশোচনার প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টায় সে একদিন এক দুর্দান্ত ব্যাধকে ডেকে পাঠাল—'তাকে যেতে হবে হিমালয়ের পাদদেশের গভীর অরণ্যে —সেই শ্বেতহস্তীকে বধ করে তার উজ্জ্বল ছয়টি দাঁত আনতে। তার হাতে দিল ধারাল করাত যাতে করে সে দাঁতগুলো কাটবে।'

রাণীর আদেশ। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে ব্যাধ ছুটল ঐ গভীর জঙ্গলে—সঙ্গে তীর-ধনুক, আর দাঁত কাটার জন্য করাত। অপূর্ব শ্বেতহস্তী দেখে ব্যাধ বিমুগ্ধ হ'ল—কিন্তু কি বা তার উপায়? তাকে ঐ দেবোপম হস্তীকে বধ করে তার ঐ সুন্দর ছয়টি দাঁতকে কেটে নিয়ে যেতে হবে রাণীকে দেওয়ার জন্য। অনেক চিন্তা করে ব্যাধ শেষে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করল ঐ হাতীর উদ্দেশ্যে। শরাহত হাতী একবার চেয়ে দেখল—দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যাধ, হাতে করাত আর তীর-ধনুক। ইচ্ছা করলে সে ঐ ব্যাধকে শুঁড়ে তুলে আঘাত করতে পারত। কিন্তু ব্যাধের গায়ে ছিল সন্ন্যাসীর পবিত্র গৈরিক বস্ত্র। হাতীটি নিরস্ত হ'ল। সে ধীরে ধীরে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে। ব্যাধ অকপটে সব কথাই খুলে বলে। রাণীর আদেশে বাধ্য হয়ে তাকে একাজ করতে হয়েছে। তখন ধীরে ধীরে বোধিসত্ত্বের চুল্লসুভদ্দার কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল তার বাসনাকে—তার প্রতিহিংসাকে। প্রতিহিংসার জন্যেই ত সে আজ কাশীরাজের রাণী। আর ব্যাধের হাতে এই তীক্ষ্ণ করাত। ব্যাধের অবস্থা দেখে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়ে করাতটা চেয়ে নিলে— তারপর ধীরে ধীরে একের পর এক সবগুলি দাঁতই কেটে দিলে ব্যাধের হাতে। হাতীর মৃত্যু হ'ল সেখানে। অবাক বিস্ময়ে ব্যাধ চেয়ে থাকে—তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

মহারাণীর হাতে দাঁতগুলো দিয়ে ব্যাধ দূরে দাঁড়ায়। রাণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল অতীত জন্মের কথা—মনে পড়ল তার বোধিসত্ত্বকে—তার ভালবাসা-প্রেম-স্মৃতিকে। ব্যাধ ধীরে ধীরে সব কথাই খুলে বলে—কেমন করে সে গৈরিক বস্ত্র পরে হাতীকে প্রতারিত ক'রে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছে, কেমন করে মৃত্যুপথ-যাত্রী শ্বেতহস্তী শুঁড়ের সাহায্যে ব্যাধের হাতের করাত কেড়ে নিয়ে এক এক করে ছয়টি দাঁত কেটে দিয়েছে। তারপর, রাণী আর ঠিক থাকতে পারলে না তাঁর হু'চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়ে—শেষে তিনিও গড়িয়ে পড়লেন সিংহাসনে।

এইখানেই কাহিনীর শেষ।

তমলুকে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে সেই ছ'দাঁতওয়ালা হাতীর করুণ আত্মবিসর্জনের ছবি মূর্ত হয়ে রয়েছে—ঠিক অনুরূপ এক ছবি আছে সাঁচি স্তূপে। পৃঃ ২২—২৫

প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ও অনুসন্ধানীদের গবেষণা কার্যের সুবিধার্থে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ব সার্কেলের পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে বর্তমান তমলুক সহরের নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে খনন কার্য চালান হয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি-সংস্কৃতির বহু লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

হু'মাস ধরে খনন কাজ চালানোর ফলে তমলুকে নিওলিথিক যুগের প্রস্তর নির্মিত নানাপ্রকার দ্রব্য, মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির নানাবিধ জিনিষ, ঢালাই করা তামার মুদ্রা, বিচিত্র খোলামকুচি, মূল্যবান প্রস্তরের বিভিন্ন রকমের গুটিকা, নানাপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, দেশী বিদেশী নানাপ্রকার মৃৎপাত্র, খেলনা, জীবজন্তুর মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

গৌরবময় তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে কিরূপ ছিল তার কিছুটা পরিচয় এই সকল দ্রব্য থেকে জানা যাবে।

এই খননের ফলে একটি মাত্র গহ্বর থেকে প্রাচীনতম যুগের কিছু

পরিচয় পাওয়া গেছে। ঐ যুগের অবসান ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। বুঝা যায় যে, সে যুগে আধাপোড়া মাটির ও প্রস্তরের দ্রব্য ব্যবহৃত হোত।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে মৌর্য ও সুঙ্গ যুগ। উহা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই যুগে সুন্দর সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোড়ামাটির দ্রব্য ও মূর্তি ব্যবহৃত হোত। মৌর্যযুগে যে উৎকৃষ্ট কাল পালিশ করা দ্রব্য ব্যবহৃত হোত তার সাথে ঐগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুঙ্গ যুগের শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তার চমৎকার নিদর্শন হচ্ছে ঐ সব পোড়া মাটির দ্রব্য। এ পর্যন্ত ভারতে যেসব উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির দ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলির তুলনায় ঐ সকল দ্রব্যের কয়েকটি কোনক্রমে হীন নহে, বরং অনেকাংশে সমতুল্য। দুটি পরিখার মধ্যে যে কয়েকটি তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি এই দ্বিতীয় যুগের বলে অনুমিত হয়।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির তৃতীয় যুগ হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ। এই যুগে তাম্রলিপ্তি বন্দরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্য সাগরীয় দেশ সমূহের সাথে ভারতের বাণিজ্য চলত। এই যুগে রোম দেশীয় কতকগুলি বন্দুক খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হোত। তমলুকে খননের সময় এই বন্দুক প্রচুর পাওয়া গেছে। রোম দেশীয় একটি পিচকারীও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমান তমলুক সহরের দক্ষিণাঞ্চলের দু'টি পরিখা খনন করে জানা যায় যে, সেখানে খ্রীষ্টযুগে লোকে বসবাস আরম্ভ করে এবং অনুমান হয় এই যুগে তাম্রলিপ্তির দক্ষিণাঞ্চলে নূতন উপকণ্ঠ গড়ে উঠেছিল। একটি পরিখায় পাকা ঘাটযুক্ত পুষ্করিণী এবং আর একটি পরিখায় একটি কূপ ও গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই যুগে মূল্যবান প্রস্তরের জপমালা ব্যবহৃত হোত।

তাম্রলিপ্ত সংস্কৃতির চতুর্থ যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর যেসব পোড়ামাটির

দ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলিতে কুষাণ ও গুপ্তপ্রভাব রয়েছে। একটি চমৎকার পোড়ামাটির মূর্তির শুধু নিম্নাংশ পাওয়া গেছে। এর গঠন সৌন্দর্য মনোরম। এখানকার গুপ্তযুগের পরবর্তী ইতিহাস সন্ধান করা অসুবিধাজনক।

তাম্রলিপ্তির প্রথম যুগের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি পুষ্করিণী খননের ফলে সে যুগের নিদর্শনগুলি আর পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় লোকেরা পুষ্করিণী খননকালে পাল ও সেন ভাস্কর্যের যে সব নির্দেশ বিক্ষিপ্তভাবে পাচ্ছেন, তা থেকে অজ্ঞাত যুগের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শেষ যুগের (অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর) ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐ যুগের নানা তথ্য জানা যায়। এইযুগে স্থানীয় রাজা ও লবণ কারখানার মালিকগণ অনেকগুলি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বর্তমান তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সম্বন্ধে এই হোল সরকারী রিপোর্ট। ১৩৬২ সালের 'হিমাদ্রী' ও "নীহার" পত্রিকা থেকে এইসব অংশ সম্পাদিত হোল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নিদর্শনের কোন ফটো জনপ্রিয় পত্রিকা সমূহে আজো প্রকাশিত হয়নি। যদি কোন রসিক পাঠক এগুলি দেখতে চান, তা' হলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। পূর্ব সার্কেলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত আছে। এই বিভাগ থেকে যতদূর জানি আজ পর্যন্ত কোন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়নি বা গবেষণার সূত্রপাতও করা হয়নি। পরিতাপের বিষয় এই তমলুকের অধিবাসীগণকে এইসব নিদর্শন দেখানোরও বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত তখন করা হয়নি।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে যাঁর গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি ১৩৬০ সালের দিকে এসেছিলেন "তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে" অধ্যাপনা করার জন্য। সেই সময় তিনি বর্তমান তমলুক ও এর আশপাশের

বিভিন্ন স্থানে নিজে যেয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে নূতন আলোকপাত হয়েছে। তাঁর আবিষ্কার একদিকে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি তথ্যবহুল। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টির ফলে সামান্য পোড়ামাটির মূর্তিটিও বিরাট ইতিহাস বহন করে এনেছে। আর সেই সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, বাংলার সুপ্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত আজ মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ভূগর্ভে নিহিত।

তিনি অসংখ্য প্রাচীন মৃন্ময়মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সব মূর্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এই মূর্তিসমূহের অধিকাংশই পোড়ামাটির (terracotta) এবং কয়েকটি কাঁচা মাটির (clay)। এইগুলি দেখলে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের শিল্পকলা কতদূর উৎকর্ষলাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে এই বন্দরে যে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম এবং অনুভূতিপ্রবণ সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতের খুব কমস্থানেই এই ধরনের সভ্যতার তুলনা মেলে।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত কয়েকটি নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

"যক্ষিণী—শুঙ্গযুগ। ভগ্নমূর্তিদ্বয়ের সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিমুখ বিশিষ্ট মূর্তি। সম্ভবতঃ কোন বৃহৎ মৃৎকুম্ভের মুখাবরণী। মূর্তির যুগল মস্তকে রোমানধরণের শিরস্ত্রাণ পরা। মূর্তিটি দ্বিমুখ বিশিষ্ট প্রাচীন রোমান যুদ্ধদেবতা জানুসের (Janus) অনুরূপ। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন মিশর, গ্রীস, এবং রোমের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মূর্তিটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১ম থেকে ২য় শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি। মূর্তির আঙ্গিক বিচারে মনে হয় কোন শক যোদ্ধার

প্রতিমূর্তি। যোদ্ধার বলিষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ আকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপবিষ্ট গ্রীক মূর্তি। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম—২য় শতাব্দী। চতুষ্কোণ মৃৎফলক। মৌর্যযুগ। চিত্রের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ কোন পৌরাণিক (হিন্দু অথবা বৌদ্ধ) অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান।" যুগান্তর, ১০ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬০।

এই মূর্তিগুলির উপর দাশগুপ্ত মশাই যে আলোচনা করেছেন, তা' এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন। এই আলোচনা থেকে তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক প্রাচীন উল্লেখের সত্যতা প্রমাণিত হয়। "তাম্রলিপ্তের শিল্পবস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এককালে এই বন্দর যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলনভূমি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তমলুকের বৈদেশিক মূর্তিগুলি প্রমাণ করছে যে, প্রাচীন বাংলার সংগে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বৈদেশিক সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিক বন্দরের যে বিপুল খ্যাতির কথা জানতে পারি তারই পরিপূর্ণ সমর্থন করে তমলুকের অসংখ্য প্রত্নবস্তু। প্রাচীন বাঙালী নাবিকগণের সপ্তসাগর অতিক্রমের কথা আজ অলীক কল্পনা মাত্র নয়। প্রায় দুই হাজার বছর আগে বাঙলার সঙ্গে সুদূর ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, তা' আজ নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তমলুকের পোড়ামাটির মূর্তি ও মৃৎপাত্র সমূহ বিভিন্ন যুগে নির্মিত। শিলারীতির বিচারে এইগুলিকে মৌর্যপূর্ব যুগ, মৌর্যযুগ, শুঙ্গযুগ, কান্ব-সাতবাহন যুগ, কুষাণযুগ, গুপ্তযুগ, পালযুগ এবং মধ্য-যুগের নির্দেশ করা হয়েছে। মৃন্ময় মনুষ্য—মূর্তিসমূহের মধুর লালিত্য এবং সূক্ষ্মভাব-মাধুর্য সহজেই লক্ষণীয়। তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি প্রাচীন বাঙালীর অতুলনীয় সংস্কৃতি গরিমাকেই প্রমাণিত করে। এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমকালীন উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা

থেকে কতকটা ভিন্ন।......বহু হারানো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই রূপনারায়ণ নদীর উপত্যকায়। প্রাচীন ট্রয়, ক্রীট, বোখাস্‌কোই এবং বাবিলনের মত হয়ত এরও তথ্য লিখিত হবে স্বর্ণাক্ষরে।" যুগান্তর, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬০।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারা সুপ্রাচীন পুণ্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়) এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) থেকে এমন কয়েকটি আদিম আঙ্গিকাবিশিষ্ট মৃন্ময় মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সৃষ্টিকাল মৌর্যপূর্ব যুগ বলে মনে করা হয়। তমলুকের দু'টি ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্তির বিচিত্র শিলাশৈলী সহজেই আমাদের উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুল্লির এক শ্রেণীর প্রাগৈতিহাসিক পোড়ামাটির মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৌর্যশুঙ্গ যুগ এবং তৎপরবর্তী কালে বাংলার উৎকৃষ্ট শিল্প-রীতির অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানগড়, বানগড়, তমলুক, তিলদা, (মেদিনীপুর), পোখরান ইত্যাদি স্থানে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপটি সম্ভবত প্রাচীন যবদ্বীপের লোরো জোংগ্রাং, চণ্ডি সেবু এবং বোরোবুদরের বৌদ্ধ হর্মরাজির গঠন পদ্ধতিকে প্রভান্বিত করেছিল।

তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটির মূর্তিসমূহ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এইখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের মূর্তি এবং মৃৎপাত্রসমূহ প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্টই আলোকপাত করেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আবিষ্কৃত গ্রীক, রোমান্‌ এবং মিশরীয় ধরণের শিল্পবস্তু সমূহ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করবে যে, স্মরণাতীত যুগে বাংলার সঙ্গে বহির্ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সমুদ্রপথে এই ধরণের ব্যাপক যোগাযোগের দৃষ্টান্ত ভারতের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না।

সম্প্রতি তমলুকের এগার মাইল দূরবর্তী রঘুনাথবাড়ি গ্রাম থেকে বড় আকারের দু'টি বিচিত্র পোড়ামাটির মনুষ্য-মূর্তি আবিষ্কৃত

হয়েছে। মূর্তি দু'টির মুখগহ্বর উন্মুক্ত, নাসিকা উন্নত। ললাট থেকে বিস্তৃত। এবং মূর্তির শিরোভূষণ অতিশয় উল্লেখযোগ্য, কারণ এর আকৃতি তালপত্রের ন্যায় বৃত্তাকার। রঘুনাথবাড়ির মূর্তিদ্বয়ের সঙ্গে সুদূর মধ্য-আমেরিকার আজটেক মূর্তির অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য এই সাদৃশ্যের দ্বারা কোনরূপ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও সম্ভব নয়। বিস্মৃত বঙ্গের কাহিনী, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৬২

রঘুনাথবাড়ীতে আবিষ্কৃত আদিম আঙ্গিকাবিশিষ্ট এই যে প্রাচীন মনুষ্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যার সাথে মধ্য-আমেরিকার আজটেক মূর্তির সাদৃশ্য আছে—এটি বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই পুস্তকে পূর্বেই বলেছি যে, বাংলার সাথে সুদূর আমেরিকার বাণিজ্যিক যোগাযোগও বর্তমান ছিল। এ সম্পর্কে টিটিকাকা হ্রদের নিকট আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সাথে বিশেষ সাদৃশ্য আছে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির। সেখানে গণেশমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব রঘুনাথবাড়িতে আবিষ্কৃত এই মূর্তিটি থেকে যদি অনুমান করি যে, এককালে তাম্রলিপ্তের সাথে সুদূর আমেরিকারও বাণিজ্যিক যোগাযোগ হয়েছিল, তা'হলে কি অন্যায় হবে সে অনুমান। তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল সুবৃহৎ। এ কথা হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। রঘুনাথবাড়ি ছিল এককালে প্রাচীন গৌরী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর ধারেই ছিল কাশীজোড়া রাজ্যের রাজধানী হরশঙ্কর। এখনো কাশীজোড়া রাজার অনেক কীর্তি কাহিনী ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সুন্দরনগর গ্রামের আশপাশে দেখা যায়। কাশীজোড়া এককালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সামন্ত রাজ্য ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে তমলুকের সামন্ত রাজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব। গৌরী নদী ছিল

বর্তমান তমলুক শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এবং এটি কংসাবতীর একটি শাখা। রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাম্রলিপ্তের কাছেই। অতএব প্রাচীন তাম্রলিপ্ত থেকে যে এই সব মূর্তি কাশীজোড়া রাজ্যে এসেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাশীজোড়ার নাম ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর "শীতলামঙ্গলে" পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমি "তাম্রলিপ্তের সাহিত্য ও সাহিত্যিক" অংশে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। এছাড়া রঘুনাথবাড়ির আশপাশের গ্রামে আজো অনুসন্ধান করলে এরূপ বহু পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'তমলুকের নিকটবর্তী তিলদায় সম্প্রতি এক আশ্চর্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি পোড়ামাটির ক্ষুদ্র মৃৎ-ফলকে অঙ্কিত আছে কয়েকটি হেলেনীয় অক্ষর। একজন বৈদেশিক পণ্ডিত এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন "EURUEON", অর্থাৎ 'প্রত্যূষের পূর্বের বাতাস।' কে জানে কোন প্রাচীন হেলেনীয় নাবিক তার নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার জন্য কোন দেবালয়ে এইভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল কিনা! লিপির পাঠ যদি সত্যই "EURUEON" হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক নাবিক হিপ্পালাস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত ভারত মহাসাগরের মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে। মৌসুমী বায়ু আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই হেলেনীয় বণিকদের পক্ষে ভারতীয় বন্দরসমূহে পদার্পণ করা সম্ভব হয়েছিল। তিলদায় প্রাপ্ত মৃন্ময় গ্রীক অনুশাসনটি সমগ্র ভারতে একক। এই ধরণের পুরাবস্তু সম্ভবত ভারতের আর কোনও স্থানে ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। মহাস্থানগড়, বাণগড়, ময়নামতী, পোখরান, তাম্রলিপ্ত, তিলদা, রঘুনাথবাড়ী ইত্যাদি নানাস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে উপলব্ধি করা গিয়াছে যে, বাঙালীর প্রকৃত ইতিবৃত্ত রচনা করতে হলে বহু অবজ্ঞাত স্থানে বিজ্ঞান সম্মত

ভাবে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং খননকার্য চালান প্রয়োজন।' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৬২।

তিলদা অতি প্রাচীন গ্রাম। এককালে এইস্থান গভীর সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল। পরে স্থলভাগ জেগে উঠে। তিলুদহ বা তৈলদহ থেকে অপভ্রংশ হয়ে তিলদাতে পরিণত হয়েছে। তিলদায় ময়না রাজাদের প্রাচীন গড় ছিল। এককালে ময়না রাজ্যও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত হোত। যথাস্থানেই এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে। মোহনা থেকেই ময়না রাজ্যের উৎপত্তি। যাই হোক এই তিলদা ময়না থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তিলদা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। জলচক গ্রামটিই বড়। এই গ্রামে অনেক বড় বড় দীঘি আছে। দীঘির নামগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন—মাধবসাগর, দরপাসাগর, সখীপুকুর, খেজুরিয়া পুকুর, রামভদ্রা, নাটেশ্বরী, স্বর্ণচারা, দেউলপুকুর ইত্যাদি। তিলদা গ্রামে এছাড়া আরো বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অধ্যাপক দাশগুপ্ত মশাই আবিষ্কার করেছেন। সেগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এছাড়া বহু সুবর্ণ মুদ্রাও উক্ত গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকগুলি সুবর্ণমুদ্রা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্বর্ণকার শশী পোদ্দার কিনে গালিয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন। তিলদার রামচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে আজো একটি রজত মুদ্রা গচ্ছিত আছে। এই মুদ্রাটিকে ভ্রমবশতঃ তারা রামচন্দ্রের মুদ্রা মনে করে সিংহাসনে রেখে নিত্য পূজা করেন। মুদ্রাটির একপাশে ধনুর্বাণ হস্তে সমুদ্রগুপ্তের মূর্তি অঙ্কিত আছে। অপর পার্শ্বে পদ্মের উপর লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়ান মূর্তিটির পাশে কয়েকটি লিপি খোদাই করা আছে। অপর পার্শ্বেও দু'তিনটি অক্ষর আছে নীচের দিকে। অক্ষরগুলির লেখার ছাঁদ দেখে মনে হয় "ব্রাহ্মী অক্ষর।" মুদ্রার সীমারেখায় যে অক্ষরগুলি খোদিত আছে, সেগুলি বড় অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। বাম পায়ের নীচে

যে ৩|৪টি অক্ষর মুদ্রিত আছে তা' খুব সম্ভবত ফ-ব-চ-ঃ কিংবা গ-ব-চ। ঠিক অনুরূপ একটি স্বুবর্ণ মুদ্রা দাশগুপ্ত মশাইও আবিষ্কার করেছেন। এই প্রসংগে তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করে উদ্ধৃত করছি।

"সুবর্ণ মুদ্রা। গুপ্তযুগ। প্রথম পৃষ্ঠে (obverse) গরুড়ধ্বজের সম্মুখে ধনুর্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রাজমূর্তি। রাজার বামহস্তের নিম্নে কয়েকটি 'ব্রাহ্মী অক্ষর'। বর্তমান লেখকের পাঠ-অনুযায়ী অক্ষর কয়েকটি 'গ-ব-চ' অথবা 'গো-ব-চ'। মুদ্রার বিপরীত পৃষ্ঠে (Reverse) প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীনা দেবী (লক্ষ্মী) মূর্তি। দেবীর পশ্চাতে প্রভা মণ্ডল (Nimbus) এবং হস্তে পদ্মের লীলায়িত মৃণাল। মুদ্রার সীমারেখায় কয়েকটি অতি অস্পষ্ট অক্ষরের সমাবেশ।

বর্তমান স্বর্ণমুদ্রার শিল্পশৈলী দেখে মনে হয় যে এইটি গুপ্তসম্রাট বুধগুপ্তের (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) অনতিকাল পরে অঙ্কিত হয়েছিল। মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠের পাঠোদ্ধার যদি সঠিক হয় তবে হয়ত এইটিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজা গোপচন্দ্র কর্তৃক অঙ্কিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। গোপচন্দ্রের নাম আমরা জানতে পারি ফরিদপুর এবং মল্লসাবল-এ (বর্ধমান জেলা) প্রাপ্ত তুইটি অনুশাসন থেকে।[১] বর্তমানে আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রাটি যদি সত্যই গোপচন্দ্রের হয় তা'হলে এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কারণ, ইতিপূর্বে এই রাজার অন্য কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি।" দেশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১।

---

১ B. C. Sen : Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengel," P. P. 249 ff. দ্রষ্টব্য।

গোপচন্দ্র আনুমানিক ৫২৫ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এই গ্রামে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৃৎপাত্রের টুকরা আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি যুগল নরনারীর মিথুন-মূর্তি বিশিষ্ট একটি মৃৎপাত্রের টুক্‌রা। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী। এই ধরণের মৃৎপাত্র সমগ্র ভারতে একক। মূর্তিদ্বয়ের বস্ত্রের কুঞ্চন সমূহ সমসাময়িক প্রস্তরমূর্তি সমূহের অনুরূপ শিল্পশৈলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মিথুন-মূর্তির সংগে প্রায় সমসাময়িক যুগে নির্মিত পাহাড়পুরের যুগল মূর্তির কতকটা সাদৃশ্য আছে।

তমলুকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর কিছু নিদর্শন আছে রাজবাড়ীতে। এগুলি সংগ্রহ করেছেন স্বর্গীয় ষড়েন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র সুব্রত কুমার রায় মহাশয়। তাঁর সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে ভগ্ন অশোক-চক্র, মাটির খেলার মেষ, খেলার গাড়ী, মৃৎ নির্মিত সিংহের ভগ্ন নিম্নদেশ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মাটির খেলার মেষটি খুব সম্ভবত মৌর্য অথবা সুঙ্গ যুগের। তাম্রলিপ্তের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যুগে সুন্দর সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপুর্ণ পোড়ামাটির খেলনা ও মূর্তি ব্যবহৃত হোত, ভগ্ন অশোক চক্রটির গঠন বিশেষ লক্ষনীয়। খুব সম্ভবত এই চক্রটি খেলার পোড়া মাটির গাড়ীতে চাকা হিসেবে ব্যবহৃত হোত। আর একটি প্যাঁচ কাটা সংরক্ষিত জলাধারের অংশ বিশেষের ছবিও এই পুস্তকে মুদ্রিত হোল। এই পাত্রটির গঠন প্রণালী দেখে মনে হয়, প্রাচীনকালে থার্মফ্লাক্স জাতীয় মাটির পাত্র ও ব্যবহৃত হোত। তমলুকে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই পোড়ামাটির। মাটির দ্বারা তৎকালের অধিবাসীগণ এমন সব জিনিস নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা দেখলে ও গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। মাটি দিয়ে তাঁরা পাথরের অভাব ভুলে ছিলেন। মৃৎপাত্রগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মৃৎপাত্র আছে, যেগুলিকে দু'বার পোড়ান হয়েছে এবং পর পর দু'বার পোঁচ দিয়ে অন্দুর প্রতি অন্দুর ফাঁক মেটান হয়েছে। এই শ্রেণীর

মৃৎপাত্র প্রথম তৈরী করে তাকে রোদে অল্প মাত্রায় শুকনো করে একবার আগুনে ধীরে ধীরে রস শুকিয়ে আধপোড়া করা হোত। তারপর বিশেষ ধরণের সমুদ্রোপকূলের পলিমাটির স্তরকে ছেঁকে পুরু করে সেই পুরু গোলা মাটি পাত্রের উপরে বেশ মসৃণ করে প্রলেপ দেওয়া হোত। তারপর আবার তাকে আধ ছায়া ও কখন বা কড়া রোদে শুকিয়ে পুনরায় পোড়ান হোত। এই প্রক্রিয়াতে নির্মিত পাত্র যেমন সুন্দর হোত তেমনি উত্তম বলেও তৎকালে বিবেচিত হোত। এই বিশেষ ধরণের পাত্রগুলিতে সাধারণত জলীয় পদার্থ রাখা চলত। কলসী, গাড়ু, গ্লাস প্রভৃতি পাত্র এই শ্রেণীর নির্মিত। লম্বা ও উপরে নীচে বিশেষ ধরণের সংকীর্ণ গোলত্বের ব্যবধানে ঠিক থার্ম ফ্লাস্ক জাতীয় এক প্রকারের পাত্র আছে। এগুলির নির্মাণ প্রণালী ও উপরিউক্ত প্রক্রিয়াতে সম্পাদিত। গ্রীস দেশে প্রাপ্ত অনুরূপ পাত্রের সাথে এই পাত্রগুলির বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়।

আর এক শ্রেণীর কালো মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে। এগুলি নির্মাণ পারিপাট্যে বিশেষ উন্নত নয়। তমলুকের উকিল শ্রীযুত প্রবোধ নায়ক মহাশয় তাঁর বাড়ীতে একটি কূপ খনন কালে ২২ ফুট নীচে কয়েকটি উল্লিখিত ধরণের মৃৎপাত্র পেয়েছেন। আর একটি পোড়ামাটির বিশেষ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান যক্ষিণী মূর্তির ভগ্নাংশও তাঁর কাছে আছে। এই মূর্তিটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর বলে অনুমতি হয়।

আর এক শ্রেণীর মাটির হাঁড়ি পেয়েছি। এই হাঁড়ি বা জালাটির নিম্নাংশ ঠিক লাটুর মত। দেখলেই ভাবতে হবে এই সুঁচালো জালাটিকে কেমন ভাবে বসিয়ে রাখা হোত। কিন্তু ঠিক অনুরূপ ধরণের জালা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এই জালাগুলিকে তখন মাটিতে বিড়ার পরিবর্তে গর্ত করে রাখা হোত। মৃৎপাত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা

করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে এগুলি মৃৎপাত্র নির্মাণের প্রথম যুগে তৈরী। এইরূপ মৃৎপাত্র সম্পর্কে একটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি—"মাটির বড় বড় জালাগুলির তলা লাট্টুর মত ক্রমশঃ সুরু হইয়া গিয়াছে।...একটা বাড়ীতে দেখিলাম বড় একটি ঘরের মেঝেতে গামলার ধরণের গর্ত করিয়া ইট দিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। গর্তের কেন্দ্রগুলি সরু, পরিধির দিকে বেশ চওড়া। এইগুলি জালা বসাইবার জায়গা তাহা বোঝা যায়।" প্রবাসী, ৩১ শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৮।

তৎকালে শুধু জালা নয় ছোট ছোট হাঁড়ি, কলসিরও নিম্নাংশ অনুরূপ ভাবে লাটিমের মত করে তৈরী হোত এবং সেগুলি রাখার জন্য একটি পৃথক ঘরে ছোট ছোট গোল গর্ত করে তাতেই বসান থাকত। এই মৃৎপাত্রটি তমলুক পদুমবসান অঞ্চলে একটি খাদ কাটার সময় পাওয়া গিয়েছে।

তমলুক থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান লেখকের নিজ গ্রাম বরগোদায় দেবী বর্গেশ্বরী আছেন। একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দেবী বর্গেশ্বরীর মন্দিরের কাছেই একটি বড় উচ্চ ঢিপি আছে। এই ঢিপিটিকে গাঁয়ের লোক বর্গীগাদা, কোটগড়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন। বড় ঢিপিকে গ্রাম্য বাংলা ভাষায় 'বড়ো কুদা' বলে বা 'বড় কুদা' বলে। 'কুদা অর্থে ঢিপি। খুব সম্ভবত এই 'বড় কুদা' শব্দটি কালে কালে অপভ্রংশ হয়ে বরগোদায় পরিণত হয়েছে। (বড়কুদা>বোরকুদা>বোড়(ক)গাদা> বড়গাদা>বোরগাদা>বরগোদা)। সে যাই হোক, এই স্থানের সঙ্গে প্রাচীন কালে বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই মন্দিরের একটু উত্তরে বড় খাল বলে একটি হাজা-মজা খালের চিহ্ন আজো আছে। এই খালটিই এককালে তমলুকের সাথে সংযুক্ত ছিল। এর কোন কোন অংশ 'নাকচিরার খাল' নামেও আজো পরিচিত। উক্ত বর্গেশ্বরীর ঢিপি এককালে বিরাট ছিল।

এইস্থান প্রাচীনকালে যে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, তা' দেখলেই স্পষ্টই অনুমিত হয়। এখান থেকে আমি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎ-পাত্রের ভগ্নাংশ পেয়েছি। যেগুলির সাথে তমলুক ও ২৪ পরগণার বেড়াচাপায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সাথে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। একটি সংরক্ষিত জলাধারের উপরিঅংশ পাওয়া গেছে। তা' দেখে মনে হয় এটি একটি বড় কুজোর ভগ্নাংশ। নির্মাণশৈলী বিশেষ উন্নত ধরণের। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র তৈরী হোত সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশ সমূহে। কারণ, এদেশে সন্নিকটবর্তী কোন পাহাড় পর্বত নাই। যার ফলে মাটির জিনিসপত্র নির্মাণে বিশেষ উন্নত প্রক্রিয়ার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এই শ্রেণীর পাত্রে জল চুইয়ে পড়ার কোন ভয় ত ছিলই না, অধিকন্তু বাইরের উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে পাত্রমধ্যস্থ জলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। সোজা কথায় জল ঠাণ্ডা থাকত এবং রন্ধন করা খাদ্যদ্রব্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত টাটকা সংরক্ষণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়া আরো একটি প্রস্তরীভূত হাড় পাওয়া গিয়েছে। আর একটি মৃন্ময় দণ্ডায়মান মূর্তির নিম্নাংশ। এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতিতে নির্মিত। হাঁটুর কাছ থেকে পা' পর্যন্ত নিম্নাংশটুকুতে কাপড় পরিধানের যে প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তা' বেশ উন্নত ধরণের। মূর্তিটির দাঁড়াবার কৌশল পুরুষের অনুরূপ। পায়ে কিন্তু মেয়ের মত মল আছে। কাপড়ের পাড়ের বাহারও লক্ষণীয়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ২১শ অধ্যায়ে অলঙ্কার সম্পর্কে অনেক কথা আছে। এই শাস্ত্র থেকে জানা যায় পুরুষরাও নানারকমের অলংকার ব্যবহার করত।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে পাই—

"মরগ অমজ্জীয়জুঅং চরণে সে লম্ভিসা বঅসৃসাহিং।
ভীএ নিঅম্বফলএ নিবেসি থা পঞ্চরাঅ মণিকঞ্চী।
ছিন্না বশঅা বলিও করকমল পট্টনাল জুঅলম্মি।"

—বস্থরা চরণে নূপুর পরাইয়া দিল। নিতম্বফলকে গদ্মরাগ-মণির কাঞ্চী নিবেসিত হইল। করকমলে বলয়, কণ্ঠে মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণে কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

পায়ের গহনা ছিল, মল, বেঁকি, নূপুর, নেউর, কেয়ূর, পাশুলি, আনটবিছা, গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, সঞ্জার, তোড়া, খলখলি, ছরা, ঝুমুর, ও চরণচাপ প্রভৃতি।" প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ১০০ ও ১০১

কাপড়ের কথা বলছিলাম। ভারতীয় শিল্পাদর্শ অনুযায়ী 'দৈহিক গঠনের সঙ্গে বস্ত্র অলংকার শিরোভূষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের সংযোগে পূর্ণাঙ্গ আকার সৃষ্টি করতে না পারা পর্যন্ত মূর্তি বা চিত্রশিল্পের পূর্ণতা লাভ করে না।' 'ভারতীয় মূর্তিতে বস্ত্র অলংকার ইত্যাদি নির্মাণ কৌশলের অনুগত ও গঠননিষ্ঠ। কাপড়ের প্রক্ষিপ্ত অংশ, নানা অলংকার, শরীরের চাল এবং গঠনের নতোন্নত ভাব, শরীরের আকার আয়তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।' এই রীতি অনুযায়ী যদি বর্গেশ্বরীতে প্রাপ্ত মৃৎ মূর্তিটি বিচার করি তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এটি ভারতীয় শিল্পরীতির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে গুপ্ত ও পাল যুগে ভারতীয় শিল্পরীতি যতটা উন্নতি লাভ করেছিল, এই মূর্তিটি সেদিক থেকে বিচার করলে ততটা উন্নত নয়। তাই বলে মূর্তিটি হাতে তৈরী নয়। ছাঁচে চাপ দিয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। সম্ভবত কোন প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য খচিত করার উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। পুরাণপ্রসিদ্ধ কোন দেবতার মূর্তি বলে অনুমিত হয়।

তমলুকে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত একটি কূর্মমূর্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মূর্তিটি যদিও মাটির তৈরী, তা'হলেও এত জীবন্ত যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কূর্মমূর্তিটি যেন জলের উপরে ভেসে আছে এমনিভাবে তৈরী। পৃষ্ঠদেশ কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে উন্নত নয়। কিছু শিল্পকাজও আছে। মূর্তিটির পিছন দিকে দু'টো লেজ ছিল।

একটি ভেংগে গেলেও অপরটি বর্তমান আছে। এরূপ কূর্মমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। সম্ভবত এটি খেলনা রূপে ব্যবহৃত না হয়ে পূজিত হোত। 'ধর্মমঙ্গলে'র আদর্শে তৈরী নয়। যদি তা' হোত তা'হলে, মুখ বেরিয়ে থাকত না এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম একপৃষ্ঠে অঙ্কিত থাকত। খুব সম্ভবত এই মূর্তিটি গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমতি হয়।

এইবার তমলুক ও এর আশপাশের গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি বিষ্ণু-মূর্তি নিয়ে আলোচনা করব। যাদও তমলুকে খুব বেশী পাথরের নির্মিত মূর্তি পাওয়া যায়নি, তা'হলেও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে অনেক প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আজো আবিষ্কৃত হবে। তমলুক অঞ্চলে এ পর্যন্ত আমি ছ'টি বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান পেয়েছি। এই মূর্তি গুলির সব কয়টিই বেশ প্রাচীন। জিষ্ণুহরির মন্দিরে দু'টি নন্দীগ্রাম থানার শ্রীগৌরী গ্রামে একটি, কল্যাণচক গ্রামে প্রাচীন তেঁতুল গাছের তলায় একটি, শ্যামসুন্দরপুরে ঝিলিঙ্গেশ্বরীর মন্দিরে একটি ও নন্দ্রীগ্রাম থানার নন্দপুর গ্রামে আর একটি—মোট এই ছ'টি।

এই ছ'টি মূর্তির সবগুলিই পালযুগে নির্মিত বলে অনুমতি হয়। তবে জিষ্ণুহরির মন্দিরে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তি দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ। এই দু'টি মূর্তিকে এতদিন বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ একটি হরি ও অপরটি অর্জুনের মূর্তি বলে অনুমান করে এসেছেন। আসলে কিন্তু দু'টি মূর্তি বিষ্ণুর। এবং একটির থেকে অপরটি বেশ প্রাচীন। তমলুকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পালযুগের শিল্পরীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তা' না হলে তমলুকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—এই চারি শতাব্দীর নির্মিত মূর্তি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে মোটামুটি ভাবে পালযুগের শিল্প নামে অভিহিত করা হয়। যদিও এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অন্যান্য

রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন, তবুও এই চারিযুগের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণাক্রান্ত এবং পাল রাজ্যেই এর অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটেছে।

এই যুগে শিল্পের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র দেবদেবীর মূর্তি। বাস্তব জীবন ও সমাজের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্ম-শাস্ত্রাদিতে দেবদেবীর যে ধ্যানমন্ত্র আছে সর্বতোভাবে তাকে অনুসরণ করেই শিল্পীকে ছানি, হাতুড়ি ধরতে হয়েছিল। সেইজন্য, এই যুগের শিল্পীর স্বাধীনতা খুব কম ছিল—একরকম ছিল না বললেই চলে। অষ্টধাতু ও কালো কষ্টিপাথর,—সাধারণত ইহাই ছিল মূর্তি নির্মাণের প্রধান উপাদান। অন্যান্য ধাতু যদিও ব্যবহৃত ছিল, তা' সংখ্যায় অতি অল্প। পালযুগের চারশত বৎসরের শিল্পের অনেক বিবর্তন হয়েছিল কিন্তু এই বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই। অধিকাংশ ভাবেই মূর্তির নির্মাণকাল মোটামুটিভাবে জানাও যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর করে সময় নিরূপণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই।

এই যুগে মূর্তিগুলি একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল থেকে কেটে বের করা হোত। মূল মূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে এবং পারিপার্শ্বিক মূর্তি-গুলি ও অলংকারাদি এবং পার্শ্বচিত্র দুইপাশে, উপরে ও নীচে খোদিত করা থাকত। প্রথমে মূর্তিগুলির গভীরতার এক অর্দ্ধমাত্র পাষাণে উৎকীর্ণ হোত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গভীরতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শেষে মূল মূর্তিটি প্রায় সম্পূর্ণ আকার লাভ করে। এইরূপ ভাবে মূর্তিকে প্রকটিত করার জন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ পাথর কতকটা একেবারে কেটে বাদ দেওয়া হোত। আবার প্রথম প্রথম মূল মূর্তিটিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ও দর্শকের প্রায় সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্রমশ পারিপার্শ্বিক মূর্তিগুলি ও নানাবিধ কারুকার্যে বিভূষিত পার্শ্বচিত্র অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। পরিশেষে সুদক্ষ শিল্পীর হাতে পড়ে মূলমূর্তিগুলির শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু সবশেষে

কোন কোন জায়গায় এই সব পারিপার্শ্বিক মূর্তি ও অলংকারের প্রাচুর্য এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে মূল মূর্তিটিই গৌণ হয়ে পড়ে। 'অনেকেই মনে করেন যে এই দুইটি পরিবর্তনই খুব সম্ভব প্রধানত কাল-প্রবাহের ফলে ঘটিয়াছে; অর্থাৎ উৎকীর্ণ মূর্তির অতিরিক্ত গভীরতা এবং পারিপার্শ্বিক মূর্তি ও চালচিত্রে অলংকারের অতিরিক্ত ও অযথা বাহুল্য শিল্পীর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতার প্রমাণ। কিন্তু ইহা যে একটি সাধারণ সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় না রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের নামাঙ্কিত লিপিযুক্ত বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তির সহিত রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ সদাশিব মূর্তির তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ২০৬—২০৭।

পালযুগের শিল্প নির্মাণের সময় বিজ্ঞাপন প্রসংগে একজন প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক এমনিভাবে মন্তব্য করেছেন,—"নবম শতাব্দে দেহের কমনীয়তা, সুডৌল গঠন ও শান্ত সমাহিত মুখশ্রী; দশম শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ; একাদশে ক্ষীণ তনু, সুকোমল ভাবপ্রবণতা, মুখমণ্ডলের অপার্থিব দিব্যভাব ও দেহের উর্দ্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা; এবং দ্বাদশে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখশ্রী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা ও বসন ভূষণের প্রাচুর্য;—ইহাই এই চারিযুগের বাংলার শিল্পের প্রধান লক্ষণ।" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলার ইতিহাস।

শিল্পের গঠন প্রণালী দেখে এরূপভাবে ভাগ করা সম্ভব হলেও পালযুগের মূর্তি শিল্পের সময় বিজ্ঞাপন করা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার স্থান এখানে নেই। তবে আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য পালযুগের শিল্পরীতি সম্পর্কে মোটামুটি এটুকু জানলেই চলবে।

এই শিল্পরীতির আলোকে আমরা জিষ্ণুহরির মন্দিরে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিদ্বয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। মন্দিরের বামপাশে

রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরে খোদিত। বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ মূর্তির মত এটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, তারপর চক্র। বাম হাতে গদা এবং পদ্ম। পার্শ্বচিত্রগুলি অপরটি থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের। দু'পাশে মাথার কাছে দুটি মালা হাতে দু'জন দেবদূত যেন উড়ে আসছেন। মাথার মুকুটটিও বিশেষ ধরণের। কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে হার, বাহুতে অঙ্গদ ও বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত। চক্ষুদ্বয় রজত দ্বারা নির্মিত। এইরূপ রজত নির্মিত চক্ষুদ্বয় অন্য কোন বিষ্ণুমূর্তিতে সচরাচর দেখা যায় না।

দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষিত মূর্তিটিও বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে গদা ও পদ্ম এবং বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম। এটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। বামপাশে রক্ষিত মূর্তিটির সাথে এই মূর্তিটির বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। এর চক্ষুদ্বয়ও রজত নির্মিত। কোমরের দু'পাশে পাথর কেটে ছঁ্যাদা করা। দু'টি মূর্তিই এইরূপ। পূজক ব্রাহ্মণ কটিদেশের ছঁ্যাদা দিয়ে গলিয়ে মূর্তি দু'টিকে কাপড় পরিয়ে রেখেছেন। এর ফলে মূর্তির নিম্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। মূর্তি দু'টির জন্য বিশেষ কোন সিংহাসনের ব্যবস্থা নেই।

দক্ষিণ পার্শ্বের বিষ্ণু মূর্তিটির মুখমণ্ডলের অপার্থিব সদাহাস্য-মুখরিত দিব্যভাব ও দেহের উর্দ্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা দেখে এটিকে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। বাম পাশের মূর্তিটির শান্ত সমাহিত মুখশ্রী ও অলংকারাদির ব্যবহার দেখে নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর নন্দীগ্রাম থানায় শ্রীগৌরীগ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটির ছবি 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্তে' অধর চন্দ্র ঘটক মহাশয় প্রকাশ করেছেন। *শ্রীগৌরী গ্রামে এক পুষ্করণী* খনন কালে প্রায় তিনফুট উচ্চ ও এক ফুট প্রশস্ত চতুর্ভুজ এই

বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া যায়। বসন ভূষণের প্রাচুর্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় এটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল।

তমলুকে পুষ্করণী খননকালে মৃৎনির্মিত একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ছাঁচে তৈরী এই মুর্তিটির শিল্প কর্ম অতি নিকৃষ্ট। এটি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর নির্মিত।

এবার আমরা একটি শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করছি। এই শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য খ্যাতির কথা। শিলালিপিটি হোল নিম্নরূপ :

অথ কস্মিংশ্চি [ৎ স] ময়ে বণিজো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তামলিপ্তি [ম] যোধ্যায়া যযু পূর্বস্বণিজয়া ॥
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সনাবাসং বিয়াস্মবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চক্রুরিহ স্থিতিং ॥
সুবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি যৈর্ধনং।
বিত্তপস্পর্ধয়েবা সেদে পর্যন্ত মুপাতিতং ॥

হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ে এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর বাঙালীর ইতিহাসে ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় লিপি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। অষ্টম শতকে লিপি খোদাই কালে বলা হচ্ছে —"অথ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে" অর্থাৎ কোন এক সময়ে। তা'হলে অনুমান করতে মোটেই ভুল হয় না যে ঘটনাটি ঘটেছিল তারও অনেক আগে। তিন ভাই তারা এসেছিল অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তিতে বাণিজ্য করতে। তারপর কিছুদিন পরে ফিরে এলো নিজের দেশে প্রচুর মণি, মাণিক্য নিয়ে। এই হোল শিলালিপির মূল বক্তব্য।

তমলুক থেকে প্রায় ৮।৯ মাইল দক্ষিণ দিকে কল্যাণচক গ্রাম। এই গ্রামের সন্নিকটে মহিষাদলের প্রাচীন রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরীর রাজধানী ছিল। কল্যাণচক গ্রাম এই কল্যাণ রায়ের নামানুসারে হয়েছে বলে মনে হয়। এই গ্রামে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষ আজো আছে। এই বৃক্ষের তলায় একটি বেশ বড় বিষ্ণু মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে "মহারাজতলা" বলে অভিহিত করে। তাঁরা এই মূর্তির পূজাও করেন। মূর্তিটির গঠনপ্রণালী খুব উন্নত নয়। অমসৃণ কালোপাথরে এ'টি নির্মিত। মূর্তিটি বেশ বড়। মূর্তিটির নির্মাণকাল অনুমান করা সম্ভব নয়। এই মূর্তিটির মুখশ্রী, পার্শ্বচিত্র ইত্যাদি কতকটা যেন অসমাপ্ত বলে ধারণা হয়। খুব সম্ভবত মূর্তিটি পালযুগের প্রথমদিকে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

গোমাই গ্রামের সন্নিকটে শ্যামসুন্দরপুরে ঝিলেঙ্গেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে যে বিষ্ণুমূর্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে, সেটি পূর্বে কোন মন্দিরে নিত্য পূজিত হোত বলে মনে হয়। এই মূর্তিটির নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত সরল ও সাবলীল। কালো কষ্ঠিপাথরে তৈরী। মুখমণ্ডলের দিব্যভাগ বিশেষ লক্ষণীয়। মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর নির্মিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। নন্দীগ্রাম থানায় নন্দপুর প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ দীঘি আছে। এই গ্রামে অনেক প্রস্তরনির্মিত মূর্তি ছিল বলে অনুমিত হয়। একটি পুকুর থেকে কয়েকটি মূর্তি কিছুদিন হোল আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব সম্ভবত বিধর্মী মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মূর্তিগুলিকে পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে যে বিষ্ণুমূর্তিটি ভগ্ন অবস্থায় আছে, সে মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন, কেউ জোর করে ভেংগে মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দীঘিতে নিক্ষেপ করেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়, এ থেকে মনে হয়, এই প্রাচীন গ্রামে

অতীতে নিশ্চয়ই কোন ধর্মদ্বেষমূলক বিপ্লব হয়েছিল যার ফলে দেব-দেবীর উপর আক্রমণ করে এইগুলিকে নষ্ট করা হয়। এই মূর্তিটিও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। নির্মাণ প্রণালী উচ্চাঙ্গের।

শিল্পের দিক থেকে যদি বিচার করি, তা, হলে এগুলিকে সমভঙ্গ মূর্তি বলা যেতে পারে। প্রাচীন শিল্পে সমভঙ্গ মূর্তি সবচেয়ে অধিক। সমভঙ্গ মূর্তি স্তম্ভের ন্যায় ঋজু এবং স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল। হাত পায়ের প্রক্ষেপ থাকলেও মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া রাখাই সমভঙ্গ মূর্তির লক্ষণ। সমভঙ্গ মূর্তির আবেদন সম্মুখবর্তিতায়। এজন্য দর্শক নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সমভঙ্গ মূর্তির ঋজুতা অনুভব করে থাকেন। শিল্পসমালোচকদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'আত্মিক বা দৈহিক শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশিত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে সমভঙ্গ মূর্তি। সমভঙ্গ মুর্তিতে চাঞ্চল্য নেই বলেই এই মূর্তিতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গৌণ। মিশরীয় মূর্তি, প্রাচীন (আর্কাইক) যুগের গ্রীক মূর্তি, (ক্লাসিক) গ্রীক যুগের অ্যাপেলো মূর্তি মৌর্য যুগের যক্ষ ও যক্ষী, মথুরার বুদ্ধ মুর্তি, বেলগেলোর তীর্থঙ্কর—অধিকাংশই সমভঙ্গ মূর্তির পর্যায়ভুক্ত। আধুনিক কালের শিল্পে ভাব না থাকলেও, সমভঙ্গ মূর্তির অভাব নেই।' ভারতীয় মূর্তিও বিমূর্তবাদ, বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়।

তমলুকের ৩।৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি গ্রাম বঁহিচাড়। এই গ্রামের শ্মশানের কাছে পদ্মপুকুরিয়া বা সীতাপুকুরের ধারে একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে। অনুরূপ আরে দু'টি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড ওরি সন্নিকটে হরিপদ প্রামাণিকের পুকুরে আছে। আর একটি একফালি খালের মধ্যে আছে। এই প্রস্তর খণ্ডগুলি যেমন বৃহৎ তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদ্মপুকুরের পাড়ে 'রাইস মিলে'র কাছে যে প্রস্তরখণ্ডটি পড়ে আছে তাতে নীচুর দিকে কয়েকটি মূর্তি খোদিত আছে। উপরের দিকেও আছে কিন্তু মাটিতে

ঢেকে থাকার জন্য সম্যকরূপে পরিলাক্ষত হয় না। এই তিনটি মূর্তি একই রকমের। কৃষ্ণের মত ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে মূর্তিগুলি দণ্ডায়মান। একহাত পার্শ্বে লম্বিতভাবে আছে, তাতে গোলাকৃতি একটি বলের মত বস্তু ধৃত। অন্য হাতটি মস্তকে সন্নিবেশিত। এইরূপ মূর্তি কোন দেবতার নয়, তা' দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মূর্তিগুলি কিসের, তা, বলা বড় কষ্টকর। প্রস্তর-খণ্ডের অবস্থা দেখে মনে হয়, কোন বৃহৎ স্তম্ভ বা দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ। একপাশে এমনভাবে খাঁজকাটা আছে যে যেন ঐ ধরণের খাঁজ অন্য প্রস্তরের সাথে মিল করার জন্যই ব্যবহৃত হোত। বঁহিচাড় গ্রামটি একটি মজাহাজা নদীর উপর অবস্থিত। ইতিপূর্বে কংসাবতীর যে শাখা গৌরীনদী নামে রঘুনাথবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল বলে উল্লেখ করেছি, ইহা সেই নদীর অংশ। খুব সম্ভবত কোন দুর্গ বা প্রস্তর নিামত বাড়ীর কারুকার্যখচিত স্তম্ভের অংশ হওয়াই স্বাভাবিক ; তমলুকে প্রস্তর নির্মিত দুর্গ ছিল একথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি।

পরিশেষে একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তির কথা বর্ণনা করে এই অধ্যায়ের শেষ করব। এই মূাতটি যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি অভিনব! ময়না রাজবাড়ীর লোকেশ্বর শিব মন্দিরের মধ্যে মূর্তিটি সংরক্ষিত আছে। একটি কম্বলাসনের উপরে পদ্মাসনে বসে আছেন এক সাধক। হাত কিন্তু তাঁর ছ'টি। দু'টি হস্ত মস্তকে সন্নিবিষ্ট। তাতে দু'টি ঘট। তারপরের দু'টি হাত দু'পাশে ঋজুভাবে অবস্থিত। তাতেও দু'টি ঘট। অপর দুই হস্ত বক্ষদেশে পর পর অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় আছে তাতেও একটি ঘট। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কম্বলাসন পর্যন্ত প্রলম্বিত। প্রতি বাহু ও মনিবন্ধে রুদ্রাক্ষ শিবের মত মালা পরিহিত। শিরদেশে মুকুট। আলোক দিব্যস্বত্ব মুখশ্রী, দেখলে সহজেই ভক্তির উদ্রেক হয়। মূর্তিটি একটি অখণ্ড প্রস্তর থেকে কেটে বের করা হয়েছে। এটি যে কিসের মূর্তি আজো নির্দ্ধারিত

হয়নি। সমগ্র অখণ্ড বঙ্গদেশে এরূপ অভিনব বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্ত ইতিপূর্বে আর আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মূর্তিতাত্ত্বিকদের কাছে এই মূর্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই মূর্তির মধ্যে অনেক তথ্যই নিহিত আছে।

তমলুক অধিবাসীদের নিকট খোঁজ করলে আরো বিচিত্র ধরণের মূর্তি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তমলুকে আজো কোন গভীর দীঘি বা পুস্করিণী খননকালে বিচিত্র ধরণের মৃৎপাত্র ও মূর্তি পাওয়া যায়। যদি সরকারের পক্ষ থেকে এই সহরে একটি ছোট সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থা করা যেত, তা'হলে ভ্রমণকারীদের ত বটেই তমলুকবাসীদেরও ভাল হোত। কারণ, তমলুকে প্রাপ্ত বহু জিনিস ইতিপূর্বে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদি প্রাচীন তাম্রলিপ্তের রাজবাড়ীটি সংস্কার করে তাতেই এই ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে খুব ভাল হয়।

একাদশ অধ্যায়

মন্দির শিল্পে তাম্রলিপ্ত

মন্দির শিল্পে তাম্রলিপ্ত বন্দর কতদূর উন্নত ছিল, তা' আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। এই বন্দরে যে কিরূপ ধরণের মান্দর ছিল, তার কোন বিবরণ প্রাচীন পুঁথিপত্তর বা ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আজো জানা যায়নি। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন-সাঙ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। একমাত্র তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্তে তৎকালে ৫০টি পৌত্তলিকদের মন্দির ছিল, এই মন্দির যে কত উন্নত শিল্পশৈলীর পরিচায়ক, তার কোন বিবরণ তিনি লিখে যাননি। তবে একথা অনুমান করা যায় যে, তখন তাম্রলিপ্তে যখন ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করতেন এবং অধিকাংশ লোকের অবস্থা ভালই ছিল বলে হিউয়েন সাঙ বলেছেন, তখন মন্দিরগুলি নিশ্চয়ই আকাশস্পর্শী ও নানা ভাস্কর্য খচিত ছিল। ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলে পরিগণিত হোত। কিন্তু আজকের তমলুকের বুকে অতীত তাম্রলিপ্তের সেই প্রধান গৌরব মন্দিরগুলির একটিও বর্তমান নেই। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন ধর্মাবলম্বীদের কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সেই সব মন্দিরের প্রায় সমস্তগুলিই তমলুকের ভূগর্ভে চিরতরে সমাহিত হয়ে আছে ও রূপনারায়ণের প্রবল স্রোতে কিছু ধ্বসে পড়ে চির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতীতের ক্ষীণ সাক্ষী নিয়ে একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে দেবী বর্গভীমার মন্দির। বাকি আর যে সব মন্দির বর্তমান তমলুকে আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কোনটিরই বয়স ৩।৪ শত বছরের বেশী নয়। যাইহোক, আমরা এই মন্দিরগুলি নিয়েই বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

বর্গভীমা মন্দির ॥ এই মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। তাই এখানে এই মন্দির সম্পর্ক বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে এই মন্দির যে সাড়ে চারশ' বছরের প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সামনের অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মন্দিরে উল্লেখযোগ্য কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন নেই। মূল মন্দিরটি প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ এবং ভিত সহ এই মন্দিরের উচ্চতা ৮০ ফিট। মূল মন্দিরের ভিতরের অংশটি একটি বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী বলে ভ্রম হয়। উড়িষ্যার শিল্পরীতিতে রেখদেউলের অনুকরণে নির্মিত। "তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণে" ও "কিংবদন্তীর দেশে" যে কালাপাহাড়ের পাঞ্জার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, আমি অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস পেলাম না। অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গেল যে, অধিকারীদের কোন এক শরিক নাকি পাঞ্জাটিকে অর্থের লোভে বিক্রী করে দিয়েছেন। কতদিন আগে কোথায় এবং কাকে বিক্রী করেছেন, তার কোন সন্ধানই আজ পর্যন্ত করতে পারিনি।

যাই হোক, দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো তমলুকবাসীদের অটুট আছে। এবং প্রতিদিন বহু যাত্রীর সমাবেশে এই স্থান মুখরিত থাকে।

জিষ্ণুহরির মন্দির ॥ এই মন্দির সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করেছি। এই মন্দির সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ইহা নাকি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির এবং এই তুইজনের মূর্তি একত্রে আছে। কিন্তু পূর্বেই আমরা বলেছি তুই বিগ্রহই বিষ্ণুর। এই পুস্তকে মূর্তিদ্বয়ের আলোকচিত্রও প্রকাশিত হোল। এর থেকে পাঠকগণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্তিদ্বয় জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত।

প্রথমত জিষ্ণু এবং হরি বা নারায়ণ এই তিনটি শব্দ একই অর্থ বাচক। দ্বিতীয়ত বিশ্বকোষে যে তথ্য লিখিত হয়েছে তাতে এই অর্থ স্পষ্টই বোঝায় যে, রাজা ময়ূরধ্বজ অর্জুন এবং হরির মূর্তি দু'টি একসংগে অর্থাৎ একই আধারে না নির্মিত করে পৃথকভাবে নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্বকোষের কথা অনুযায়ী আমরা দুটি পৃথক মূর্তিই পাচ্ছি কিন্তু তা' পৃথক দু'টি মূর্তি নয়—একই মূর্তি দু'টি—অর্থাৎ দুটিই বিষ্ণু। এমতাবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জৈমিনীর মহাভারতোক্ত কাহিনী মিথ্যে কিংবা সত্য হলেও তমলুক রত্নাবতীপুর নয় কিংবা যদি তাই হয়, তা'হলে আসল মূর্তিদ্বয় হয় রূপনারায়ণ গর্ভে মন্দিরসহ ধ্বসে গেছে না হয় এই দুটি বিষ্ণুমূর্তি অন্য কোথাও পাওয়া গিয়েছিল এবং এই প্রাপ্ত মূর্তি দু'টিকেই কৃষ্ণ-অর্জুনের মূর্তি বলে চালান হচ্ছে। আমি নিজে দু'দিন ঘুরে তিন দিনের দিন যখন মূর্তি দু'টি দেখি এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের মূর্তি বলে আমায় বললেন। এতে আমি ভিন্ন মত পোষণ করতে তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন—"জানেন, এ মূর্তি কত প্রাচীন।" প্রাচীনতা অস্বীকার করছি না কিন্তু যখন ধরে ধরে বুঝালাম তখন তিনি বললেন, আপনি যাই বলুন এ মূর্তি দু'টি কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুনের। আমি আর তর্ক করলাম না, বুঝলাম, জনসাধারণকে কি ভীষণভাবে ঠকান হচ্ছে। তাই বলে এতে ব্রাহ্মণের যে দোষ আছে সে কথা বলছি না, ব্রাহ্মণ তাঁর পূর্ববর্তী পূজকদের কাছ থেকে যা শুনে আসছেন আজো তাই বিশ্বাস করেন এবং ভক্তদেরও বিশ্বাস করান। ভক্তরা প্রতিমূর্তি দেখেই সন্তুষ্ট, তাঁরা পূজো দেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেন।

ঐতিহাসিক সেবানন্দ ভারতী তাঁর পুস্তকে লিখেছেন—"পরম বৈষ্ণব রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্বদা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে

একটি মন্দির নির্মান করিয়া একখণ্ড প্রস্তরে উভয়ের মূর্তি খোদিত করাইয়া স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণ গর্ভে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্তমান মন্দির তমলুক-রাজগণ কর্তৃক চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে।"—তমলুকের ইতিহাস, পৃঃ ১০৩।

এখানে কিন্তু সেবানন্দ ভারতীর কথানুযায়ী মনে হচ্ছে একই প্রস্তরখণ্ডে কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের প্রতিমূর্তি খোদিত ছিল। তা'হলে সেই মূর্তি গেল কোথায়? হয় সেই অতি প্রাচীন মূর্তি আমার পূর্ব অভিমত অনুযায়ী রূপনারায়ণ গর্ভে ভেসে গেছে, না হয় ভারতী মশাই মূর্তি না দেখেই নিজের মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষোক্ত ধারণাই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। তারপর নূতন মন্দির নির্মান সম্পর্কে তিনি যে তথ্য দিয়েছেন, তা' অন্য মতের সাথে মিলে না। একস্থানে পাই—"ইঁহার প্রাচীন মন্দির বহুকাল হইল নদের গর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে মন্দির বর্তমান আছে, তাহা ৪।৫ শত বর্ষ পূর্বে এক গোপাঙ্গনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে।'—A Statistical Account of Bengal, Vol. III. P. 66.

এমতাবস্থায় আমরা কোনটিকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করব। মন্দিরটি চার-পাঁচ শত বছরের প্রাচীন হতে পারে, কিন্তু সেই অতি প্রাচীন মন্দিরের আসল রূপও আজ আর নেই বলে মনে হয়। এই মন্দির সংলগ্ন চাঁদনীটি হাওড়া জেলার নবগ্রামের জমিদার স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র বাবু সতীশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক বাংলা ১৩২৭ সাল নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভবত ঐ সময় মূল মন্দিরটিও সংস্কৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই মন্দিরটির গঠন প্রণালীও উৎকল মন্দির শিল্পের অনুরূপ।

ভারতী মহাশয়ের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তমলুকের দক্ষিণ রাউতাড়ি গ্রামে বার্ষিক প্রায় চারি-পাঁচ হাজার টাকা আয়ের

সম্পত্তি থেকে প্রত্যহ একমণ চাল অন্নভোগ প্রদত্ত হোত এবং ৩৬৫/০ বিঘা জমি থেকে প্রতিদিন ক্ষীরভোগও দেওয়া হোত। এক্ষণে এই সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হস্তগত হয়েছে এবং সেবা পূজাদি নিয়মিত চলছে।

রামজীর মন্দির॥ এই মন্দির খাটপুকুরের ধারে আজো বর্তমান আছে। ইহা রাজা আনন্দনারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্তৃক নির্মিত। এই মন্দিরে রাম-সীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। বিগ্রহটি বড় সুন্দর। রাণী এই মন্দিরের সেবা-পূজাদি পরিচালনের জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। ১২৮৭ সালে ১৪ই পৌষ বুধবার কাগগেছে নিবাসী ভগবতী দীক্ষিত মহাশয়কে নিষ্কর ভূমি দান করেন। এই মন্দিরের নির্মাণ প্রণালীও উৎকল শিল্পের অনুরূপ। কারুকার্য বিহীন অনাড়ম্বর ভাবে নির্মিত উক্ত মন্দিরটি দেখতে সত্যই অপরূপ।

জগন্নাথজীর মন্দির॥ খাটপুকুরের পাড়ে জগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরটি নির্মিত। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী বাংলা এবং উড়িষ্যা এই দুই দেশের শিল্প-সমন্বয়ে গঠিত। অনেকাংশে ইহা বাংলা শিল্প রীতির অনুরূপ। এই মন্দিরের সম্মুখভাগ বিষ্ণুপুরের অনেক মন্দিরের মত এবং পোড়ামাটির নানা কারুকার্য খচিত। মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং এই মন্দিরের তিনটি চূড়ো। দারুময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপিত। তমলুকের ষটচত্বারিংশৎ রাজা শ্রীমন্তনারায়ণ রায় মূর্তি স্থাপন পূর্বক মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ চাঁদনি হাওড়া জেলার নবগ্রামের জমিদার মৃত রামমাধব দত্ত মহাশয়ের পৌত্র সতীশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক বাংলা সন ১৩২৭ সালে নির্মিত।

মহাপ্রভুর মন্দির॥ পরম বৈষ্ণব, কীর্তনীয়া ও পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বাল-চৈতন্যের মূর্তি স্থাপনকর্তা ও রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্তৃক বহু পরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব

যখন নীলাচল গমন করেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে নরঘাটের নদী পেরিয়ে একটি সোজা রাস্তা দিয়ে পুরী গমন করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত পথটি তৎকালে বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল। তাম্রলিপ্ত দিয়ে পুরী যাত্রা সম্পর্কে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে মুরারী গুপ্তের কড়চা অন্যতম। উক্ত কড়চার একস্থানে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্‌গুরু।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নান দদর্শ মধুসূদনঃ॥

মহাপুণ্যক্ষেত্র তাম্রলিপ্তে জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্য পদার্পণ করে ব্রহ্ম-কুণ্ডে স্নান করলেন এবং পরে শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করেন।

লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলের একস্থানে পাই—

তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমোলোকে উত্তরিল মহাপুণ্যক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত মন॥"[১]

আজিও তাম্রলিপ্তায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারক-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি পাদ পরিক্রমা নরঘাট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বৈষ্ণবগণ সংকীর্তন ও মহোৎসব করিতে করিতে মহাপ্রভুর প্রথম আগমন হৃদয়ে স্মরণ করেন। এই পরিক্রমা ২৪ বছর হোল নিয়মিত ভাবে চলে আসছে।

মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। আর এই কিংবদন্তীর পিছনে লুকিয়ে আছে একটি শোকাবহ ঐতিহাসিক

১ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১৫০। লোচন দাস ঠাকুর। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। ৩৮।২, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টিম—মেসিন-প্রেস হইতে শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭, শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন ১৩০৮।

কাহিনী। জয়ানন্দের মতে মহাপ্রভু আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময় স্বর্গলোকে গমন করেন। আসলে মহাপ্রভুর তিরোধান কিরূপভাবে হয়েছিল, তা' এখনো নিশ্চিতভাবে স্থির হয়নি। এই প্রসংগে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন—"তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন —তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে "মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে" এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতন্য উছ্‌ট খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুন্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচন দাস বলেন রাত্রি আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের ন্যায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্যের পার্শ্বচরগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহের আর কোন

চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পূর্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এক কোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমাধি কার্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোনে গৌরাঙ্গের প্রস্তরনির্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলাস্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা বিগ্রহে তাঁহার চিন্ময় দেহ মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।" বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৭৩৯—৭৪০।

এই মতের স্বপক্ষে আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—

……পাণ্ডাগণের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যকে লইয়া সমুদ্র তীরে গমন করে এবং কৌশলে তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে।" বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৪৯

বিভিন্ন বৈষ্ণব লেখকগণের এই সমস্ত বিভিন্ন মত দেখে মনে হয় সত্য সত্যই মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল। তৎকালে বড় বড় বৈষ্ণবাচার্যগণও সে কথা জানতেন। বাসুদেব ঘোষ যখন শ্রীচৈতন্যের এই মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, তিনি তখন অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। শোকাবেগ চাপতে না পেরে তিনি পুরীর পথে আকুল আবেগে উন্মত্তের মত ছুটে চললেন। অবশেষে রূপনারায়ণ পার হয়ে এলেন তমলুকে। রাত্রিতে এক প্রাচীন বকুল গাছের তলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে থাকলেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী ঘোষ দম্পতী নাকি পুত্রশোকাতুর ছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য রাত্রে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তোমায় আর যেতে হবে না। আমি প্রতিদিন তোমায় পুত্ররূপে এসে দেখা দেব। তুমি এখানেই আমার সেবা-পূজার বন্দোবস্ত কর।' স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাসুদেব আর অগ্রসর হলেন না। তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ হৃদয়ে চেপে বালক শ্রীচৈতন্যের মূর্তি নির্মাণ করে তাঁরি সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাসুদেব ঘোষ প্রতিষ্ঠিত সেই বালক চৈতন্যের মূর্তি আজো মহাপ্রভুর মন্দিরে আছে।

এখন এই আলোচনা প্রসংগে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু সম্পর্কে আমার দু'একটি অভিমত এখানে প্রকাশ করতে চাই। আশা করি তা অপ্রাসংগিক হবে না। জয়ানন্দের কথামত যদি ধরি তিনি পায়ে ইটের আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিলেন, তা'হলে তাঁকে তাঁর পার্ষদগণ না নিয়ে যেয়ে পাণ্ডারাই বা নিয়ে গিয়ে গুণ্ডিচাগৃহে কেন তুললেন? বিশেষ তখন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তথায় বর্তমান ছিলেন। আর যদিই বা গুণ্ডিচাগৃহে তাঁকে স্থান দেওয়া

হয়েছিল, সেই গৃহে পার্ষদগণকে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না কেন? চৈতন্যের সেরূপ অবস্থায় ভক্তগণেরই ত যাওয়া উচিত সর্বাগ্রে। এবং তাঁরা গিয়েও ছিলেন। কিন্তু তখন গুণ্ডিচাগৃহের দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধদ্বার দেখে পার্ষদগণের মনে কি কোনরূপ সন্দেহ এক বারের জন্যও উঁকি দিল না। বিশেষ তাঁরা পাণ্ডাদের প্রথম ব্যবহার ভালভাবেই ত জানতেন। যদি তর্কের খাতিরেও ধরেনি তখন পাণ্ডাদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল তাই তাঁদের মনে জাগলেও কোন প্রতিবিধান করতে পারেননি। তাই যদি হয়, তা'হলেও ত তাঁরা গিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে অন্তত একটা সংবাদও দিতে পারতেন। কারণ প্রতাপরুদ্র নিজেই ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্তশিষ্য। আর যদি ধরেওনি পাণ্ডাদের কোন দোষ ছিল না, তা'হলেও প্রশ্ন হচ্ছে তিরোধানের পর ভক্তদের মহাপ্রভুর নশ্বর দেহ-পার্শ্বে যেতে দেওয়া হলো না কেন? সেন মহাশয়ের মন্তব্য অনুযায়ী তা'হলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, নিশ্চয়ই পাণ্ডাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল। এবং ধীর-স্থিরভাবে বিচার করলে জয়ানন্দের কাহিনীকেও সত্য বলে মনে হয় না। আসলে সেন মহাশয় যে পাণ্ডাদের কাছে পুরীতে শুনেছিলেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, একাহিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে। তবু প্রশ্ন উঠে যদি সত্যই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, তা'হলে সে কথা চৈতন্য জীবনীকারগণ চেপে গেলেন কেন? এর একমাত্র উত্তর হতে পারে যে, যদি তখন তাঁরা এই নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী প্রচার করতেন, তা'হলে হয়ত সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ ক্ষেপে গিয়ে একটী ভীষণ বিপ্লব করতেন, তাতে চৈতন্যের প্রেমধর্মের অবমাননা হোত এই ভয়ে ভক্তগণ অত্যন্ত সংযতভাবে মহাপ্রভুর অতিমানবতা প্রচার করেছিলেন। আর জয়ানন্দ নিজের প্রখর বুদ্ধি দিয়ে এমন কাহিনী তৈরী করেছেন যে যদি তিনি অতি মানব না ছিলেন, তা'হলে তাঁর মৃত্যুর পর মৃতদেহ গেল

কোথায়? পাণ্ডারা ত দ্বার রুদ্ধ করেই ছিলো। মৃতদেহ কোথাও নিয়ে যায়নি, সাধারণ লোক সহজেই একথা বিশ্বাস করলো এবং সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যখন তিনি নাকি বিলীন হয়ে গিয়েছেন—একথা প্রচারিত হোল।

বাসুদেব ঘোষের বালক চৈতন্যের বিগ্রহ স্থাপন সম্পর্কে যে কিংবদন্তী তমলুকে প্রচলিত আছে, এ কাহিনীর মূলে মহাপ্রভুর শোকাবহ মৃত্যুর যে একটি ক্ষীণ সূত্রও সংযুক্ত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাইহোক, এই মহাপ্রভুর সেবাপূজাদি নির্বাহ করার জন্য স্থানীয় রাজা ও জমিদারগণ প্রচুর জমি দান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তমলুক, কাশীযোড়া, ময়না, দরো, জলামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি রাজা ও জমিদারগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে বাসুদেব ঘোষ তদীয় শিষ্য মাধবীদাসকে সেবাদির ভারার্পণ করেন এবং তীর্থ-পর্যটন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মোহান্ত দ্বারা এই মন্দিরের কার্য-নির্বাহ হতো। বর্তমান ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী মহাপ্রভুর ভূ-সম্পত্তি সরকারের হাতে গিয়েছে।

এইসব মন্দির ছাড়া তমলুকে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। রাজবাটী সংলগ্ন রাধাবিনোদ ও রাধারমণ মন্দির কোম্পানীর আমলে আনন্দনারায়ণ রায় কর্তৃক সংস্কৃত হয়েছিল। এ ছাড়া তমলুকে প্রতি বৎসর বারোয়ারী পূজাও হয়, এই জন্যে তাদের পৃথক পৃথক দেউল আছে। এদের ব্রহ্মবারোয়ারী ও গঙ্গাবারোয়ারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে রামকৃষ্ণদেবের একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরের রামকৃষ্ণ বিগ্রহ বড় সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক।

তমলুক রাজগণের অন্যতম বংশধর বঁহিচবেড়ে গড়ে আরো

কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে রাধাবল্লভ জীউ, গোপীনাথ, শ্যামচাঁদ, শীতলা, মহাদেব প্রভৃতি মন্দিরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাবল্লভ জীউর মন্দির সুবৃহৎ ও বিশেষ কারুকার্যখচিত। এই মন্দির বর্তমানে জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী নবরত্ন মন্দিরের অনুরূপ।

রজক পল্লীতে 'নেতা ধোপানী'র পাঠ আছে। কিন্তু এর কোন মন্দিরাদি নেই। নেতা ধোপানীর পাঠের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

দ্বাদশ অধ্যায়

তাম্রলিপ্তের সামন্ত রাজ্য সমূহ

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ছিল ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ।[১] হণ্টর সাহেব বলেছেন, "তমলুক রাজ্য পূর্বে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং সমুদ্রও তৎকালে তমলুকের নিকটবর্তী ছিল। এখন সমুদ্র তমলুক হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়াছে। অতএব তমলুকের পশ্চিমস্থ ময়নাগড়ের রাজগণের পুরাতন রাজ্যাংশ —সবঙ্গদেশ বা সবং পরগণা বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০ শত মাইল পরিধি বিশিষ্ট করিতে হইলে, ২৪ পরগণার অন্ততঃ মাতলা সহর পর্যন্ত সীমা ধরিতে হয়।"

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বাংলা দেশের পূর্বতন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের একতম "সমগ্র দক্ষিণ-বাঙ্গলা-ব্যাপী" বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সমস্ত অভিমত থেকে মনে হয় প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল সুবিশাল সাম্রাজ্য। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সামন্ত-নৃপতিগণ তৎকালে সকলেই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত-নৃপতি নামে অভিহিত হতেন। তাম্রলিপ্তের সামন্ত রাজ্য-সমূহের মধ্যে প্রধান হোল—(১) হিজলী ও সুজামুঠা (২) মহিষাদল (৩) কতুবপুর (৪) তুর্কী (৫) কাশীজোড়া ও (৬) ময়না।

এই ছ'টি সামন্ত রাজ্য যে এককালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ আজো পাওয়া যায়নি। তবে এই রাজ্যগুলি বিভিন্ন সময়ে যে তাম্রলিপ্তরাজের অধীনে এসেছিল, সে

১ "The Kingdom of Tamlmk was then about two hundred and fifty miles in circumference."—Documents Geographiques, P. 450. and Julien's 'Hiouen Thsang,' Vol. III, P. 83.

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি নিম্নে এই ছ'টি রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করছি।

হিজলী ও সুজামুঠা—এই রাজ্যের আদি রাজাগণের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি। যতদূর জানা যায় এই বংশের প্রাচীন রাজা মুকুন্দদাস। এই রাজার পূর্বে কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়নি। রাজা মুকুন্দদাসের অধস্তন ২১শ পুরুষ রাজা হরিদাসের সময় গৌড়েশ্বর হিজলী রাজ্য আক্রমণ করে পরাভূত হন। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের "গৌড়ের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করে জানা যায়, বাংলার সুলতান "সিকন্দর সসৈন্যে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।" ২য় খণ্ড পৃঃ ৬০। সিকন্দর শাহ ১৩৫৯ থেকে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে রাজত্ব করেছিলেন। অতএব হরিদাস ঐ সময়ের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬০০ শত বছর পূর্বে রাজা হরিদাস হিজলীতে রাজত্ব করে ছিলেন। উক্ত বংশের ২৩শ রাজা গোবর্দ্ধন দাস ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান কর্তৃক পরাজিত হন ও সুজামুঠার অধিরাজ বলে পরিচিত হন। "হিজলী অতি পূর্বে তমলুকের সঙ্গে মিলিত থাকিলেও ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অন্যূন ৭।৮ বৎসর কাল পরাক্রান্ত নৌবল-গর্বিত স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। (হিজলী রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও রাজবংশলতা পণ্ডিত ভগবতীচরণ প্রধানকৃত "আর্যপ্রভা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ্ ফীচের বর্ণনা থেকে জানা যায়—পাঠান অধিকারের পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।[১]

১ It was a kingdom of itself, and the king a great friend to strangers, afterwards it was taken by the king of Patan which was their neighbours." I Horton Ryley's Ralph Fitch, P. 113.

সম্ভবতঃ রাজা হরিদাস হিজলীর স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজা হরিদাস সম্পর্কে "হিজলীর মসনদ্-ইআলা" প্রণেতা করণ জাতীয় ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন —"মাহিষ্যগণ তাঁহাদের সামাজিক পুস্তকে ইহাকে স্বসম্প্রদায়স্থ সুজামুঠা রাজবংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহাদের মতে হরিচরণ দাস হিজলীর আদি রাজা 'মুকুন্দ দাস' হইতে একবিংশতিতম এবং সুজামুঠা রাজবংশে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুকুন্দদাসের বংশীয় ৩৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "মাহিষ্য বিবৃতি" কার প্রতি একশত বৎসরে তিন পুরুষ বংশবিস্তৃতি গণনা করিয়াছেন। এই গণনা ঐতিহাসিক সম্মত। সিকন্দরের আক্রমণ কাল হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরে ১৫ জন রাজার রাজত্বক্রম এই মতই সমর্থন করে। তাহা হইলে মুকুন্দ হইতে হরিচরণ দাস পর্যন্ত ২২ জন রাজার রাজত্বকাল সাত শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে 'হিজলীর রাজা মুকুন্দ দাসে'র রাজত্ব আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে সিদ্ধান্ত হয়।" হিজলীর-মননদী-ই-আলা, পৃঃ ৩৬

করণ মহাশয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে বিভিন্ন প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন মুকুন্দদাস সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লোক হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন—"আমরা মস্‌নদ্-ই-আলার পূর্বে করণ জাতীয় হিন্দু এবং কয়েকটি মুসলমান রাজাকে হিজলীতে আধিপত্য করিতে দেখিতেছি।" পৃঃ ৪১।

বিভিন্ন স্বজাতিপ্রিয় ঐতিহাসিকগণের এইসব মন্তব্য থেকে রাজা মুকুন্দ সম্পর্কে সঠিক কিছু অভিমত প্রকাশ করা অসম্ভব।

---

১ আর্যপ্রভা, পৃঃ ১১৩, মাহিষ্য বিবৃতি, পৃঃ ২১৪, মাহিষ্য তত্ত্ব-ব্যারিধি পৃঃ ১৩৪ প্রভৃতি।

এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নিরপেক্ষ গবেষণা করা ছাড়া কিছু মন্তব্য করা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না। তবে যতদূর জানা যায় হিজলীরাজ গোবর্দ্ধন দাসের সময়ে পাঠানবীর মছন্দলী অত্যন্ত শঠতা করে এই রাজ্য অধিকার করেন। তিনি গোবর্দ্ধনকে হিজলীর একাংশ দিয়ে সুজামুঠার গড়ে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এবং "রণঝাঁপ" উপাধি প্রদান করেন। হণ্টর সাহেব এই গোবর্দ্ধন রণঝাঁপকে গোবর্দ্ধন 'রণ্জ' বলেছেন। রণঝাঁপ উক্ত পাঠান মছন্দলীর সেনাপতি ছিলেন। রাজা গোবর্দ্ধনের সময় থেকে দক্ষিণ বঙ্গে মুসলমান শক্তি প্রবল হয় এবং হিজলীর মহাপরাক্রান্ত ভূপাল বংশ সুজামুঠার রাজা বলে গণ্য হন। সুজামুঠা রাজ্য চারটি পরগণা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এইগুলি হোল—(১) শূজামুঠা, (২) মহম্মদপুর, (৩) অমর্শি, (৪) ভূঞ্যামুঠা। (Grants' Analysis—PP. 365-366. Firminger.

সেবানন্দ ভারতী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মতে—"ইতিহাস প্রসিদ্ধ মসনদ্-ই-আলি ঈশা খাঁ এই হিজলী রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়া সমগ্র ভাটী প্রদেশের অধিপতি হন ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের গৌরব হানি করেন।" পৃঃ ১৪০

এই হিজলী রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় অসীম ধৈর্য সহকারে অনুসন্ধান করে "হিজলীর-মসনদ-ই-আলা" নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রামাণ্যতা ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত। হিজলী ও তার বাণিজ্যিক খ্যাতি সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এই পুস্তক পাঠের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হিজলীরাজ্য প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্য ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি বৌদ্ধযুগে হিজলী রাজ্যের কোন চিহ্নই ছিল না। হিজলী দ্বীপ সম্ভবত ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র থেকে জেগে

উঠেছিল এবং তার অনেক পরে মনুষ্য বাসযোগ্য হয়েছিল। বিরুলিয়ার জানা বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় তৎকালে এ সব অঞ্চলে ঘন অরণ্য ছিল এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম ঐ অরণ্যে এসে উপস্থিত হন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে মনে হয় হিজলী অঞ্চল সমগ্র না হলেও কিছুটা অংশ খুব সম্ভবত তমলুক রাজ্যের অধীন ছিল। তাই বলে সেবানন্দ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গণের মতানুযায়ী হিজলী রাজ্য তমলুকের সামন্ত রাজ্য ছিল, একথা স্বীকার করতে হলে আরো প্রমাণের প্রয়োজন।

মহিষাদল—মহিষাদল-এর অনেক অংশ সমুদ্রগর্ভে ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর এই ভূখণ্ড সমুদ্রোপকূলে তমলুকের দক্ষিণ পাশে জেগে উঠে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ময়নাগড়ের রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের জনৈক মাহিষ্য সেনাপতি মহিষাদল রাজ্য স্থাপন করেন। মাহিষ্য-তত্ত্ববারিধি, পৃঃ ১৩৮ এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানী আশুতোষ জানা মহাশয় লিখেছেন—"মহিষাদলের শেষ মাহিষ্য রাজার নাম উদয়নারায়ণ রায়। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় রাজা কল্যাণ রায়ের পুত্র। মহিষাদলের বর্তমান রাজা ব্রাহ্মণ, ইঁহারা উদয়নারায়ণের নিকট হইতে জায়বন্ধক সূত্রে রাজত্ব প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত জায়বন্ধক-গৃহীতা ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারী গোপনে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে নিজ নামে এই রাজ্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণই এখন মহিষাদলের রাজা। রাজা উদয়নারায়ণ উদয়সাগর নামে নিজ নামে এক দীঘি খনন করান। এই দীঘির নিকটবর্তী রাজবাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। রাজা উল্লিখিত বিদেশীয় ব্রাহ্মণ মহাজনের নিকট অর্থ লইতেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণ পরিণামে এই রাজ্য দখল করেন ও রাজার সর্বনাশ সাধন করেন। রাজা উদয়নারায়ণের বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন ও সামান্য ভূখণ্ডের আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন।" মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি, পৃঃ ১৩৮

এ সম্পর্কে ভগবতীচরণ প্রধান মহাশয় লিখেছেন—"ময়না গড়াধিপতির জনৈক সেনানী "রায় চৌধুরী" উপাধিধারী হইয়া এই সমস্ত ভূভাগের বিভিন্ন পরগণার চৌধুরীবর্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তমলুকরাজের সামন্তরাজরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে কিরূপে এই মহিষাদল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা অধুনা স্থির করা বড় দুষ্কর। তবে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে সুলতান সুজা বাংলাদেশের মসনদে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময়ে যে মহিষাদলের সিংহাসনে সেই মাহিষ্য জাতীয় "রায় চৌধুরী" বংশীয় রাজা কল্যাণ রায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। "দশ শত ষাট সালের (১৬৫৩ খৃঃ) দানপত্র তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।" ১৫ পৃঃ, মহিষাদল-রাজবংশ (দানপত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)।

সুলতান সুজার রাজত্বকালে (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) জনার্দ্দন উপাধ্যায় নামক একজন সামবেদী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ গেঁওখালীতে আসেন ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তৎকালে ঐ সকল অঞ্চল জনবসতি শূন্য অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ অরণ্য সমাকীর্ণ অঞ্চল তিনি তৎকালের নবাব দরবারে সনন্দ প্রার্থনা করেন। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তিনি মহিষাদল রাজ্যের যে অংশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, সেই অংশের সামুদ্রিক গরান-অঞ্চল অপসারিত করে নতুন জনপদের পত্তন করেন এবং পরে উপরিউক্ত উপায়ে কল্যাণ রায় চৌধুরীদের জমিদারী গ্রহণ করে মহিষাদল রাজ্যের আয়তন বর্ধিত করেন। "অনন্তর বহুতর যত্নে প্রজা সংস্থিতি করিয়া রাজোপাধি ধারণ করেন; এবং গড়রঙ্গীবসানে রাজধানী স্থাপন করেন। তদনন্তর দুর্যোধন উপাধ্যায়, রাজারাম উপাধ্যায় ও শুকলাল উপাধ্যায়, ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে যুবরাজ আনন্দলাল উপাধ্যায় রাজ্যাধিকারী হইয়া অনেক রাজ্য বিস্তার করেন; এবং সন্তানাদি

না হওয়ায় কুটুম্বপুত্র মতিলাল পাঁড়েকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ বৎসরে, যাহাকে সাধারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া থাকে) মানবলীলা সম্বরণ করেন। (আনন্দলালের এই মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ আছে। তিনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন (Bayley, Memoranda of Midnapore.) গ্র্যান্টের রাজস্ব-বিবরণী পাঠে জানা যায় আমলী ১১৩৫ থেকে ১১৭২ সাল (১৭২৮—১৭৬৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আনন্দলালের পত্নী জানকীর নামে মহিষাদল জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়েছিল (Fifth Report, Vol, II, P. 365)। সুতরাং আনন্দলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উক্ত বছরেই রাণী জানকী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবাস্ত গুমগড় পরগণা ছিল না—ইহা পরে গৃহীত হয়েছিল। বেলীর উক্ত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দই প্রকৃত বলে মনে হয়। (হি-ম-ই-আ পৃঃ ৯৪)

মতিলাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক হেতু তাঁহার ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী রাণী জানকী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালোচনার পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপালজীর নবরত্ন মন্দির, রামবাগের ৺রামজীর মন্দির, বৃন্দাবনে ৺জানকীরমণের মন্দির ও নন্দীগ্রামে ৺জানকীনাথের মন্দির এবং অতিথিশালা আজ পর্যন্ত তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে, অতি সুনিয়মেই ঐ সমস্ত দেবসেবা নির্বাহ হইত। ইঁহারই রাজত্বকালে কোম্পানি বাহাদুরের দশসালা বন্দোবস্ত হয়, এবং সেই বন্দোবস্ত কালীন তাঁহার নামের সহিত "রাণী" উপাধি সংযুক্ত ছিল। এই পুণ্যবতী রাণীর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর হইলে তাঁহার স্বামীর পোষ্যপুত্র রাজা মতিলাল অল্পদিনের মধ্যে বসন্তরোগে অন্ধ হওয়ায়, তাঁহার সেবা সূত্রে রাজা সুরপ্রসাদ গর্গ রাজপদাভিষিক্ত হয়েন, ইনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া লোকান্তর গমন করিলে ইঁহার স্ত্রী

রাণী মন্থরা ও ইহার পর রঘুমোহন গর্গ, ভবানীপ্রসাদ গর্গ ও কালীপ্রসাদ গর্গ রাজাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অকালমৃত্যু নিবন্ধনে কেহই অধিকদিন রাজকার্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই, তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে রাজা জগন্নাথ গর্গ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজাসন উপবেশন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পুনঃপুনঃ রাজপরিবর্তন বশতঃ রাজ্যে অরাজকতা ও অশান্তি, এবং জমিদারীতে নামজারি আদি না করায় জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর জমিদারী খাস করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করেন। পরে রাজা জগন্নাথ আপনাকে রাণী মন্থরা দেবীর উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নামজারি করিয়া জমিদারী দখল করেন। তদনন্তর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইলে ত্বদীয় পুত্র রামনাথ গর্গ রাজা হন। কিন্তু রামনাথ গর্গের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে তাঁহার মাতা রাণী ইন্দ্রানী রাজকার্য নির্বাহ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামনাথ গর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্মিণী রাণী বিমলা দেবী মাহেশের ঘাটে সহমরনেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্তচিতায় দগ্ধীভূত হন। তৎকালীন দেওয়ান তামোলুক নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। রাজা রামনাথ গর্গের উইলসূত্রে রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন। (বিমলাদেবীর পুত্রগণ নাবালক। তাই কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের দ্বারা পরিচালিত) ইনি এক প্রকাণ্ড রথ নির্মাণ করিয়া বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজব্যয়ে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়া মহান উপকার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের স্কুল, ডিস্পেন্সারী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং শিল্প বিদ্যালয়ে সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।" (তমোলুক পত্রিকা—মহিষাদল রাজবংশ।)

এঁর তিন পুত্র—ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গ ও রামপ্রসাদ গর্গ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ গর্গের, ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গের

মৃত্যু হয়েছে, মধ্যম রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গেরও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেহত্যাগের (২২ শে জানুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ) দুই দিন পূর্বে মৃত্যু হয়। ইনি কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের সাহায্যার্থে এককালীন বত্রিশ হাজার টাকা দান করে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র—সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপাল প্রসাদ গর্গ। সতীপ্রসাদ দানশীল রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। ইনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা, লেডি কার্জনের আফিল মতে লেডি ডফরিন ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা ও বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সাহায্যার্থে ১০০০৲ টাকা দিয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার দুইপুত্র—কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ ও কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ। দেবপ্রসাদ গর্গ সঙ্গীতপ্রিয় কলারসিক রাজকুমার। গোপাল প্রসাদ গর্গের পুত্রহলেন—কুমার ভবানী প্রসাদ গর্গ ও কুমার ভূপাল প্রসাদ গর্গ। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় মহিষাদল "মহিষাদল রাজকলেজ' স্থাপিত হয়েছে। কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ একবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কুমার ভবানীপ্রসাদ গর্গ ছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বহুদেশ পর্যটনও করেছিলেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় ইনিই কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই বছর (১৯৬৪) দেহত্যাগ করেছেন।

কতুবপুর—আইন-ই-আকবরীতে এই রাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ এই রাজ্যে ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভূপাল রাজা দলজিৎ সিংহ ও ভিখারীসিংহ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। সেই সময় এই রাজদ্বয় বিহার প্রদেশের গয়াজেলা পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। বিহার প্রদেশে নালন্দা গ্রামে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনও এই রাজধানীর

ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। অতি প্রাচীন কালে এই রাজ্যও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন সামন্ত-রাজ্য ছিল। মুসলমান শাসনকালে এই রাজ্য প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে। শুনা যায় এই রাজবংশ এখনও বর্তমান আছে এবং অতি দীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন চণ্ডভীম অমরকেতু (দেব) জানা, বীর অমরকেতুর বীরত্ব কাহিনী স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত হবে। সেনাপতি অমরকেতুর ভগ্নি সুগন্ধাকে কতুবপুর রাজ হরিদেব সিংহ বিবাহ করেন। অমরকেতু স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য পুরীর রাজা কর্তৃক "চণ্ডভীম" উপাধি প্রাপ্ত হন। অমরকেতু চণ্ডভীমের অধীন ৫০ হাজার পদাতি, ২ হাজার ঘোড়সোয়ার, ৫ শত হাতি ও বহু বরকন্দাজ ছিল। এই বীরের শক্তি প্রভাবে কতুবরাজ্য অসীম পরাক্রমশালী ত হয়েছিলই অধিকন্তু নিরুপদ্রবে সুশাসিত ও হোত।

তুর্কা—তাম্রলিপ্ত রাজকুমার যখন উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তুর্কারাজা এই অভিযানে নিজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে যোগ দেন। তাম্রলিপ্তের কোন রাজকুমার যে উড়িষ্যা জয় করেছিলেন তা' সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে কলভিন সাহেব যে অনুশাসন পত্র আবিষ্কার করেন, তা' থেকে জানা যায় একাদশ শতাব্দীর শেষভাবে গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশেয় অনন্তবর্মা বা কোলাহল কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন এবং কলিঙ্গ বিজয় করেন। এই অনন্তবর্মার সাথে তুর্কা রাজা উড়িষ্যা বিজয়ে যোগ দিয়েছিলেন কিনা, তা সঠিক ভাবে জানা যায় না, এই রাজ্যের অধিপতিগণের উপাধি 'গজেন্দ্র-মহাপাত্র'। এই রাজের বংশধরগণ পুরীর কাছে বর্তমান আছেন। ইঁহারা উপবীত ধারী ও বীরজাতি বলে পরিগণিত। তুর্কার রাজগণ ও মুদ্দার গজপতি রাজবংশ একই বংশ। ইঁহাদের শরীরে একই

শোণিত প্রবাহিত। মুসলমান শাসন কালে এই রাজবংশ খুব ক্ষমতাপন্ন জমিদার বলে পরিগণিত ছিলেন। খণ্ডরই গড়ে এই রাজবংশ এখনো অত্যন্ত দীনভাবে বর্ত্তমান আছেন। তমলুকে এই বংশের একশাখা বর্ত্তমান বসবাস করছেন। 'আর্য প্রভা'তে এই বংশের বংশলতা প্রকাশিত হয়েছে।

কাশযোষ বা কাশীজোড়া—এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সুপষ্টরূপে জানা যায়নি, বিক্রমবিজ্বলের 'বিক্রমসাগর" নামক দেশবিবরণ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ধনদত্তের পত্নী শিবানীর গর্ভে কুলিশ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণরেখা তীর—বর্ত্তী বালিশ (বালেশ্বর বা বালিশাহী) ও কাশযোষ (কাশীজোড়া) এই তিনটি প্রদেশের শাসন কর্তা ছিলেন। এই কুলিশ দত্তের অধস্তন একত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্রলিপ্ত রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের বিস্তৃত কোন বিবরণ আজো পাওয়া যায়নি। এরপর পরশুঘার নামক চিত্রগুপ্ত বংশীয় এক অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ কায়স্থ তাম্রলিপ্ত ও কাশীজোড়া প্রদেশের রাজা হন। তিনি নাকি সনাঢ্য বংশীয় এক ব্রাহ্মণকে অপমান করার ফলে তাঁর বংশ নির্বংশ হয়। একাহিনী পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করেছি।

এরপর কাশীজোড়া রাজতক্তে আমরা যাঁকে রাজারূপে পাচ্ছি তিনি হলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব গঙ্গানারায়ণ রায়। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিমাঞ্চলের সরন্দদেশ। পুরীতে জগন্নাথ দেব দর্শন কামনায় আগমন করেন। কিন্তু নিজের কার্যদক্ষতা ও যুদ্ধনৈপুণ্যে পুরীর দেবরাজের সুনজরে পড়ে আর তিনি দেশে ফিরতে পারলেন না। দেবরাজ তাঁকে সৈনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। এরপরের উড়িষ্যার ইতিহাস ঘটনাবহুল ও যুদ্ধবিগ্রহে বিপর্যস্ত। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে কালপাহাড়ের উড়িষ্যা বিজয়। এই হিন্দু বিদ্বেষী বীরের নৃশংস অত্যাচারে সারা বাংলা ও উড়িষ্যার বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন মুকুন্দদেব।

দেবরাজ ও মুকুন্দদেব একই ব্যক্তি কিনা জানা যায়না। যাইহোক এই কালাপাহাড়ের গতিরোধ করার জন্য গঙ্গানারায়ণকে দেবরাজ সসৈন্যে প্রেরণ করেন। গঙ্গানারায়ণ এই যুদ্ধে কোথাও কোথাও অনেকটা কৃতকার্য হন, ফলে দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে জায়গীর স্বরূপ কাশীজোড়া পরগণা গঙ্গানারায়ণকে প্রদান করেন। তখন কাশীজোড়া পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ থেকে গঙ্গানারায়ণ পরিবারও আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে নিয়ে এসে, কাশীজোড়ায় রাজ্যস্থাপন করেন। কিছুদিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনী ভুঞা রায়কে জমিদারী প্রদান করে শ্রীক্ষেত্রধামে গিয়ে বসবাস করেন এবং তথায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যামিনীভানু রায় ভূঞা নবাবদরবারে গমন করেন এবং তাঁর সাহায্যে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে রাজগির সনন্দ নিয়ে কাশীজোড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর রাজা যামিনী ভানু রায় জঙ্গল কেটে শুরা নামক গ্রাম স্থাপন করেন ও তথায় একটি বৃহৎ সরোবর খনন করান। এই সরোবর জানুদীঘি নামে আজিও বর্তমান আছে পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে। এই জানুদীঘি সরোবর প্রতিষ্ঠা কালে উড়িষ্যার যাজপুর থেকে দুটি সপুত্রক ব্রাহ্মণ আনীত হয়েছিল। উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও তদ্বংশীয়গণ মেদিনীপুরে "গৌড়াদ্য-ব্যাস" ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশে 'ব্যাস-বৈদিক' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন। (গদাধর ভট্টের কুলজী)

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে যামিনী ভানু রায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র প্রতাপ নারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট থেকে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। এবং ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরীর দেবরাজের দ্বারা রাজটীকা ও শ্বেতছাত্রাদি প্রাপ্ত হন। হরশঙ্কর গ্রামে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। এই গ্রামের নিকট দিয়ে গৌরী নামে কংসাবতীর একশাখা প্রবাহিত ছিল। আজিও এই নদীর চিহ্ন দেখা যায়। হরশঙ্কর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও

বর্ত্তমান আছে। প্রতাপনারায়ণ প্রতাপপুর গ্রাম স্থাপন করেন। এই স্থানও পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হলে তৎপুত্র হরিনারায়ণ রায় রাজা হন এবং কৃষ্ণরায় নামক কুলদেবতা স্থাপন করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হরিনারায়ণের মৃত্যু হলে ত্বদীয়পুত্র লছমীনারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। রাজ্যের বহু জঙ্গল কাটিয়ে বহু গ্রাম স্থাপন করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু জাতির লোকজন আনিয়ে নিষ্কর ভূমি দান পূর্বক তাঁদের বাসস্থান দেন। রাজ্যের এইসব উন্নতি করার জন্য নবাব সরকারে নিয়মিত খাজনা দিতে পারতেন না। ফলে নবাব অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন তখন তিনি নবাব দরবারে হাজির হন। কোন উপায় না পেয়ে স্বধর্ম ত্যাগ পূর্বক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই ধর্মগ্রহণের ফলে কাশীজোড়া রাজ্য রক্ষা পায় এবং রাজা বাকি করের দায় থেকে রেহাই পান। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে চাঁচিয়াড়া গ্রামে গড় নির্মান করেন এবং তথায় গৌরী নদীর তীরে একটি সুবৃহৎ মসজিদও নির্মাণ করান। এই মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১১০/০ বিঘা জমিও দান করেন। মসজিদটি চাঁচিয়াড়া গ্রামে আজো বর্ত্তমান আছে। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে লছমি-নারায়ণের মৃত্যু হলে তৎপুত্র দর্পনারায়ণ রায় রাজা হন। কিছুদিন রাজত্ব করার পর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং চাঁচিয়াড়া গড়ে এসে বসবাস করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। অতঃপর দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র জিতনারায়ণ রায় রাজা হন। ইনি কিছুদিন রাজত্ব করার পর নবাব দরবারে কর প্রদানে অক্ষম হয়ে কারারুদ্ধ হন। নানকসাহা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহায়তায় কারাগার থেকে মুক্তি পান। অতঃপর উক্ত নানকসাহা পুরী গমন করেন এবং তথায় জগন্নাথ দেব দর্শন করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় চাঁচিয়াড়া

গ্রামে সঙ্গত স্থাপন করেন এবং তথায় জগন্নাথ বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। জঙ্গল কেটে ফকিরগঞ্জ নামক গ্রাম বসিয়ে নিজ নামে জিতসাগর নামক একটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন এবং নানকসাহাকে বাস করান ও নিজে নানকপন্থী ধর্ম গ্রহণ করেন। জিতসাগর আজিও পুরুষোত্তমপুরের নিকটে বর্তমান আছে, ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জিতনারায়ণের মৃত্যু হয়।

কাশীজোড়া রাজ্যে এরপর রাজা হন জিতেনারায়ণের ভ্রাতষ্পুত্র নরনারায়ণ রায়। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করেই ময়না রাজার সাথে যুদ্ধ করেন এবং ময়না রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নিজ রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। রাজ্যমধ্যে জয়পাটনা গ্রামে জয়চণ্ডী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে অনন্তবাসদেব, দেড়াচক গ্রামে গোবর্দ্ধনধারী ও খসরবন গ্রামে গোপালজীর মূর্তি স্থাপন করেন এবং তাঁদের সেবাদি সুবন্দোবস্তের জন্য ভূসম্পত্তিও দান করেন। নরনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলি আজিও উক্তগ্রাম সমূহে বর্তমান আছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়।

নরনারায়ণের পুত্র রাজনারায়ণ রায় অতঃপর কাশীজোড়ার রাজা হন। ইনিও পিতার মত অত্যন্ত শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হয়েই জঙ্গল কেটে রাজবল্লভপুর গ্রাম নিজনামে স্থাপন করেন ও তথায় নিজ বাসোপযুক্ত একটি গড় নির্মাণ করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথজীর মূর্তি স্থাপন করে রঘুনাথবাড়ী গ্রাম প্রকাশ করেন। এই গ্রামে রঘুনাথ জীউর মন্দির নির্মান করে প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরিদাস বাবাজী নামক এক বৈষ্ণবকে মহন্ত পদে অভিষিক্ত করে কতক জমিদারী দান করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহাপুর রাজার সাথে যুদ্ধ করে সাহাপুর অধিকার করেন। এই সাহাপুর বাসুলী দেবীর সেবার জন্য ৩৬০/০ জমি দান করেন। কতক সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকেও দান করেন। রাজনারায়ণ

রায়ের রাজত্ব কাল বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেমন বীরযোদ্ধা ছিলেন, তেমনি ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালেই "শীতলামঙ্গলে"র অমর কবি নিত্যনন্দ চক্রবর্তীও "সারদামঙ্গলে"র কবি দয়া রামদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ত্বদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরনারায়ণ রায় রাজা হন। তিনি স্বজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে আনয়ন করেন এবং বিভিন্ন জাতীর লোকদিগকে নিষ্কর ভূমি দিয়ে নিজ রাজ্যে বাস করান। রাজবল্লভপুর ছিল তৎকালে বিশেষ উন্নত গ্রাম। এই গ্রামে বিভিন্ন শিল্পীর বাস ছিল। এখানে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য উৎপাদন হোত। তাই তিনি এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করে সুন্দরনগর আখ্যা দেন। এই গ্রাম আজিও বর্তমান আছে। সুন্দরনগর গ্রামের সন্নিকটে জোড়াপুকুর নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর উৎসাহে মছলন্দ শিল্প পরিচালিত হোচ্ছে। ইঁহারই রাজত্বকালে কাশীনাথ বর্মা রেশম ব্যবসা করে প্রভূত উন্নতি করেন। কাশীনাথ দামোদর বর্মমার পূর্বপুরুষ। কাশীনাথ বর্মার নামানুসারেই কলকাতার উত্তরে কাশীপুর স্থানটির নামকরণ হয়। এখন যে স্থানে কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাকটারী অবস্থিত সে স্থানেই ইংরাজদের সূতার গুদাম ঘর ছিল। (নগেন্দ্রনাথ শেঠের গ্রন্থ) কাশীনাথ বাবুর পড়ো অট্টালিকা আজিও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় সুন্দরনগর গ্রামে বর্তমান আছে। ইহা তৎকালে গৌরী নদীর তীরেই ছিল।

কাশীনাথ সুন্দরনারায়ণের কলিকাতাস্থ এজেণ্ট ছিলেন। জমিদারী সম্পর্কিত বিষয়ে পাঁচ বছর ধরে রাজার সাথে কাশীনাথ বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন কোম্পানীকে দেয় খাজনার জমিদার এবং জমিদারী সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে কাশীজোড়া রাজার ব্যবস্থাপক। কিন্তু কাশীনাথ কয়েকটি কিস্তির টাকা

বাকী ফেলেন। এই জন্য কাশীনাথ ও রাজার মধ্যে দেনা পাওনা নিয়ে মতান্তর চলতে থাকে।

বর্ধমানের কালেক্টার কাশীজোড়ার হিসাব পত্র অনুসন্ধান করে দেখেন যে, কাশীনাথেব নিকট গভর্ণমেণ্টের ৭২,৫৫৮-৯-৭ পাই পাওনা আছে। এইটাকা আদায় করবার জন্য সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের আদেশে কাশীনাথকে হাজতে পাঠানো হয়। কাশীনাথ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে জামিনে মুক্ত হন। কাশীজোড়া সংক্রান্ত হিসাবপত্রের বিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করার জন্য কাশীনাথ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করেন। কাশীনাথ উক্ত টাকা জমা দেন এবং গভর্ণর জেনারেল হিসাবপত্র ভালভাবে পরীক্ষা করবেন বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখবার ভার পড়ে খালসা রেকর্ডের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের উপর। ঐ বৎসরেই তিনি হিসাবপত্র দেখে একটি রসিদ দেন। কিন্তু রিপোর্ট কাশীনাথের অনুকূলে ছিল না, তাই তিনি এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান।

"কাশীনাথ বাবু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট উক্ত রাজার বিরুদ্ধে সুপ্রামকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করেন। তাতে রাজাকে ধরবার জন্য ওয়ারেণ্ট বের হয়। শেরিফকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাজা তিন লক্ষ টাকা জামিন দিলে তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। শেরিফের লোক আসার আগেই সুন্দরনারায়ণ জানতে পেরে আত্মগোপন করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় প্রত্যাগমন করেন। তারপর তাঁর জমিদারি ক্রোক করবার জন্য পুনরায় পরওয়ানা বের হয়। এবং তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য শেরিফ সার্জেনসহ ৬০ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি প্রেরণ করেন। তাতে রাজা গভর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করেন যে, উক্ত সার্জন ও অস্ত্রধারীগণ তাঁর কর্মচারীগণকে প্রহার ও আহত করেছে, দরজা ভেঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করেছে, অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছে,

দেবতার অলংকারাদি খুলে নিয়ে দেবমন্দির অপবিত্র করেছে এবং প্রজাগণকে নিষেধ করে খাজনা আদায় বন্ধ করেছে, এরূপ হলে শাসনকার্য অচল হবে বিবেচনা করে গভর্ণর জেনারেল উক্ত আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালন কবতে রাজাকে নিষেধ করেন এবং মেদনীপুরের সৈনিক কর্তৃপক্ষের উপর আদেশ করেন যে যেন শেরিফের উক্ত লোক সকলকে পথে আটক করে। তদনুসারে তারা পথে ধৃত হয়। এই সময় গভর্ণর জেনারেল রাজা, জমিদার ও চৌধুরীগণের প্রতি আদেশ করেন যে, কোন বিশেষ চুক্তি না থাকলে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করে, এবং দেশীয় প্রধান সৈনিক কর্তৃপক্ষকে ঐরূপ কাজে সাহায্য করতে নিষেধ করেন। সুপ্রীমকোর্ট তাঁদের কর্মচারীগণকে গ্রেপ্তার করে সাধারণ জেলে রাখা হয়েছে বলে কোম্পানীর এটর্ণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, এবং গভর্ণর জেনারেলকে উক্ত কাশীনাথের মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য শমন দেন। কিন্তু সুবিখ্যাত হেষ্টিংস সাহেব তদুত্তরে বলেন যে, আমি শাসন ক্ষমতানুসারে যে কাজ করছি, তাতে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ পালন করতে বাধ্য নই, এই ঘটনা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হয়। এই সময়ের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের উক্ত প্রকার অত্যাচার নিবারণের জন্য কলকাতাবাসী সাহেবগণ ও গভর্ণর জেনারেল পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। তদনুসারে পার্লামেন্টের নূতন আইন দ্বারা সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।" (Marshman's History of Bengal, 8th, Edition, pp. 225—27)।

এরপর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেব ৬০ হাজার টাকা, রাজস্ব বাকির জন্য রাজার জমিদারী ক্রোক করেন। তাতে রাজাবাহাদুর বাকি কর থেকে অব্যাহতি ও নূতন বন্দোবস্তের জন্য প্রথমে কালেক্টর সাহেবের নিকট, পরে সদর বোর্ডে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সদর বোর্ডের হুকুম আসতে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হওয়ায়

এবং জমিদারী ক্রোক থাকার জন্য খাজনাদি আদায় না দেওয়ায়, সুন্দরনারায়ণের দেবসেবাদি খরচ নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। রাজা তখন বাকীর কাগজে দস্তখত করে কতকগুলি দেবোত্তর সম্পত্তি খালাস নিয়ে বাকী অন্য সব সম্পত্তিসহ জমিদারী ছেড়ে দেন। এর ঠিক ১৫ দিন পরেই সদর বোর্ড থেকে হুকুম আসে যে, "বাকি কর খালাস দেওয়া যায় ও নূতন বন্দোবস্ত হয়।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৫ দিন পূর্বে বাকীর কাগজ দস্তখত করায় কালেক্টর সাহেব তা' মঞ্জুর না করে ১৩ ভাগে জমিদারী নিলাম করেন। সে সময় রাজা ১৯ হাজার বিঘা জমি লুকিয়ে রাখার জন্য সরকারের কাছে মাসোহরার কোন আবেদন করেন নি। কিন্তু তালুকদারগণ ক্রমে ক্রমে রাজাকে উক্ত লুকান জমি থেকে বেদখল করলে, রাজা কলেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন। তখন কালেক্টর সমস্ত জমি জরিপ করার জন্য ৯ জন কানুনগো নিযুক্ত করেন। ৯ হাজার বিঘা জমি জরিপ হওয়ার পর তালুকদারগণ কৌশল করে দশশালা বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করেন। তাতে কালেক্টর সাহেব মাপ বন্ধ করে রাজা বাহাদুরকে আদেশ দেন যে, "যে সময় সরকারের দরকার পড়বে, সেই সময় দরখাস্ত করবেন।" তাতে রাজা সুন্দরনারায়ণ নিরাশ হয়ে কষ্টে দিনযাপন করতে থাকেন। এবং পরিশেষে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তারপর তাঁর পুত্র বস্তিনারায়ণ রায় রাজাসন প্রাপ্ত হয়ে পুনর্বার কালেক্টর সাহেবের নিকট পূর্বোক্ত লুকান জমি পাওয়ার আশায় দরখাস্ত করে পূর্বমত হুকুম পেয়ে কষ্টে দেবসেবা ও জীবিকা নির্বাহ করে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। এরপর পুত্র লক্ষীনারায়ণ রায় রাজা হন। ইনিও সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এরপর রুদ্রনারায়ণ রায় রাজা হন। বর্তমানে এই রাজবংশ অতি দীনভাবে কাশীজোড়াতে বর্তমান আছেন।

'মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি' পাঠে জানা যায় কাশীজোড়া রাজসভায় সুদর্শন ভৌমিক নামক একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। "পাঁশকুড়া থানার এলাকাবাসী বাবু কৃপারাম রায় এবং বাবু সদারাম রায় মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে বহু পূর্বে মহোচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তর মার্কণ্ডপুরের বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস ইঁহাদের বংশধর।" পৃঃ ১১৩।

ময়না॥ 'ময়না' এই শব্দটি "মোহনা" শব্দের অপভ্রংশ। বহু শত বৎসর পূর্বে কংসাবতী (কপিশা) ও কেলেঘাই নদীর মোহনা থেকেই জেগে উঠে এই চর। তখন লোকে একে 'মোহনাচর' বলত। এই 'মোহনাচর' শব্দটি ক্রমে ক্রমে ময়নাচর>ময়নাচোর> শেষে ময়নাতে এসে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন এই নূতন জেগে উঠা ময়নাচর ছিল জনবসতি শূন্য নির্জন স্থান। ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত প্রভৃতি কবিগণের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় এই ময়না ছিল লাউসেন রাজার গড়। বিস্তৃত ময়না রাজ্যের তিনি ছিলেন রাজা। লাউসেন রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ধর্মমঙ্গলোক্ত কাহিনীর পিছনে কিছু সত্য নিশ্চয়ই ছিল, তা' না হলে এমন একটি বলিষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারত না। "মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে—"ধর্ম মঙ্গল" কাব্যগুলিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিত কর্ণ সেন ও রঞ্জাবতীর সমসাময়িক লোক। তাঁহারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলিয়া তিনিও খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।...রামাই পণ্ডিত গৌড়ের পালরাজগণের সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি দেবপালের সমসাময়িক কালে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির এই উক্তি এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।" পৃঃ ৬০২

কিন্তু আমাদের আলোচ্য হচ্ছে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে নয়, 'ধর্মমঙ্গলোক্ত' ময়না কোথায় ছিল তাই। বহুদিন ধরে বহু পণ্ডিত এই নিয়ে বহু গবেষণা, ও বহু অনুসন্ধান করেছেন। এস্থলে তাঁদের গবেষণার বিষয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করাও সম্ভব নয়। তবে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা' হোল বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই বলেছেন, 'বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান 'ময়নাপুর'ই ময়নানগর। কারণ, এই গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এতকাল পর্যন্ত বাস করিয়াছেন। গ্রামে পাঁচটি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীলনারায়ণ ও 'চাঁদ রায়।' (শূন্য পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ৭৩)।

বসন্ত বাবুর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" লেখক বিনয় ঘোষ মহাশয়। তিনি নিজে দুইটি ময়না পরিভ্রমণও করেছেন। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার এই "ময়নাপুর" ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিগণের বর্ণিত ময়নানগর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ, উক্ত কবিগণ তাঁদের পুস্তকেই ময়না যে কোথায় ছিল, তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

হরিদাস তাম্বুলিকে লাউসেন নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন—

"ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ অবণী।
পিতা মোর কর্ণ সেন মাতা রঞ্জারাণী ॥"

তারপর লাউসেন এলো রমতি নগরে। সেখানে দেখা হোল কর্মকার লাউ দত্তের সাথে। কর্পূর আর লাউসেনের সুন্দর-সুঠাম শরীর দেখে কর্মকার জিজ্ঞেস করলে পরিচয়। পরিচয় দিল লাউসেন—

"ময়না নগর বাটী সাগর সমীপ।
পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ ॥" পৃষ্ঠা, ১২৯

হস্তি-বধ পালায় রাজা যখন আবার পরিচয় জিজ্ঞেস করছেন লাউ সেনের। সেখানেও বলছেন লাউসেন—

"অবনী অনল অংশে উদধি সমীপ।
নিবসতি ময়না নগর নরাধিপ ॥

এই সমস্ত উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় ময়না ছিল সমুদ্রের সন্নিকটে। সেই ময়না রাজ্যেই কর্ণ সেন রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে তিনিই বোধ হয় প্রথম জেগে ওঠা চরে ময়না রাজ্যের ভিত স্থাপন করেছিলেন। তৎপূর্বে জয়পতি মণ্ডল ঐসব জায়গার জায়গীরদার ছিলেন।

সম্প্রতি গবেষক পণ্ডিত অক্ষয় কয়াল মহাশয় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আমায় পত্র দিয়েও জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"ধর্মমঙ্গল-বর্ণিত ময়না যে তমলুকের অন্তর্গত, (লাউ সেনের কাহিনীতে ঐতিহাসিক ছাপ থাকুক বা না থাকুক) সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতকের শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলে লাউসেন কামারের কাছে স্বীয় পরিচয়ে বলিতেছেন—

'ময়না দক্ষিণ দেশে উৎকল বলিয়া ঘোষে
সেই দেশেতে মোর স্থিতি।'

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫১৪)

ঐ শতকের রূপরাম ধর্মমঙ্গলের স্বর্গারোহণ পালায়—

'নানাবর্ণে বাদ্য বাজে ওৎকল ময়না।
স্বর্গ জায় লাউসেন উঠিল ঘোষণা।'

(সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ২৫৬০)

ঐ শতকের বাঁকুড়ার কবি সীতারাম দাসের আখড়া পালায় মোহিনী বেশী অভয়া লাউসেনকে বলিতেছেন—

"না পাইল নাগর পরাণে হল্য শোক।
হাসিতে হাসিতে রাজা পালাও তমলোক।

তমলোকে তোমার পালাও সমাচার।
এত বলি নয়নে ইঙ্গিত একবার ॥”
(সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ২৫৬২)

কয়াল মশাই-এর আবিষ্কৃত তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তমলুকের কাছেই ছিল ময়না রাজ্য। বর্তমান ময়না তমলুকের পশ্চিমে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন—“ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ময়না নগর রাঢ় ভূমির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের একেবারে তীরবর্তী। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, ‘ময়না নগর বাটি সাগর সমীপ’। ইহা হইতে মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার দক্ষিণভাগে ময়নানগর অবস্থিত ছিল। তমলুক মহকুমায় ময়না নামক এখনও একটি স্থান আছে।’ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫৯৩।

গৌড় থেকে ময়না আসতে জলপথ ও স্থলপথে তখন যে সব রাস্তা ছিল এবং দেশ ছিল, সেই সমস্ত দেশ এখনো তমলুকের নিকটে অনেকগুলি বর্তমান আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান এ নয়, তার দু’চারটি পংক্তি উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

গৌড় থেকে ফিরে আসছেন লাউসেন নিজ রাজ্য ময়নায়। সংগে বীর কালুডোম আর তাঁর স্ত্রী সনকা। পথের বর্ণনার মধ্যে একস্থানে আছে—

“মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে ॥
সেদিন সেখানে রণ থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীজোড়া ॥
কুতবপুর রাখি দূর পরম সন্তোষ।”
(ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল)

প্রতাপপুর, কাশীজোড়া, কুতবপুর প্রভৃতি স্থানগুলি আজো বর্তমান আছে এবং এগুলি ময়নার কাছাকাছি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী পুস্তকে মানচিত্র সহ প্রকাশের ইচ্ছে থাকল। সবশেষে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্তমান তমলুকের ময়নাই প্রাচীন ময়না নগর। তবে বর্তমান 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধিধারী রাজবংশধরগণ যে গড়ে বাস করে আছেন, এই গড় প্রাচীন লাউসেনের গড় কিনা তা' নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তিলদার গড় বহু প্রাচীন, একদা সামুদ্রিক বন্দরও ছিল, এ কথা পূর্বেই আমরা প্রকাশ করেছি। হয়ত তিলদার গড় লাউসেনের রাজবাটী হতে পারে, এমন কথা বলা যেতে পারে। তাই বলে দাশগুপ্ত পরেশ বাবুর মতে আমি জোর দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারছি না। বর্তমান ময়নাগড় সম্পর্কে ৬২ বৎসর আগে 'তমোলুক ইতিহাসে' যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

"ময়না রাজবংশের আদিপুরুষ গোবর্দ্ধনানন্দ সবঙ্গ পরগণার জমিদার ছিলেন। ইনি উৎকল রাজার সেনাপতি কালান্দিরাম সামন্তের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ হইতেছেন। (মধ্যের চারি পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না)।* ইনি নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ না করায় দেবরাজ প্রেরিত সৈন্য কর্তৃক উৎকলে নীত ও কারারুদ্ধ হন। তদবস্থায় সুযোগক্রমে আপন সংগীত মল্লবিদ্যা দ্বারা দেবরাজ বাহাদুরকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিয়া বাকি কর ক্ষমা সহ রাজ্য ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি এবং পৈতা (একমাত্র রাজার, রাজটীকাসহ পৈতা গ্রহণ ভিন্ন, দ্বিজ জাতির ন্যায় আদৌ উপনয়ন সংস্কার হয় না।) [রক্ষিত মহাশয়ের এইরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 'জানা' বংশের কোর্ষিনামা প্রকাশ করব,

* মধ্যের এই চার পুরুষের নাম হোল (১) ধরণীধর সামন্ত (২) বৈষ্ণবচরণ সামন্ত (৩) চৈতন্যচরণ সামন্ত (৪) নন্দীরাম সামন্ত। মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি, পৃঃ ১৩২।

তাতে স্পষ্টই লেখা আছে এই জাতির পৈতা ছিল, শুধু রাজা নয়, রাজবংশধরগণও বংশপরম্পরায় পৈতা ব্যবহার করতেন।] ছত্র, নিশান এবং ডঙ্কা প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু তৎকালিক ময়না রাজা শ্রীধর হুই রাজকর প্রদান না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করায় তাঁহাকে শাসনসহ ময়না পরগণা অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক যুদ্ধ দ্বারা শ্রীধর হুইকে নির্বাসন করিয়া ময়না পরগণাও শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্বে উক্ত ময়নাগড় গৌড়াধিপতির শালীপতি কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র রাজা লাউসেন (যাঁহার ইতিহাস কবি দ্বিজরূপরাম, কবিরত্ন ঘনরাম চক্রবর্তী, কবি নৃসিংহ বসু ও কবি মাণিক গাঙ্গুলির রচিত পৃথক পৃথক চারিখানি ধর্মায়ণ ও ধর্মসংগীত নামক পদ্য পুস্তকে প্রকাশ আছে।) ও তৎপুত্র রাজা চিত্রসেন রাজত্ব করেন। শ্রীধর হুই ঐ বংশের কোন শাখা কি অন্য বংশের ছিলেন তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং গোবর্দ্ধনানন্দের পূর্বপুরুষের বিস্তারিত বিবরণও দৃষ্টিগোচর হয় না। গোবর্দ্ধনানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন, এবং ময়নাগড় দুর্গম দেখিয়া তথায় রাজধানী করিয়া বাস করেন, ও তিলদাজলচক গ্রামেও একটি গড়বাটী নির্মাণ করেন। (তিলদা নামক স্থান কিন্তু বহু প্রাচীন।) তাঁহার মৃত্যু হইলে মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র, গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র, কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ক্রমান্বয়ে ময়না সবঙ্গ পরগণায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকালে কয়েক বৎসর উপর্যুপরি ফসল অজন্মাহেতু ও অপরিমিত দায়িত্বহীন গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় সবঙ্গ পরগণা নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তমর্ণগণের প্রাপ্য আদায় জন্য ময়না পরগণার অধিকাংশ গ্রাম ও নিষ্কর ভূমি খণ্ড খণ্ড

রূপে নিলামে বিক্রয় হয়। ঐ সকল বিক্রী অংশে এক্ষণে শত শত তালুকদারের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকাল জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে ইহার পুত্র রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাসন প্রাপ্ত হন। ইনি অতি মিষ্টভাষী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সহিত সমব্যবহারগুণে পরগণার প্রজাবৃন্দ ইঁহার দ্বারে পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার্থ প্রার্থিত হইত এবং ভেটী প্রদান করিত। তজ্জন্য ইহার যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সেই বর্দ্ধিত আয়ের সৎব্যবহার দ্বারা নিজ গৌরব বৃদ্ধির সহিত অনেক রাজার আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হওয়ায় উপরোক্ত বৃদ্ধি আয় সহ গৌরব অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার তিন পুত্র—প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্রেরও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে। পৃঃ ৯১—৯২।

বর্তমান রাজগণ যে গড়ে অবস্থান করছেন তার পরিমাণ ফল ৩০০ শত বিঘারও অধিক। ইহার চতুর্দিকে কালিদহ পরিখা, বিস্তার ২৭৫ ফিট, দৈর্ঘে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৭৫০ ফিট। ইহার চতুর্দিকে উচ্চ ভূখণ্ড পরিসর ২০০ শত ফিট, দৈর্ঘে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ হাজার ফিট। বাইরে মাকরদহ, বিস্তার ১৭৫ ফিট, প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ ১৪০০ শত ফিট, গভীরতা ৮ থেকে ১৫ ফিট, উক্ত পরিখাদ্বয়ে কুমীর ও মৎস্যাদি ছিল। পূর্বে উভয় পরিখার মধ্যবর্তী স্থান উচ্চ ভূখণ্ড ঘনাবৃত দুর্ভেদ্য পার্বত্য বাঁশের ঝাড় ও বহুবিধ পাহাড়ি বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সব অরণ্যে হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্য জন্তু বিচরণ করত। এক্ষণে ঐসব জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে শস্যক্ষেত্র ও টাইল কারখানা স্থাপন হয়েছে। গড়ে উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বংশধরগণ কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

একটি নবাবিষ্কৃত কোর্ষিনামা

এখন আমরা যে কোর্ষিনামাটি এখানে উদ্ধৃত করছি, এটি তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার বিরুলিয়া গ্রামের বিখ্যাত 'জানা' বংশের পূর্ব ইতিহাস। এই কোর্ষিনামাটি এতদিন অনাবিষ্কৃত ভাবে উক্ত বংশের বংশধর ব্যায়ামাচার্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ জানা মহাশয়ের কাছে রক্ষিত ছিল। সর্বপ্রথম আমায় এই পুঁথিটির সন্ধান দেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়, তাঁরই নির্দেশে আমি বিরুলিয়া থেকে এই কোর্ষিনামার অবিকল নকল করে আনি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই বংশেরই সুসন্তান। এই বংশের ৩৭ পুরুষ প্রসাদ জানা এই কোর্ষিনামার সংগ্রাহক ও রচয়িতা। বর্তমান ৪৩ পুরুষ চলছে। আজ থেকে তা'হলে ৬ পুরুষ আগে এই কোর্ষিনামাটি লিখিত হয়েছিল। ৩ পুরুষে যদি একশত বছর ধরি তা'হলে আজ থেকে প্রায় দু'শত বছর পূর্বে এটি সংকলিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু লেখার ছাঁদ দেখে মনে হয় দেড়শত বছরের বেশী পুরান নয়।

এই বংশ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের বংশ। খুব সম্ভবত রাজা মুকুন্দদেব ১৫৫০ থেকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেবকে পরাজিত করেন। মুকুন্দদেব থেকে ১৪ পুরুষ হরিবল্লভ দেব উড়িষ্যার শেষ প্রান্তে রাইমণি কেল্লার রক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়েই বাংলা ১০১২ সালে এই কেল্লার জীবন শেষ হয়। এই বংশ ঐ সময় অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেদিনীপুরে চলে আসে। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনি বীরত্বপূর্ণ। এই সংগে আমরা তৎকালিক তাম্রলিপ্তের অনেক অজানা ইতিহাসও জানতে পারব।

রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ইতিহাস এই কোর্ষিনামা থেকে অনেকাংশ জানা যাবে। তাই তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে এই কোর্ষিনামা আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আমরা নিম্নে এই কোর্ষিনামার অবিকল নকল উদ্ধৃত করছি—

বংস পরিচয়

প্রভু জগন্নাথ পদে করিএ প্রণাম।
বংসাবলি লিখিলাম শুন দিয়া মন॥
পুরি রাজবংশে জন্মি কর্ম্মফল গুণে।
অধিষ্ঠান হল পরে ভুবনেশ্বর ধামে॥
দেবপূজা ভার লয়ে থাকে সুখে সেথা।
বংস বৃদ্ধি হয়ে শেসে যায় যথা তথা॥
রাইমণী নামে দুর্গ আছে নদী ধারে।
তথায় করিল হানা রাজ্য রখিবারে॥
মুকুন্দদেবের জায়া রাণী রাইমণি।
সেই নামে গড় হয় রাখিতে অবনী॥
তথায় করিলা বাস বহু জ্ঞাতিগণ।
হাতী ঘোড়া লয়ে থাকে হরসিত মন॥
সেকালে একদিন গভীর নিশিতে।
পাঠানের সৈন্যদল এল আচম্বিতে॥
ষোলশত সেনা সহ দারে হানা দিল।
দক্ষিণ দ্বারেতে ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল॥
তিনদিন যুঝে সবে করি প্রাণপণ।
অবশেষে গেল সবে সমন ভবন॥
সব সেনা মরিলেক হাতি ঘোড়া সহ।
মরিলা সকল জ্ঞাতি নাহি রহে কেহ॥

তখন রমণীগণ রণে দিলা হানা।
জয়কালী বলি পড়ে অস্ত্রের ঝনঝনা ॥
মারিআ বহুত সেনা উজাড় করিলা।
অবশেষে পড়িলেক সব রাজবালা ॥
বিধির অপূর্ব লিলা কহা নাহি যায়।
স্মরিলে সে সব কথা প্রাণ বাহিরায় ॥
পঞ্চজনা নর আর চারি জনা নারি।
কোনমতে রক্ষে প্রাণ পরিখা সাঁতারি ॥
নহিলে বংসের চিহ্ন রহিত না আর।
কি কব দুঃখের কথা নাহি পারাবার ॥
কোথাএ রহিলে আজ পুরনারিগণ।
কোথায় রহিলে পিত্রিপিতামহগণ ॥
স্বর্গধামে সবে গেলা করি ঘোর রণ।
হেথায় দুঃখের কথা করগো স্মরণ ॥
কোথা রাজ্য কোথা ধন কোথা গেল পুরি।
এ ঘোর অরণ্য মাঝে সহায় শ্রীহরি ॥
কোথায় সাবিত্রী রাণী করিআ সমর।
শতশত সৈন্যে মারি গেলা যম ঘর ॥
মস্তক তোমার দেবি কাটি লয়ে গেল।
অধম সন্তানে মাগো হৃদে দেহ বল ॥
বহু পুরনারি সহ যুঝিলে সমরে।
সকলিত গেল চলি কৃতান্ত আগারে ॥
সতী ধর্ম্ম সবে নাহি দিয়ে বিসর্জ্জন।
ক্ষত্রিয় বনিতা হয়ে সধর্ম্ম পালন ॥
অমানিশা ফাল্গুনের সংক্রান্তি দিনেতে।
চলি গেলা সবে সর্গে দুন্দুভি ধনিতে ॥

ভুবন ভরিআ যম রাখি গেলা সবে।
বংসের তনয় সবে নাহি পাসরিবে॥
অশ্রু মাত্র চিরতরে করিএ সম্বল।
অধম প্রসাদ লিখে হৃদে নাহি বল॥
বংসের তনয় সবে যে যেখানে থাক।
স্মরহ পূর্ব্বের কথা কভু ভুল নাক॥
যশমান কুল ধর্ম্ম উদ্ধারিতে সবে।
করিহ সংগ্রাম যদি দিন পাহ ভবে॥
ধর্ম্মরাজ্য ধর্ম্মপুরি যারা নষ্ট কৈল।
তার রাজ্য ধ্বংস হবে পাপ পূর্ণ হৈল॥
যথাধর্ম্ম তথা জয় চিরদিন হয়।
কর্ম্মফল ভোগ তরে জয় পরাজয়॥
সমূলে পাঠান বংশ তরা ধ্বংস হবে।
শ্মশান হইবে পুরি সিবা বিচরিবে॥
সেই মত লিখি আমি করিএ প্রকাশ।
বংসের সন্তান তার মনে রাখি আস॥
বহু বহু বীর জন্মি জয়ডঙ্কা লয়ে।
রাখিলা বংসের মান ভুবন ভরিত্র॥
যতসব রাজগণে কন্যা নিল দিল।
যাহারা অচল সবে পড়িয়া রহিল॥
দেবস্থান বাস্তুধাম অতি সন্তর্পনে।
বাস্তুনাগ রহে হেথা দক্ষিণের কোণে॥
দেবনারি আছে বৃক্ষে সেত বস্ত্র পরি।
এই দুই যেবা দেখে ভাগ্যের সঞ্চারি॥
মাঝে মাঝে দেখা দেন পুরনারিগণে।
অস্তিত্ব জানায় তাঁরা মঙ্গল কারণে॥

দূরে থাকি নাহি ভাষে মনে নাহি আস।
হেথাএ আসিলে হবে জ্ঞান পরকাস॥

রাজ্য হরি রাজ্য পেয়ে পুন তাহা জায়।
তথাপি অক্ষয় বংশ ক্ষয় নাহি পায়॥

অধিক কহিতে মোর নাসরে বচন।
বৎসরেতে একদিন করিবে সরণ॥

পিতৃ পুরুষের গাথা মঙ্গল কারণ।
শ্রীহরি পদারবিন্দ করিএ স্মরণ॥

হে হরি বিশ্বের পতি করুণা নিদান।
ভবে কেন এত দুঃখ কিসের কারণ॥

তব মূর্ত্তি জগন্নাথে সেবি গুরুজন।
লভিলা অক্ষয় সর্গ পুণ্যের কারণ॥

সেই বংসে জন্ম লভি সেই রক্ত ধরি।
বিচার করিলে কিসে ভবের কাণ্ডারি॥

তবমান রক্ষিবারে পুরি ধ্বংস হইল।
পিতৃপিতামহগণ রণে সব মৈল॥

তারসহ মরিলেক পুরনারিগণ।
অশ্বপৃষ্টে বর্সা লয়ে করি ঘোর রণ॥

কি শোধ লইলে রাজা রাজদণ্ড ধরি।
অরণ্য বাসেতে হেথা ঘোর দুঃখে মরি॥

হাতি ঘোড়া অগণিত লাখ লাখ সেনা।
নিমেসে উড়াতে পার পাঠানের হানা॥

জ্ঞাতির নিধন দেখি হরসিত মন।
ইহা যদি সত্য হয় অবস্য নিধন॥

তোমার নিকটে করি এই নিবেদন।
অবশ্য করিয়ে তাহা রাজার বিধান॥

জয় জয় জগন্নাথ করুণা নিদান।
অধম প্রসাদে দিও শ্রীচরণে স্থান॥

শ্রীশ্রীহরি—

বংসাবলী পরিচয়

পুরী রাজা মহামতি শ্রীমৎ মুকুন্দদেব তস্য ভ্রাতা রঘুনাথদেব তস্য নিবাস বায়ান্ন বাটী মর্দ্দে ছিল তৎপরে খুরদায় গিয়া বসত করে ঘরাও বিবাদ ক্রমে বসত বাটী ছাড়িয়া জায়া পুত্রাদি সমভিবাহারে ভুবনেশ্বর মন্দিরে আসিয়া তথাকার জমিদারী নিয়া তথায় বসত করে ও সেহেও মন্দিরের সেবা পূজার খিচমত করিতে থাকে ভুবনেশ্বর মন্দিরের চল্লিশ হাজার বিঘা ছিল—

সে মতে মুল বংশ পরিচয় রাজা মুকুন্দ দেবকে জানানায় তদঊর্দ্ধ পুরুষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই—
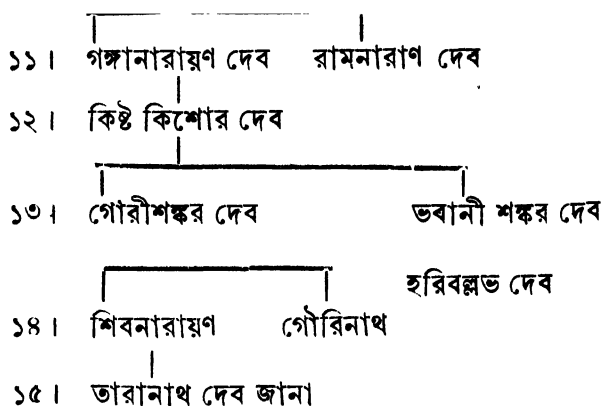
আন্দাজ ২৭০ বৎসর মৰ্দ্দে এতক কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নাই জাহা লিখা যায় এতক কাল মৰ্দ্দে কটক ও বালেশ্বর জেলায় বহু স্থানে বহু কুটুম্বিতা হইআছে বহু জাতি নানাস্থানে লখরাজ আদি লইয়া বাস করিতেছে তাহারা দেশাচার ক্রমে ক্রমে পট্টনাএক ও মাহান্তী পদবী নিজেরা মনফাই মতে লইয়াছে তাহারা কেহই পুরী কি খুরদার জমিদারির ভাগ বখরা পায় নাই তাহাদের কোনো পরিচয় এথায় দেত্ত্যা গেল না গৌরীনাথ অপুত্রক মরে ভুবনেশ্বরে * * বহু জ্ঞাতি হওয়া আপনারা বিবাদ করিতে থাকে সে মতে হরিবল্লভ ওখান হইতে আসিয়া পুরা রাজ্যের হুকুম সুরত উড়িষ্যায় প্রান্তে রাইমণা কিল্লায় বাস করিলেক তারানাথ কর্ণগড় রাজার কন্যাকে বিবাহ করে তাহার নাম লক্ষ্মীমণা দেই তারানাথ পরে মহিমানিত পুরীরাজের হুকুম সুরত নদী পারে চন্দ্রায়নী কিল্লায় বাস করিলেক রাইমনী কিল্লা আড়দীর্ঘ্য চার যোজন ছিল পাঁচ হাজার সেনা বহু হাতী ঘোড়া তথায় থাকিবার উপায় ছিল চারটি গড়খাই পার হইয়া সেথায় যাইতে হইত নদী কতক দূরে ছিল রাইমনী কিল্লার চারিধারে চল্লিশ হাজার বিঘা জমি ছিল ওড়িষ্যা রাজধানী

রক্ষার্থ ওহার দুই জনা হরিবল্লভ ও তারানাথ দুই পার্শ্বে বহু সেনা হাতী ঘোড়া আদি লইআ বাস করিলেক[১]।

১ উড়িষ্যার প্রান্তে এই রাইমণি কেল্লা কোথায় আছে অনুসন্ধান করার জন্য আমি গত ২৩শে জুন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মঙ্গলবার উড়িষ্যা যাত্রা করি। দাঁতন দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে বালেশ্বর জেলায় উপস্থিত হই। লোকের মুখে শুনি ঐ জেলায় বিরাট রাজার গড় আছে। শুনে আশ্চর্য হই। হেথায় আবার বিরাট রাজার গড়! সাড়ে তিন হাজার বছর পুর্বে মহাভারতীয় যুগের সেই গড় কি আজো অভগ্ন অবস্থায় উড়িষ্যাতে থাকা সম্ভব। যাইহোক আমরা দু'জন সাথী সহ কলতাগড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুত রাধিকারঞ্জন দাস মহাপাত্রের আতিথ্য গ্রহণ করে উক্ত বিরাট রাজার গড় দেখতে যাই। যেয়ে যা দেখলাম, তা আমার এই কোর্বিনামার সাথে অবিকল মিলে যায়। এখনো চারটি পাথরের দেওয়াল ভগ্ন অবস্থায় বর্তমান আছে। প্রথম যে চার যোজন-এর কথা—অর্থাৎ দৈর্ঘ প্রস্থে ৩২ মাইল বর্গাক্ষেত্রাকারে উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন অবস্থায় আজো বর্তমান আছে। গড়ের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। প্রথম পরিখার পর যে চল্লিশ হাজার বিঘা জমির কথা উল্লেখ আছে, তাতে এখন চাষ-আবাদ হচ্ছে। দ্বিতীয় গেট অর্থাৎ প্রাচীর-এর মধ্যে একটি গ্রাম আছে নাম রাইবনিয়া। এই গ্রামটি খুব সম্ভব রাইমণি কেল্লার শেষ স্মৃতি বহন করছে। এই গ্রামে ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে। গ্রামে কয়েকটি অবস্থাপন্ন লোকের বাসও আছে। গড়ের শেষ প্রাচীর ও পরিখা এখনো সুস্পষ্টভাবে অন্তত ৮।১০ ফুট উচ্চ বর্গক্ষেত্রাকার একরকম অভগ্ন অবস্থায় আছে। মধ্যে বড় বড় পুকুর এখনো দেখা যায়। কয়েকটি ঢিপি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে। সম্ভবত এইগুলি প্রস্তর নির্মিত বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। একটি নিমিত প্রাসাদের কিংবা ঠাকুর বাড়ীর ভগ্নস্তূপ আজো আছে। এই বাড়ীর একাংশের আলোক চিত্র এই পুস্তকে প্রকাশ করা হোল। ইংরেজ রাজত্বের সময় এই গড়ের মধ্যে নীলের চাষও হয়ে ছিল। নীল তৈরীর চৌবাচ্চা দেখলে তা স্পষ্ট
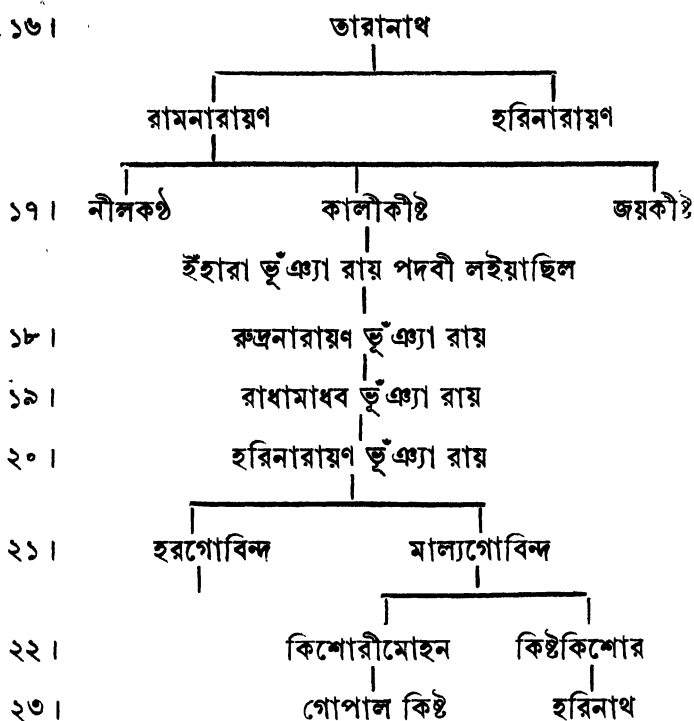
বোঝা যায়। উক্ত মন্দিরের কাছে চণ্ডী ঠাকুর নামে একটি কারুকার্য-খচিত ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড পূজিত হচ্ছে। কে পূজক জানা যায়নি। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ এখানে মেলা বসে। সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় নাকি এখানে আসা যায় না। সকলেই ভয় করে। যেতেও বাধা দেয়। আমাদের প্রবল বাধা অগ্রাহ্য করেও যেতে হয়েছিল। উত্তরদিকে একটি গেট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী হয়েছিল, তা' এখনো বেশ বোঝা যায়। রাধিকারঞ্জনবাবু বললেন উড়িষ্যার ইতিহাসে নাকি এটি রাই বলিয়ার সিং-এর গড় বলে বর্ণিত আছে। ফকীর মোহন সেনাপতির এই গড়ের পটভূমিকায় একটি বই আছে নাম 'লছমি'। আসলে এই বিরাট রাজার গড় যে রাইমণিকেল্লা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দাঁতন থেকে এই স্থান ১২।১৪ মাইল পথ হবে। হাঁটা ছাড়া যাওয়ার কোন পথ নেই।

হরগোবিন্দ জানা পদবী ব্যবহার করিত এই পদবী রাজবংশের লোক ব্যতীত অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পারিত না গোপাল কিষ্টের ছয় পুত্র ছিল। তাদের বিবরণ পরে বলিব কিষ্টকিশোর বালীসীতা গড়ের দেওয়ান ও সেনাধ্যক্ষ ছিল তস্য পুত্র হরিনাথ বালীসীতা গড়ের কন্যা কমলিনী দেইকে বিভা করে বালীসীতার একটি তালুক যৌতুক পায় তদপরি সে অপুত্রক মারা যায়। ইহার আন্দাজ শতেক বৎসর রাইমনী কিল্লায় বাস করে সন ১০১২ সালের ফাল্গুন মাসে বহু মোছলমান ঐ কিল্লা চড়াও হইয়া তাহা ঘেরাও করে[১] ঐ কিল্লা চড়াও হইয়া তাহা ঘেরাও করে

১ বাংলা ১০১২ সাল অর্থাৎ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিহাসে এই সময় মোগল-পাঠান বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল-রাজ ভাণ্ডারের প্রধান হিসাব রক্ষক আবদুল রজ্জককে পাঠানেরা বন্দী করে নিয়ে যায়। শ্রীপুর অত্তয় নামক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রজ্জককে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়। এক ভীষণ দর্শন পাঠান ছিল তার রক্ষক। আদেশ ছিল তার উপরে যদি মোগলেরা জয়ী হয় তা'হলে রজ্জকের মস্তক খণ্ডিত করে যেন পাঠান শিবিরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মোগলদের গোলার আঘাতে পাঠান রজ্জকের মৃত্যু হয় এবং পাঠানেরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। তখন তারা বাংলা থেকে উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়ে নতুন করে সুযোগের সন্ধান করেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠানেরা উড়িষ্যার ছোটখাট দুর্গ বাহুবলে জয় করেন। এবং পাঠান নেতা ওসমান খাঁ কুড়ি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে খুব প্রবল ব্যক্তি মনে করেন। খুব সম্ভবত ঐ সময় ১০১২ সালে রাইমনী কেল্লার ধ্বংস হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ওসমানের

তিনদিন যুদ্ধ হইবার পর বহু সেনা ঘোড়া হাতী বরকন্দাজ আদি মারা জায় তদপরে রাণী সাবিত্রী ও বহু রমণী ঢাল-তলওয়ার লইআ ঘোর যুদ্ধ করে ও শেষে সকল নারী মারা জায় ৫জনা পুরুষ ও ৪ জনা মেয়ে মানুষ কোনমতে পরিখা সাতরাইআ পলাইতে পারিআ ছিল সেওয়ায় উক্ত কিল্লার আর কেহ বাঁচে নাই কোথক ছেলেকে মুছলমান মারিআ জায় আর কোথক পরে পাওয়া জায় গোপাল কিষ্টের ৩ পুত্র জুদ্ধে মারা জায় জনেক বন্দী হইআ ছিল কিন্তু পরে পলাইআ আসে মোসলমানরা গড় লুঠ করে বহু ধনরত্ন লইআ জায় মৃত্য রাণীর মাথা কাটিআ জায় তেজষপত্র জাহা ছিল দিঘীতে ফেলাইআ জার কোবাট দোয়ার ভাঙ্গিআ চুর করে এমতে কিল্লার দফা রফা করে ছয় মাস মোছলমান লুট করিআ শেসে পলাইয়া জায় তদপরে বহুদিন কেহ থাকে নাই শেসে বর্গীরা তথায় কোথক দীন বসতী করিয়াছিল[১] সেতক সেথায় আর কেহ বাস করে নাই। আন্দাজ ৮০ বৎসর সে কিল্লায় বাস ছিল একাল মর্দ্ধে কেহ কেহ

অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব মোগলদিগকে বিস্মিত করেছিল। এই যুদ্ধে মোগল সেনাপতি সুজায়ত খাঁর প্রাণ সংহার হয় ও পরাজিত ওসমান খাঁ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন। সুবর্ণরেখার অনতিদূরেই রাইমণি কেল্লা অবস্থিত।

১ বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে ১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বর্গী বিদ্রোহ চলে। এই সময় বর্গীরা নবাবের বিদ্রোহী কর্মচারী মীরহবিবের সহায়তায় হুগলী ও হিজিলি থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর পর্যন্ত, এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল করে নিয়ে ছিলেন। বালেশ্বর জেলায় এই দুর্গ অবস্থিত পূর্বেই বলেছি। সেই সময় লক্ষ্মী নামক কোন বিদেশী সুন্দরী রমণীকে রাজঘাট থেকে ধরে নিয়ে এসে বর্গীরা এই দুর্গে আটক করে। সে কাহিনী উড়িষ্যার সাহিত্যিক ফকীরচন্দ্র সেনাপতি লছমি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

খশুরই তুর্কার বর্দিষ্ট বেক্তির সহিত কন্যা আদান প্রদান করে নেওয়ায় অন্য কোন ঘরে কেহ বিভা করে নাই জে সকল পুরুস ও মেয়ে মানুস কিল্লা হইতে পলাইআ আসিতেছিল তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ব্রজতুলাল ঠাকুরের বাটীতে কথক দিন ছিল ও সেইকালে মোছলমান বাদসার ভারি জুলুম ছিল মোছলমান চারিধারে লুটপাঠ করিত ধনী লোকের প্রাণের আশা খুব কম ছিল মেয়ে মানুষ লুট করিআ লইআ জাইত ওহারা কথক দিন পরে চন্দ্রমণী কিল্লা লুঠ করে (শুনেছি চন্দ্রমনি কিল্লার ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনো আছে। তবে আমরা সে কেল্লার কোন অনুসন্ধান করতে পারিনি সময় অভাবে)। বহু লোককে খুন করে কিন্তু মেয়ে মানুষ কাহাকেও ধরিআ লইআ জাইতে পারে নাই তাহারা সকলে জুদ্ধ করিআ মরিআছে কেহ ধরা দেয় নাই এহার কথকদিন পরে ব্রজতুলাল ঠাকুরের ঘর লুঠ হয় তাহাতে ওহার ঘরের সকললোক পালাইআ বাঁচে এমতে সেথায় কাহারও বাস করা আদৌ নিরাপত্ত নহে বিবেচনা করিআ সকলে পূর্বদিকের খাল দিআ বড় নদীতে আইসে ৫।৬ দিন তক নৌকা বাইআ হিজলী রাজ্যে আইসে ঘোর জঙ্গলের মর্দ্ধে আসিআ এক জায়গায় গাঙ্গের ধারে বাস বসাইয়া তথায় কথক ও নৌকায় কথক থাকে সেওয়ায় তদপরে জঙ্গল কাটিআ ঘর বান্দিআ তাহাতে ক্রোমে ক্রোমে বাস করে ব্রজ ঠাকুর কোথক দিন কিছু দক্ষিণে এক স্থানে ছিল পরে দক্ষিণে কথক তুরে গাঙ্গের ধারে জঙ্গল কাটিআ বাস তৈরী করে এহা এক্ষণ লখী মৌজা কহে গোপাল কিষ্টর পুত্রগণ যেথায় বাস বান্দিআছিল তাহাকে পরে বিরূলিআ কহে এথায় তদপূর্বে কেহ বাস করে নাই পুব দিকে খালি জঙ্গল মহাল ছিল দেড়কোস তফাতে সাগর নদী ছিল গঙ্গাসাগর যাইতে হইত সেই নদী সেথায় ছিল মস্তবড় নৌকা না হইলে সেথায় কেহ জাইতে পারিত না সেওয়ায় নোতন চড়ায় ঠেকিআ কোথক জাহাজ মারা জাইত। জাহারা নৌকা করিআ রাইমণী কিল্লা হইতে এথায়

পলাইয়া আসিল তাহারা জে খোরাকী আনিয়াছিল তাহাতে কোনমতে কোথক দিন গেল তদপরে ঘোর জঙ্গল মর্দ্ধে কোন খোরাকী না পাইআ কোথক লোক মারা জায় বেমারী হইআও কোথক মারা জায় জাহারা বাচিআ ছিল তাহারা কোনমতে বহু কষ্টে ছিল কোথক দিন উপাসে কাটাইয়াছে নৌকাপথে ধান আনিতে হইত তাহা বড়ই দুর্গম ছিল সকল সময়ে নিরাপত্ত ছিল না বাএন্দাতে কতক লোকালয় ছিল তথায় ধান চাইল পাওআ জাইত তথা হইতে আসিতে ৩।৪ দিন লাগিত ওইরূপ কষ্টে তাহারা কোনো মতে বাচিয়া ছিল মেয়ে ও পুরুস মানুস সাকল্যে ৫৩ জনা আসিয়া ছিল দুই মাসের পর মাত্র ২৩ জনা রহিলেক এদেশে কোথাও মিঠা জল ছিল না নৌকা করিয়া বাএ নদী হইতে নৌকা বুজাই করিআ জল আনিতে হইত জে সকল পুরুষ মানুস রহিলেক তাহারা হরিণ বাঘ মারিআ বহু স্থানের জঙ্গল কাটিয়া জমিমজকুরা চাষের মত করে দেওয়ায় বহু বন্য বরাহ আসিয়া উৎপাত করিত জঙ্গল বড়ই দুর্গম ছিলো তীর মারিলে উহারা বন মর্দ্ধে অদৃশ হইত পুরুস মানুসেরা অনেক দিন হরিণ মাংস খাইয়া দিন গুজরান করিত চাউল না পাইলে বন আলু ও ফল খাইত তাহাও বড় কষ্টেই মিলিত বাএন্দার এদিকে কোন লোকালয় ছিল না কেবলই জঙ্গল মর্দ্ধে মর্দ্ধে কোথক কোথক ছোট ছোট জলা জমি পড়িআ ছিল তথায় হরিণ, বরাহ চরিআ থাকিত বড় বড় গাঙ্গ নদী চারদিকে ছিল জলে বহু কুমির থাকিত এহারা কোথক দীন বহু গ্রাম এক বালি জায়গা বাহির করে সেথায় কোথকটা জঙ্গল কাটিআ তথায় একটি ছোট ডোবা খনন করে তাহাতে মিঠা পানি পাওয়া জায় সে মতে জলের অভাব আর থাকে নাই তাহাতে এক্ষণে ব্রজ ঠাকুরের বংস বাস করিয়াছে তাহা পরে লখীর গড় হইআছে ওই ছোট ডোবা তাহারা বুজাইআ দেয় নাই খালের নিকট আছে। তখন ব্রজঠাকুর তথায় বাস করিতে জায় ওই

ঠাকুরের বংসের কেহ কেহ বহু পরে আসিয়া ছিল কিন্তু আমাদের বংসের আর কেহ না থাকায় কেহ আসে নাই জাতায়াতের পথ নাই সে মতে কোনো বান্ধবাদী কোনো খবর করে নাই কোথক দিন পরে অনেক বান্ধব জানিতে পারিআছিল কিন্তু পথ দুর্গম হওয়ায় কেহ আসিতে পারে নাই এমতে আন্দাজ ২০।২৫ বছর কাটিআ গেল সকল লোক মোছলমান ও বর্গী ভয়ে কোথাও বাহির হইতে পারিত না সঙ্গে নৌকা দেখিলে ভাঙ্গিয়া ডুবাইয়া দিত কোনো বাঘ বাহির হইলে তীরকাঁড় লইয়া জাইতে হয়
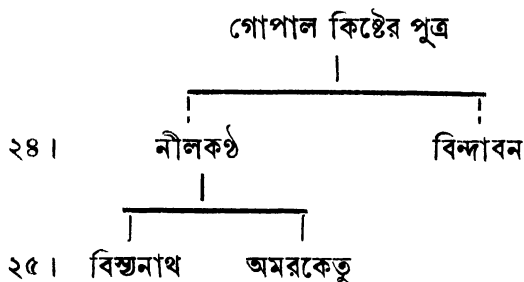
অমরকেতু কুতুবপুর রাজের সেনাপতি ছিল ইহার ভারী জবরদস্ত ক্ষমতা ছিল কোঁথক দিন পরে পুরীর রাজার কাছে চণ্ডভীম খেতাব পাইআছিল তস্য ভগিনী সুগন্ধাকে কুতুবপুর রাজা হরিদেব সিং বিভা করে বিস্যনাথ তস্য পুত্র রুদ্রনারাণ কটক জিলার কুজং রাজার কন্যা কিষ্টমনীকে বিভা করে ওই রাজা রাজার বান্ধব হয় রাধামাধব তস্য পুত্র হরিচরণ এহার দুই কন্যাকে তুর্কা রাজার দুই ভাই বিভা করে হরিচরণ বিভা কালীন বহু জোতুক দেয় কিসোরী মোহন ভদ্রকের জমিদার পট্টনাএক ঘরে বিভা করে ও জায়গীর পায়।

২৫। বিশ্বনাথ

২৬। রুদ্রনারায়ণ

রাধামাধবের বণিতা হৈমবতী দেই নারায়ণগড় রাজার কন্যা হয় হরিচরণ বলরামপুর রাজার কন্যা রুক্মিনী দেইকে বিভা করে কালীচরণ বিভা করে নাই নারাণগড় রাজার নাম শ্রীমৎ হরচন্দ্র রায় এহার ৩ ভাই মুকুন্দলাল ও মুরারিলাল বলরামপুরের রাজা শ্রীমৎ রাজচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর রাজা শ্রীমৎ দেবনারায়ণ রায় বলরামপুর রাজার জ্ঞাতি হয় হরচন্দ্র সবং জমিদার রাজকৃষ্ট দাসের কন্যা নাম সত্যভামা দেইকে নন্দকিসোর অমষীর বলরাম চৌধুরীর কন্যা সুভদ্রা দেইকে বিভা করে কিষ্টকিসোর বিভা করে * * ভবানীপ্রসাদ তিলদার জমিদার তুলসীরাম দাসের কন্যা যমুনামণিকে বিভা করে ব্রজদুলাল চংরাচকের বলরাম রায়ের কন্যা ললিতা দেইকে বিভা করে গোপীনাথ বালেস্বর জিলায় বাসুদেবপুর মৌজায় মাহান্তি

জমিদারের কন্যা সুষমা দেইকে বিভা করে রাধাস্যাম ওক্ত জিলার বাস্তরে জমিদার পরমেস পট্টনাএক এর কন্যা রাজেস্বরী দেইকে বিভা করে ওই দুই জনা বাসুদেবপুরে কুড়ি হাজার বিঘা ও বাস্তরে দশ হাজার বিঘার জায়গীর পাইআ ছিল গোপীনাথ উত্তম পণ্ডিত আগমবাগীস হয় কোথক পুস্তক রচনা করে চৌপাড়ী ছিল রাধাস্যামের দুই কন্যা ছিল এক কৃষ্টপ্রিয়া দেইকে ময়নার রাজা গোকুলানন্দ বিভা করে[১] আর এক কন্যাকে সুজামুটার রাজা কার্তিক চন্দ্র বিভা করে কিন্তু লিখি বিভার কোথক দিন পরে দুই জনার কাল হয় বিস্যানাথ* রাজার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেইকে বিভা করে ওহার নাম শ্রীমৎ রামহরি দাস ওহার ৩ ভ্রাতা ছিলো মোজো অপুত্রক মরে মোছলমান বাদসার সময়েতে রাজধানী লুঠ হইআ জায় রাজবাটীর কোন লোকের কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই রুদ্রনারায়ণ মালজিটা[২] মহাল একলক্ষ্য তঙ্কা মালগুজরি সুরত বন্দোবস্ত লইআ ছিল ওই মহাল দৈর্ঘ্যে কুড়ি কোশ ও প্রস্থ চারি

১ গোকুলানন্দ ছিলেন মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্রের পুত্র। গোকুলানন্দ খুব সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ময়নার রাজা ছিলেন।

২ 'মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত 'খাস' সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমীদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মসনদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের 'খাস' অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়। নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে:—

১। জলামুঠা জমিদারী:—(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেওড়ামাল বিশওয়ান, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫

রাধামাধবের বণিতা হৈমবতী দেই নারায়ণগড় রাজার কন্যা হয় হরিচরণ বলরামপুর রাজার কন্যা রুক্মিনী দেইকে বিভা করে কালীচরণ বিভা করে নাই নারাণগড় রাজার নাম শ্রীমৎ হরচন্দ্র রায় এহার ৩ ভাই মুকুন্দলাল ও মুরারিলাল বলরামপুরের রাজা শ্রীমৎ রাজচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর রাজা শ্রীমৎ দেবনারায়ণ রায় বলরামপুর রাজার জ্ঞাতি হয় হরচন্দ্র সবং জমিদার রাজকৃষ্ট দাসের কন্যা নাম সত্যভামা দেইকে নন্দকিসোর অমর্ষীর বলরাম চৌধুরীর কন্যা সুভদ্রা দেইকে বিভা করে কিষ্টকিসোর বিভা করে * * ভবানীপ্রসাদ তিলদার জমিদার তুলসীরাম দাসের কন্যা যমুনামণিকে বিভা করে ব্রজদুলাল চংরাচকের বলরাম রায়ের কন্যা ললিতা দেইকে বিভা করে গোপীনাথ বালেস্বর জিলায় বাসুদেবপুর মৌজায় মাহান্তি

জমিদারের কন্যা সুষমা দেইকে বিভা করে রাধাস্যাম ওক্ত জিলার বাস্তরে জমিদার পরমেস পট্টনাএক এর কন্যা রাজেস্বরী দেইকে বিভা করে ওই দুই জনা বাসুদেবপুরে কুড়ি হাজার বিঘা ও বাস্তরে দশ হাজার বিঘার জায়গীর পাইআ ছিল গোপীনাথ উত্তম পণ্ডিত আগমবাগীস হয় কোথক পুস্তক রচনা করে চৌপাড়ী ছিল রাধাস্যামের দুই কন্যা ছিল এক কৃষ্টপ্রিয়া দেইকে ময়নার রাজা গোকুলানন্দ বিভা করে[১] আর এক কন্যাকে সুজামুটার রাজা কার্তিক চন্দ্র বিভা করে কিন্তু লিখি বিভার কোথক দিন পরে দুই জনার কাল হয় বিস্যানাথ* রাজার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেইকে বিভা করে ওহার নাম শ্রীমৎ রামহরি দাস ওহার ৩ ভ্রাতা ছিলো মোজো অপুত্রক মরে মোছলমান বাদসার সময়েতে রাজধানী লুঠ হইআ জায় রাজবাটীর কোন লোকের কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই রুদ্রনারায়ণ মালজিটা[২] মহাল একলক্ষ্য তঙ্কা মালগুজরি সুরত বন্দোবস্ত লইআ ছিল ওই মহাল দৈর্ঘ্যে কুড়ি কোশ ও প্রস্থ চারি

---

১ গোকুলানন্দ ছিলেন মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্রের পুত্র। গোকুলানন্দ খুব সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ময়নার রাজা ছিলেন।

২ 'মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটি তাজ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলার রাজ্যভুক্ত 'খাস' সম্পত্তি ছিল ; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ জমীদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মসনদ্‌-ই-আলা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের 'খাস' অংশগুলিই বাহাদুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত ভাব দেখিয়া এই দুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমর্থিত হয়। নিম্নে মিঃ গ্রাণ্টের রাজস্ব বিবরণী (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে :—

১। জলামুঠা জমিদারী :—(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত) ১ জলামুঠা, ২ কেন্তড়ামাল বিশওয়ান, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫

কোশ ছিল বিস্তনাথের কাল হইলে তস্তপুত্র রুদ্রনারায়ণ ইহার মালিক হন কিন্তু সময় মত মালগুজরি দিতে না পারায় বাদসা কাড়িআ লয় ওই মহলে আন্দাজ ৩৫ বৎসর দখল করি পরে কোথক কাল নিমক পোক্তন চান কোথক দিন গতে প্রবান (?) ও অঠি (?) বন্দোবস্ত হয় মালজিটা মহালের জমা আদায়ের জন্ম বহু বরকন্দাজ রাখিতে হইত সেওয়াঅ তেমন আদায় হইত না একারণ রাখিতে পারা জায় নাই প্রগনা ও তুমারী বন্দোবস্ত হইলে আবার কোথকদিন এহারা লইআছিল এমতে ওই মহাল লইআ (প্রগনার নাম ভাগ নিম্নে ফুটনোট দিয়েছি।) বহু গোল হয় পরে এহারা একবার ছাড়িআ দেয় নন্দকিসোর নারায়ণগড় রাজা শ্রীমৎ হরিদেব শ্রীচন্দন এহার গড়ে সেনাপতি হইআ থাকে,[১] এহার কোথক উত্তর দিকে এহার এক বান্ধব রাজা ছিল তাহার কিল্লা মঘুপুরে ছিল সে রাজার নাম হরদেব চৌধুরী তাহার ৪ ভ্রাতা পাশাপাশি ৩টি গড় তৈয়ার করিআছিল নারায়ণগড় বড় রাজা ছিল বহু হাতি ছিল ঘোড়া ৫০০ ছিল হাতি ২০০ ছিল

পাহাড়পুর, ৬ গন্তমেশ, ৭ নয়াচক বাজার, (বায়ন্দা বাজার), ৮ ভাইট গড় (সরকার বালেশ্বর), ৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল, ১১ আগ্রাচৌর, ১২ মীরগাদা, ১৩ ভোগরাই।

২। মাজনামুঠা জমিদারী:—(সরকার মালজেঠিটা) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরো দুরনান, ৩ নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কসবা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ, ৭ নয়াবাদ (দেবমুঠা), ৮ শরীয়াবাদ, ৯ আলীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার মুজকরি), ১১ পটাশপুর, ১২ কিস্‌মৎসীপুর।—হিজলীর মসনদ-ই-আলা পৃ: ১০০-১০১

এই খাস জমিদারী নিয়ে যে বেশ গণ্ডগোল হোত তা এই কোর্ষিনামা থেকেও বোঝা যায়।

১ শ্রীচন্দন বংশীয় রাজগণ নারায়ণগড়ে ১২৭৩ খ্রী:—১৮৮৩ পর্যন্ত ২৬ পুরুষ রাজত্ব করেন।

তীরন্দাজ ২৫০০ ছিল ঘোড়সআর বহুত ছিল এ তসওয়াঅ পদাতি সেনা ২০ হাজার ছিলো এহার রথ চলিত বর্গী হেথায় ভিড়িতে পারিত না রাজা অপুত্রকে মরে ঘরাও বিবাদে বহু গোলযোগ হইআ শেষে বাদসা গড় দখল করে জিনিস তৈজসাদি কোথক লুঠ হয় কোথক কম্মচারী বরকন্দাজরা লইআ পলাইআ জায় ২ রাণী সহমরণ করে নন্দকিশোর পুরী গিআছিল তথা হইতে ফিরিআ আসে নাই স্থুনা জায় তিনি আসিবার পথে সাক্ষীগোপাল দিআ আসিতে ছিল তথায় মারা জায় সেওয়ায় আর কোন খবর কেহ পায় নাই। বংসের যাহারা কটক বালেশ্বর জিলায় বিভা করিআছিল তাহারা সকলেই দসীসৌচী এখানের বহু লোক মাসা সৌচী থাকায় কোথক আচার ব্যাভার প্রিথক আছে[২] সেমতে তাহারা এবংসের লোককে ক্রমে ক্রমে ঘৃণা করিতে থাকে ও কেহ কেহ কুবাক্য বলে তাহতে এহারা রাগীয়া পৈতা ফোলাইয়া দেয় তদবধি পৈতা ধারণ করে নাই ও দসাসৌচী পরিত্যাগ করিআ মাসাসৌচী হয় এমতে সকল সাবেক জ্ঞাতি ও কুটুম্ব বান্ধব পরিত্যাগ করিল ক্রমে গতায়ত বন্ধ হইল ও আর কেহ জায় নাই তথাত্র গতায়াত বহু দুর্গম ছিল নৌকা পথে গতায়াত চলিত সেওয়ায় অন্য কোন ভালো পথ ছিল না কোথাও কোথাও ডাঙ্গা পথ ছিল কিন্তু তস্কর ভয় নিতান্ত ছিল সে কারণ বড় কেহ যাইত না তথাকার কেহই এতুর দেশে আসিত না ব্রজতুলালের কন্যা রাইকিসোরীকে তুর্কার রাজা বিভা করে।

২ তমোলুক ইতিহাসকার বলেছেন—"ইঁহাদের কোন কালে কোন দেশে উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াও শ্রুতিগোচর হয় না।" পৃঃ—৮৬। রক্ষিত মহাশয়ের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা এই কোর্ষিনামা প্রমাণ করিবে।

ব্রজমোহনের ৭ পুত্র ছিল।

প্রসাদের বণিতার নাম কুঞ্জ দেই
রঘুনাথের বণিতার নাম সরলা দেই
টীকারামের বণিতার নাম অহল্যামনী দেই
বিনন্দরামের বণিতা রাজেশ্বরী দেই
গোবিন্দরামের বণিতা লক্ষ্মীমণি দেই
বাবুরামের বণিতা হরিপ্রিয়া দেই
সাধুচরণ বিভা করে নাই।

মনোহর জানার বণিতা সাবিত্রী বাহিরির রাজ বংসের মনোহর দাসের কন্যা উক্ত বংসের এক্ষণে কেহ নাই নামা মানীয় হইআছে কেহ কেহ ওড়িস্যায় গিয়াছে বাকী ২।৪ জনার বিশেষ কোন সন্ধান কেহ রাখে নাই রঘুনাথ অমর্ষীর চৌধুরী বংসের দামোদর চৌধুরীর কন্যা বিভা করে ব্রজমোহন বণিতা কলিকা স্যালী স্বরূপচন্দ্র দাসের কন্যা ছিল প্রসাদ এ টীকারাম সংস্কৃত ও ওৎকল ভাসায় পণ্ডিত ছিল প্রসাদ মহাভারত লিখিআ ছিল। বাবুরাম কবিরাজী ও জ্যোতিসের কাজ করিত এহাতে বড় পণ্ডিত হইআছিল রঘুনাথ বিনন্দরাম সাধুচরণ বিভা করে নাই এই সাত জনা অতিশয় বলবান ছিল এহাদের রামসিং ও ভীমসিং করিআ ২টি বড় বড় লাঠি ছিল তদ্দারা এহারা জেথা সেথা অতি দ্রুত যাইতে পারিত ও বড় বড় বাঘ হরিণ মারিতে পারিত বরাহ মারিত রঘুনাথ বাসুদেবপুরে ও বিনন্দরাম ময়না গড়ে সেনাপতি ছিল তথায় এ জাতির বহুলোক পাইক বরকন্দাজ ছিল তীরকাঁড় মারিত ১১৫৫ সালে বর্গীর যুদ্ধে রঘুনাথ

বিষ্ণু মৃতিদ্বয় (জিষ্ণুহরির মন্দির)

রাইমনি কেল্লার একাংশ (উড়িষ্যা)

প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (রাইমনি কেল্লা)

বুকে তীর গাথিয়া যাওয়ায় ঘোড়াসহ মরে বিনন্দরাম তদপরে ময়নার তিলদায় বর্গীর যুদ্ধে আহত হইয়া বাড়ী আসিআ কোথক দিন আর মারা যায় সাধুচরণ ও গোবিন্দরাম বহু বরকন্দাজ লইআ নানাস্থানে থাকিত তাহাদের সহিত হিজলীর মোছলমানদের মাঝে মাঝে জমি লইআ মারামারি হইত তাহাতে বহুলোক জখম হইত সেমতে সহজে কেহ ধরা দিত না বাবুরাম কুতুবপুরে জমিদার রাজা হরিনারায়ণ সিংএর বাটীতে থাকিত ওই রাজার দুই পুত্র বর্গীর জুদ্ধে মারা যায় গোবিন্দরাম কোথক দিন মহিষাদলে ছিল ১১৭৬ সালে রঘুনাথ ঈড়িঙ্কির দীঘি খনন করিয়া ছিল ১১৮০ সালে ওই ব্যক্তি জুখিয়ার দিঘী কাটে ও তথায় বিগ্রহ মূর্তি যাপন করে বাসদেবপুর জমিদারের খরচে ঐসকল কাজ হইয়া ছিল মলঙ্গিরো (মলঙ্গি জাতি) রোজ দুই পাই মজুরীতে দিঘী খনন করিআছিল চাউল এক তঙ্কায় ১ মোণ ছিল বহু লোনা মাছ পাওয়া জাইত মাছ হরেক রকমের ছিল ঈড়িঙ্কির দক্ষিণে ঘোর জঙ্গল ছিল তাহার পর বড় নদী ওহার পচ্ছিমেও নদী ছিল জঙ্গলে বহু বরাহ আছে তথায় কেহ যায় না। মলঙ্গীরা[১] পশ্চিম প্রদেশ হইতে ক্রমে এদেশে

---

১ এই মলঙ্গী জাতিরা সত্যই বড় দুর্দান্ত ছিল। লবণ তৈরী করিত একথা মিথ্যে নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হিজলীর মলঙ্গীরা বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে বীরকুল, বালিসাই, মিরগোদা প্রভৃতি পরগণার রঘু দিন্দা, ভগবান মাইতি, বলেন কুণ্ডু, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু, বৈষ্ণব ভুঞা প্রভৃতি বহু মলঙ্গী সল্ট কমিটির প্রেসিডেন্টের নিকট বহুপ্রকার দুর্নীতির অভিযোগ জানান। মলঙ্গীরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না অধিকন্তু নানা রকম নির্যাতনও সহ্য করত। ১৮০৪ সালে বহু মলঙ্গী কলকাতায় গিয়ে তাদের অভিযোগ পেশ করে। এদের নেতা ছিলেন পরমানন্দ সরকার। ৩০০ শত মলঙ্গীকে নিয়ে কাঁথিতে তিনি কারকুহার সন্ সাহেবের কাছারীতে উপস্থিত হন। অবিলম্বে তাঁদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেন। ১৮০৬ সালের ৪ই মে একশত অনুচরসহ পরমানন্দ মিঃ ম্যাসনের নিকট উপস্থিত হন এবং দাবী মেনে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। মলঙ্গীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে

আসিয়া বসত করিআছে তাহারা জীর্ণ কৌপিন পরিধান করিআ থাকে লবণ মারিয়া থাকে তাহারা ক্রমে সংখ্যায় বেশী পরিমাণে আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা বাস করিবার নিমিত্তে বহু স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিতে থাকে। সেরূপ চাষে ধান বহু পাইত, তবে বন্য বরাহ বহু উপদ্রব করিত। মাঝে মাঝে উহারা মারামারি করিয়া মরিত কাহারও কথা শুনিত না বরাহ হরিণ স্বীকার করিয়া খাইত।
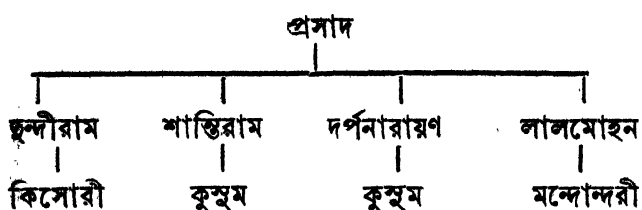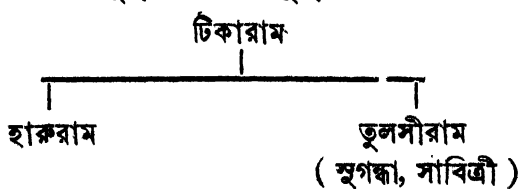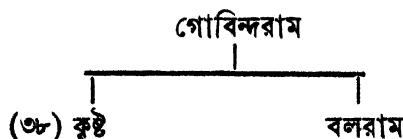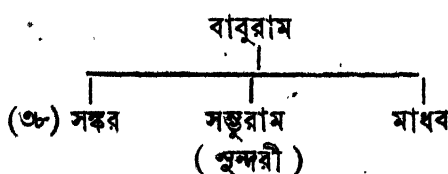
হিজলী এজেন্টগণ নাজেহাল হয়ে উঠেন। প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে সাহেবদের বিরুদ্ধে এরূপ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বড় সোজা কথা নয়। মেদিনীপুর পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৬২ শারদীয় সংখ্যা।

এতক ৩৯ পুরুষ লেখা হইল।

গোবিন্দরামের পুত্র বলরাম রেয়াপাড়ার শিব মন্দিরের মাঙ্গলি পাথরটাকে এক হাতে তুলিয়া ২৬ হাত দূরে ফেলাইয়া দিয়াছিল। রঘুনাথের বনিতা সরলার নামে সরলিয়া চক হইয়াছে সেথায় বালেশ্বর হইতে বহু জালিক আনাইয়া বাস করাইয়াছে এছাড়া বালিচক ২৩০/০ বিঘা বিন্দাবনচক ৩০০/০ বিঘা মধুসূদনচক ৬০০/০ বিঘা লাখী গ্রামে ৬০০/০ বিঘা ও বিরুলিয়া মৌজায় ১৮০০/০ বিঘা ভুঁমি জোত আবাদ কারণ রাখিআছিল ওহারা নিজবাটির কাজ ও খিজমত করেন দুই চাকর এক পটনাএক অন্য মাহুনাএক ও নাপিত হরি প্রামাণিককে বালেশ্বর জিলা হইতে আনিয়া বাসস্থানে স্থাপন করে হরি পট্টনাএক উত্তরে মাহুনাএক খালের পুবদিকে নাপিত দক্ষিণ দিকে রাখে তথায় ব্রজঠাকুরের বংসের কেহ কেহ ছিল পরে ছাড়িয়া লাক্ষী গড়ে গিয়া বাস করে বাসের কোথক উত্তরে বেহারা ৬ ঘর ও কাঁড়ওয়ালী ডোম দুই ঘর আনিয়া রাখা হয় মধুসূদনচক রাজা নরনারায়ণ এর পূর্ব পুরুষকে দান করা হয়। কৃষ্ট ও বলরাম আদৌ বিভা করে নাই ওহারাও রামসিং, ভীমসিং, লাঠী লইআ চলা ফেরা করিত চোর ডাকাত মারিয়া উজাড় করিআ ছিল। এহারা লাঠী দিয়া বাঘ, হরিণ বরাহ মারিত রঘুনাথ ও বিনন্দরাম লাখী মৌজায় একটি ৪/০ বিঘা বড় পুকুর কাটাইয়া ছিল তাহার

চারিধারে সসান হইয়াছে নিজদের সবদাহ জন্য পৃথক একটি পুকুর ও পাড় সমান করিআ ছিল বীরুপাক্ষ নামে বিরুলিয়া হয় সে কথা পরে কহি এহাদের ভারী জবরদস্ত তলায়ার ছিল সেই সকল তোলাআর কোথক বর্গীর যুদ্ধে ও কোথক মোছলমানের কাছ হইতে কাড়িআ লইআছিল। কুন্দা বন্দুক কোথক এপ্রকারে কাড়িয়া লইআ ছিল কিন্তু তাহার বারুদ না পাওয়ায় কোনো কাজ হয় নাই। বলম ও কতক লইয়াছিল সেওয়াঅ ঘোড়ার সাজ বহু কাড়িয়া আনিয়াছিল ওহারা বহু বিপন্ন নরনারীকে তস্কর আদীর হাত হইতে উদ্ধার করিত তেমতে ওনারা সকলের ভালো হইয়াছিল চারদিকে সকলে ওদিককে বড় ভয় করিত ওহারা মোটা বাসের কাড় ৮০০ হাত তক তীরকাড় মারিতে পারিত এক এক কাড়ে বাঘ মরিত বহুত বাঘ ও হরিণ চামড়া ছিল দর্পণারাণ কলমদানে মুঠা মারিয়া বাঘ মারিয়া ছিল তাহাকে বাঘ কামড়াইআ দিআছিল সেথায় ঘা হইআ মারা জায় মাধব পা পথে গয়াধাম গিয়া ফিরিআ আসে এক বছর লাগিয়াছিল কৃষক বোঞ্চব হইআছিল তাহাকে উত্তরে সামিজ দেওয়া হয় হরিরাম কোথকদিন ময়নাগড়ে ছিল সম্ভু কোথক দিন তুর্কাগড়ে ছিল সঙ্কর ও কষ্ট বাসুদেবপুর গড়ে ছিল লাল মোহন বালীসীতা গড় ও কুতুবপুরে ছিল বলরাম সুজামুঠা গড়ে ছিল এহারা সকলেই সেনাপতি ছিল সেকালে যখন তখন বর্গীর হাঙ্গামা হইত লোক ভয়ে জলে ডুবিয়া মাথায় হাড়ী দিয়া লুকাইত কচি ছেলের মুখে কাপড় বান্দিআ দিত বর্গীরা জাহা পাইত তাহা লুঠ করিত মানুষ দেখিলে কাটিআ ফেলিত মেয়েমানুষ সুশ্রী দেখিলে লইআ যাইত নতুবা বেইজ্জত করিত লোকে দামামা বাজাইআ জানাইত তাহাতে সকল লোক সাবধান হইত বনে ঝোপের ভিতর লুকাইত।

ছন্দিরামের কন্যা রাইকমলিনীকে সুজামুঠার রাজা কিষ্টচন্দ্র

নারায়ণ রায় বিভা করেন ছুন্দিরাম ও শান্তিরামের জ্যেদে গোলকেন্দ্র কথক দিন ময়না গড়ে থাকেন রামমোহনের আর এক ভগিনীকে নাম সত্যভামা দেঈ ময়নার কেয়ারানায় রামমোহন রায়কে বিভা দেওয়া হয় ওহারা ময়না রাজার জ্ঞাতি হয়

এদেশে যাহারা আসিয়া বাস করিআছে তাহারা সকলে পছিম ও দোখিন হইতে আসিয়াছে ক্রমে ক্রমে বাস হইয়াছে মলঙ্গিরা বেশী আসিয়া ছিল তাহারাই এ প্রদেশের মদ্দ্যে স্থানে স্থানে বাস বান্দিয়া বাস করিয়াছে তারপরে কোথক চাষী লোক আইসে তাহারা কাটাজমি কর দিয়া লইয়া তথায় বাস করিআছে।

॥ সেনাপতি মহাবীর অমরকেতু চণ্ডভীম ॥

এই বংসের অমরকেতু প্রথমাবস্তায় কুতুবপুর রাজার সেনাপতি ছিল। পরে অন্যান্ন্য রাজার অধিনে বহু বহু কার্জ্জ করিআছিল তাহার অধিনে ৫০ হাজর পদাতি ২ হাজার ঘোড় সওয়ার ৫ শত হাতি ও বহু বহু বরকন্দাজ ছিল এই ব্যক্তি শতেকের অধিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শেষে পুরির রাজার আদেশে মত্তহাতির সুঁড় ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মাটিতে সোওয়াইআ দিয়াছিল এমতে মাল্য বহু বকসীস দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া শেষে চণ্ডভীম উপাধি দিয়া আড়ম্বরে বিদায় দেন

এই ব্যক্তি ছোট খেজুর গাছ জটা ধরিয়া উপড়াইতে পারিত। বনের বাঘকে মুঠার ঘায় মারিতে পারিত গুড়ি কাঠ লইআ বহু বহু কসরত করিত মোটা বাঁস পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া ছুই হাত দিয়া সুমুখে টানিয়া ভাঙ্গিতে পারিত। ১৫ মন ওজনের পাথর একলা বহন করিতে পারিত। ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার উপর লাফাইয়া উঠিয়া অব্যর্থ তীর মারিতে পারিত ৩ হাত লম্বা আধমন ওজনের ছুইটি তলওয়ার লইয়া ২ হাতে জুদ্ধ করিতে পারিত।

ও মন ওজনের প্রকাণ্ড পিতলের গদা লইয়া জুদ্ধ করিত এমতে বহু বহু কসরতের কার্য করিয়াছে।

অমরকেতু বিভা করে নাই। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মারা যায় এ ব্যক্তি বহু জুদ্ধ জয় করিআছিল তাহার বিবরণ কহিয়াছি এ ব্যক্তি বড় ধর্মপরায়ণ ছিল। বহু দান ফেরাত করিআছে এ কারণ বহু লোকের ভাল্য ছিল। এক রাত্তিরে গড়ে আসিবার কালে পথমদ্ধ্যে একটি বড় ঘরে ডাকাতি হুইতে ছিলো। প্রায় ১০০ ডাকাত বহুত অস্ত্রাদি লইয়া আক্রমণ করি আছিল হেনকালে সেই পথে সেনাপতি অমরকেতু ঘোড়া ছুটাইআ জাইতেছিল। হাঙ্গামা দেখিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার বুঝিআ তক্ষণাত লোহার ডাণ্ডা লইয়া ষাড়ের মত ডাকাত দলকে আক্রমণ করিল একাকী জুদ্ধ করিআ অর্দ্ধেক ডাকাত নিস্মুল করিআ শেষ করিল বাকী কোথক বন্দী হইল ও কোথক আহত হইয়া পালাইআ যায়। এমতে একলা বহু বিক্রোম প্রকাশ করিআ বহু নারীর মান ইজ্জত রক্ষা করিআছে। এ কাজ্য করিআ তাহার আন্দাজ লক্ষাধিক টাকা রক্ষা করে ও মান ইজ্জত রক্ষা পায় কিন্তু কোনো পুরস্কার গ্রহণ করে নাই। মুছলমান ও বর্গীর হাত হইতে বহু নারীর মান রক্ষা করিআছে। বহু বর্গী ও পাঠান মারিআ উজাড় করিআছে। কঠিন জ্বরারোগে আক্রান্ত হইয়া সেষে মহাবির হাজার হাজার লোককে বান্দাইআ মারা যায়। এই মহাবীরের বহু শত সিস্য ছিল। এ জাতির বহু বীর না থাকিলে পাঠানের ও বর্গীর অত্যাচারে দেশ উজাড় হইআ জাইত। এহার প্রতাপে শত্রুগণ থরহরি কম্পান্বিত হইত।

এই বংশের অন্যান্য বীরগণের পরিচয় ঃ

এহাদের সকলের কথা কহি যে ইহারা সকলেই প্রশংসিত বীর ছিল। নবাবের আমলে ইহারা বন্দুক ব্যবহার করিত। বারুদ হাতে তৈয়ার করিয়া লইত। বড় বড় তলোআর, তীর ধনুকবাণ,

রামসিং ও ভিমসিং নামক লাঠি ছিল। এমতে ইহারা নির্ভএ বিচরণ করিত। দুর পথে জাইতে হইলে ঘোড়ায় চড়িআ জাইত। জঙ্গলে গিয়া বাঘ হরিণ কুমীর আদি কত মারিত। দুদ্দান্ত জলদস্যুকে জব্দ করিত। এহাদের প্রতাপে দেশে বহু সান্তি ছিল। লোকে বর্গী বা পাঠানের ভয় করিত না। স্থানে স্থানে ঘাটি থাকিত তাহাতে লোকে পহরির কাজ্য করিত। দরকার হইলে দামামা বাজাইআ লোকজনকে জানাইআ দিত। তাহাতে সকলে সাবধান হইত কেহ কেহ স্থানান্তরে জঙ্গলে লুকাইত। এমতে বর্গীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত। দস্যু ভয় ও যথেষ্ট ছিল তাহারাও গ্রাম লুণ্ঠন কাজ্য করিত।

এই খানেই প্রসাদ জানা রচিত কোর্ষিনামা শেষ। এর পরও এই বংশ-এর কোর্ষিনামা আছে। সে কোর্ষিনামা নিম্নে প্রকাশ করছি।

৪১। শরৎচন্দ্র
৪২। সুনীলকুমার অরুণকুমার আশীষকুমার
৪১। অনঙ্গমোহন
৪২। অমূল্যরতন হরিপদ বিষ্ণুপদ শক্তিপদ
৪২।
রজত নিতাই
৪২। বিধুভূষণ
৪৩। দেবপ্রসাদ শিবপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ শক্তিপ্রসাদ
৪০। লক্ষ্মীনারায়ণ
৪০। অনিরুদ্ধ
৪১। কৈলাস
৪৩। গজেন্দ্র ভূষণ
৪২। ধরণী
৪২। সুধীর
৪৩। অনিল সুশীল
৪৩ চিত্ত সনা
৩৮। নরসিংহ
৪০। নবীনচন্দ্র কৃপাসিন্ধু মধুসূদন দীনবন্ধু জগবন্ধু
যতীন্দ্র
৪১। ক্ষিরোদ কুমেদ রজনী সুরেন্দ্র ধীরেন্দ্র
৪০। জগবন্ধু
৪১। অমরেন্দ্র সত্যেন্দ্র সমরেন্দ্র
৪২। বিদ্যুৎ
সরিৎ শ্যামল শোভন অশোক

৪০ পুরুষ মধুসূদন জানা বাংলার অতি প্রাচীন সংবাদপত্র "নীহার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকা আজো প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ইনি আরো বহু পুস্তকও প্রকাশ করেছেন। ৪১ পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ জানা কবি ও সাহিত্যিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। আশুতোষ জানা সমাজ সংস্কারক ও বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। বিদেশ থেকে কতকগুলি ডিগ্রি পেয়েছিলেন। শরৎ জানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম-এস-সিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ছিলেন। বিধুভূষণ বিখ্যাত ব্যায়ামাচার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দু'তিন খানা পুস্তকও লিখেছেন। বিভূতি ভূষণ সাহিত্যচর্চা করেন। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ৪২ পুরুষ সুনীল কুমার জানা বিখ্যাত ফটো-গ্রাফার। এর তোলা ছবি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিজস্ব স্টুডিও কলকাতায় আছে। বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করলে এই বংশের দান তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে যে অনেকখানি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজরক্ত এই বংশে আজো প্রবাহিত। একদিন যে বংশ ছিন্নমূল অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাণটি হাতে করে নিয়ে মেদিনীপুর অঞ্চলে চলে এসেছিল; সেই বংশ পরবর্তীকালে তমলুক তথা মেদিনীপুরের ইতিহাসকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছিল।

এতদিন আমরা এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারিনি। এমনি হয়ত আরো অনেক গৌরবপূর্ণ বংশের ইতিহাস আজো আমাদের কাছে অজানা আছে অনুসন্ধান করলে হয়ত আবিষ্কৃত হতে পারে। এতদিন বালেশ্বরের যে দুর্গ "বিরাট রাজার গড়" নাম অভিহিত হোত, যার প্রকৃত ইতিহাস ছিল অজ্ঞাত—আজ অন্ততঃ জোর গলায় বলতে পারি—না, এ বিরাট রাজার গড় নয়, এ হোল রাইমণি কেল্লা। যেখানে রাজা মুকুন্দ দেবের উত্তর পুরুষগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যুদ্ধ করে বীরত্বের সাথে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল।—এ হোল সেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্র।

চৈতন্য দেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নাকি উড়িষ্যার রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধ্বংস করেছিল। প্রেমের বন্যায় উৎকলবাসী ভেসে গিয়েছিল, তাই নাকি তাঁরা পাঠান-মোগল আক্রমণের সময় দেশকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের হাতের অসি প্রেমের ভরে খসে পড়ে গিয়েছিল। আজকে কি বলতে পারি না যে—না, এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। সাবিত্রীর বীরত্ব, রাইমণি কেল্লার সৈন্যগণের অপূর্ব আত্মত্যাগ উড়িষ্যার ইতিহাসে কি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত নয়? শুধু উড়িষ্যা বলি কেন সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনা কি স্থান পাওয়ার অযোগ্য! ইতিহাস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার ক্ষেত্র নয়,. কিন্তু তবুও বলব প্রকৃত বীরত্ব দেখলে কি বুকটি আনন্দে গর্বে নেচে উঠে না! দেশের গৌরবময় ইতিহাস পাঁচজনকে কি ডেকে শোনবার মত নয়!

চতুর্দশ অধ্যায়

তাম্রলিপ্তের সাহিত্য ও সাহিত্যিক

প্রাচীন তাম্রলিপ্তে সাহিত্য চর্চা কতদূর হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। রামায়ণ মহাভারতে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পৌরাণিক যুগে সাহিত্যের চর্চা বোধহয় কিছু কিছু হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তৃত ও সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্তে যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল, তা' বৌদ্ধ ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-চোয়াং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় এখানে বড় বৌদ্ধ বিহার যেমন ছিল, তেমনি সেই সমস্ত বিহারে গ্রন্থাগারও ছিল। ফা-হিয়েন দু'বছর তাম্রলিপ্তে অবস্থান করে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্তি আদির অবয়ব নকল করেছিলেন। পণ্ডিত রাহুল মিত্রের কথাও ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। মহাস্থবির কালিক ষোড়শ স্থবিরের মধ্যে একজন ছিলেন। অনেকে তাঁকে তাম্রলিপ্তের অধিবাসী বলে মনে করেন।

এর পরের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না, অর্থাৎ আজ পর্যন্ত কোন কিছু আবিষ্কার হয়নি। তাই তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে অনেক ফাঁক থেকে যাবে। বৈষ্ণব পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুকে মহাপ্রভুর বাল-মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৪৫৫ শকাব্দে যখন চৈতন্যদেব মারা গেলেন এই সংবাদ শুনলেন, তখন অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাম্রলিপ্তে আসেন এবং এখানেই বিগ্রহ স্থাপন করে দিন যাপন করেন। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ সম্বন্ধে লিখেছেন—"গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী রচয়িতা গনের মধ্যে বাসুদেব শীর্ষস্থানীয়।" বস্তুত তাঁর গৌরাঙ্গ সম্পর্কিত পদগুলি

ব্যথিত-হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি কিন্তু তমলুকের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁর বাড়ী পূর্বে ছিল কুমারহট্টে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্টের বুড়ণ গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বাসুদের ঘোষের মাধব ও গোবিন্দানন্দ নামে আরো দু'জন সহোদর ভাই ছিলেন। এই তিন ভাই শেষে নবদ্বীপে এসে বাস করেন। বাসুদেব ঘোষের তিন ভাই-ই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। মাধব ও গোবিন্দানন্দ দু'জনেই প্রসিদ্ধ কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাসুদেব ঘোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই তাঁর রচিত পদাবলীগুলি অতি সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ এবং অতি সরল ভাষায় লিখিত। এই শোকাতুর ভক্ত কবির পদাবলী তৎকালে বৈষ্ণবাচার্যগণ অতি ভক্তি সহকারে বিভিন্ন মহোৎসবে কীর্তন করতেন। খেতুরীর বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্মেলনে, যেখানে রসকীর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল—সেই মহোৎসবের শেষদিন সন্ধ্যায় মার্দাঙ্গিক দেবীদাস, গোকুল ও গৌরাঙ্গ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াগণ নিম্নলিখিত বাসুদেব ঘোষের পদাবলীটি গেয়ে ছিলেন—

"সখি হে ওই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কুম্ব কণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দু দরশন॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥

কবি শিবরাম ঘোষ॥ শিবরাম ঘোষ তাম্রলিপ্তে বসে তাঁর কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে গবেষক অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় যে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা' এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করছি—

"সন ১৩৪৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কবি শিবরাম ঘোষের কলিকামঙ্গলের একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খণ্ডিত পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। পুঁথির ভণিতা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ মাতার নাম রাধিকা বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনুমান করেন (রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভনে)। ইহা ছাড়া ঐ পুঁথি হইতে কবির আর কোন পরিচয় বা তাঁহার কাব্য রচনার কাল জানা যায় না। ইহার পর আমরা শিবরাম ঘোষ নামাঙ্কিত এক কবির একখানি একাদশী পাঁচালির পুঁথি পাই। রাজা চন্দ্রকেতু ও রুক্মাঙ্গদ নৃপতির দুইটি কাহিনী লইয়া পাঁচালিটি রচিত। পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কালিকামঙ্গলের কবি শিবরাম ঘোষ এবং একাদশী পাঁচালি রচয়িতা শিবরাম ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি। একাদশী পাঁচালির বন্দনাংশ হইতে আমরা কবির মাতার নাম সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারি এবং তাঁহার কাব্য-রচনার স্থান ও কাল জানিতে পারি।

ব্যস বাল্মীকি আদি বন্দো যত কবি।
জনক জননী বন্দো লোটাইয়া ডুবি॥
বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী।
মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপানি॥

শশী শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর।
পাতসা অরং সাহা ডিল্লি ঈশ্বর॥

তমলিপ্ত মহাস্থান বন্দো দেবতা বাস্থলি।
তথাত্র রচিল এই ব্রতের পাঁচালি ॥
দৈবকী নন্দন পদ ভজি একমনে।
একাদশী ব্রতকথা শিবরাম ভণে ॥

অর্থাৎ ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি শিবরাম ঘোষ তাম্রলিপ্তে বসিয়া কাদশী পাঁচালি রচনা করেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার কালিকামঙ্গল রচনারও একটা আনুমানিক কাল সহজেই ধরিয়া লইতে পারি।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম খণ্ডে উক্ত উভয় পুঁথিই স্থানলাভ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৮৬২ ও ১০৪৫ দ্রষ্টব্য)। ডক্টর সেন প্রথমে কালিকা মঙ্গলের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া অনুমান করেন, পরে একাদশী পাঁচালির পুঁথি দেখিয়া শেষোক্ত পুঁথির সঠিক রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমোক্ত পুঁথির রচনাকাল আর সংশোধিত হয় নাই। উক্ত ইতিহাসে কালিকা মঙ্গল আলোচনায় কবির পিতামাতার নামোল্লেখ না থাকায় ইহার কবিকে একাদশী পাঁচালির কবি হইতে পৃথক মনে হইতে পারে।

ভবানন্দের হরিবংশ পুঁথির অন্যতম লিপিকর শিবরাম ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। (ভবানন্দের হরিবংশ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ভূমিকা পৃঃ ৵০ [১৩৩৯]।—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৪ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১১৯।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। বাংলা মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস যে সমগ্র পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করেননি সে সন্দেহ আজ পণ্ডিত সমাজে বদ্ধমূল হয়েছে। কাশীরাম দাসের নামে যে বৃহৎ মহাভারত মহাকাব্যখানি এতদিন চলে আসছে, তার মধ্যে ৬টি পর্ব আমাদের এই শিবরাম ঘোষের রচনা বলে অনুমিত হয়। উক্ত কবির কয়াল মহাশয় একখানি

মহাভারতের বনপর্ব সংগ্রহ করেছেন। সেই পর্বের শেষে লেখা আছে—

পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক।
পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ আরণ্যক ॥ ১৬০৫ ॥[১]
অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত।
বিরচিল তনয় শিখর সুত জিত ॥
ভারত পঙ্কজ পর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অরণ্যক।
আদি সভা বিরাট বন করিল লিখক ॥
এই চারি পর্ব পুস্তক কাশীদাসি।
উদাজোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোষি ॥[২]
ঐষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই।
তাহরে নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই ॥৫৮ বনপর্ব সমাপ্ত

পরিশেষে ফুটনোটে কয়াল মহাশয় যা মন্তব্য করেছেন, তা' হলো "১ লিপিকর কি করিয়া পুষ্প'কে (০) শূন্য বলিয়া ধরিলেন জানি না। ২, শিবরাম ঘোষের ছয় পর্ব মহাভারতের কোন হদিশ নাই। শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শিবরামের মহাভারত পুঁথির কয়েকটি পত্র আছে শুনিয়াছি।" —মা. প. প. ষষ্ঠ ৬৬, পৃঃ ৯৪।

আমার মনে হয় এই শিবরাম ও একাদশীর ব্রতকথা প্রণেতা শিবরাম একই লেখক, তবে অবশ্য আজ পর্যন্ত জানা যায় নি এই কবি শিবরাম ঘোষের আদি নিবাস কোথায় ছিল? তমলুকের অনতিদূরে কেলোমাল গ্রামে এক প্রাচীন ঘোষ জমিদার বংশ আছে। ইঁহারা প্রাচীন জমিদার বংশ, হয়ত এই বংশেই কবি শিবরাম ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা যায় না। সুস্পষ্টভাবে কিছু মন্তব্য করতে হলে আরো পুঁথি আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কবি কুঞ্জবিহারী দাস ॥ ফাসর্যার পালা কাব্যের রচয়িতা কবি কুঞ্জবিহারী দাস। এই পুঁথিটি পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে শ্রীযুত মদনমোহন অধিকারী সংগ্রহ করে আমায় দেন। ইতিপূর্বে আমি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এই কাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কবির বাড়ী পূর্বে কাশীজোড়া পরগণায় ছিল। পরে কবির পিতামহ তমলুক পরগণার অন্তর্গত মামুদপুরে বসবাস করেন। সেই থেকে কবিরা তিন পুরুষ ধরে বাস করেন। মামুদপুরের দক্ষিণদিকে পট্টনায়কের ইজারার মধ্যে বাস ছিল কবির। অল্প বয়সে পিতাকে হারান তিনি। কবিরা পাঁচ ভাই। কুঞ্জবিহারী, রাম, গৌরচন্দ্র, কৃপারাম ও ছোট ভাই জগন্নাথ। কবি প্রথম জীবনে মোহরিগিরি করতেন। জাতিতে তিনি ছিলেন মাহিষ্য। চাষ-বাস করেই জীবিকা নির্বাহ হ'ত। কবির একটি মাত্র পুত্র ছিল। নাম তার পরীক্ষিত। কবি কাব্য মধ্যে এমনিভাবে দিয়েছেন তাঁর আত্ম পরিচয়—

"তোমলোক মহাস্তান মহারাজা পুন্যবান
তার দেশে আমি করি ঘর।
এই বর দেহ আগে রাজাজিকে জুগে জুগে
কর পীর অক্ষয় অমর ॥
পূর্বে কাশীজোড়া ছাড়ি তোমলোকে ঘরবাড়ী
মামুদপুরেতে করিলা স্থিতি।
পিতামহো জেঠা বনে মঞ্জিলেন সেইখানে
আমা সভার সেইখানে স্থিতি ॥
কহিতে মনের দুঃখ বিদুরিয়া যায় বুক
মোর ভাগ্যে বাম হইল বিধি।
আমি অভাগিয়া বোড়ী শিশুকালে মোরে ছাড়ি
অলপ বয়সে মৈল পিতা ॥

এ বড় দারুণ তাপ ছেড়্যা গেল মোর তাত
দুঃখ সদা আমার কপালে।
ভাই আছি পঞ্চজন দয়া কৈল নারায়ণ
কৃপা করি রাখ পদতলে॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী, রাম গৌরচন্দ্র কৃপারাম
ছোট ভাই নাম জগন্নাথ।
তাহার মধ্যম ভাই পীরের হুকুম পাই
করিলেন কবিত্যা বিক্ষাত॥
কাশীজোড়া ছাড়ি তবে তোমলোকে আলাম সভে
হিজলবেড়্যা গ্রামের উত্তর।
মামুদপুরে ডেরা পটনাক্যের ইজারা
গ্রামের দক্ষিণ দিগে ঘর॥
প্রথমে মোহরীগিরি তারপরে কারি করি
তায় মোরা কৈনু আদিস্তানা।
মনের মানস ছিল এতদিনে পুন্ন হইল
তেঞি গীত করিনু রচনা॥
অজ্ঞানের কত পাপ কোন মুনি দিল সাপ
কিবা মোর অপরাধ ফলে।
পূর্বের লিখন না যায় মেটন
জনম হৈল চাষা কুলে॥

ফাসর্যার পালার বিষয়বস্তু হোল সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার করা। সদাকর পুত্র বিদ্যাধর পীরের আস্তানা মলয়া পাটন থেকে আনতে গিয়ে ফাঁসুড়ে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে কেমন করে ফাঁসুড়ে নন্দিনী আহুতীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে তাকে বিয়ে করে দেশে আনল সেই কাহিনী অতি সুন্দরভাবে এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের জনপ্রিয়তা এককালে সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কাহিনী অবলম্বন করে নাটকও কোন কোন

নাট্যকার লিখেছেন। পটিদারগণ পট তৈরী করে গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে চেয়ে আজো ফেরে। মনোহর ফাঁস্নুড়ের পট আমি নিজে একটি সংগ্রহ করে রেখেছি। পুঁথির হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। কাব্যটি খুব সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। পুঁথিটি খণ্ডিত। শেষের পাতাগুলি নেই। তাই লিপিকালও জানার কোন উপায় নেই। আমি মৎ প্রণীত "বঙ্গ সাহিত্যে অজানা কাহিনী" পুস্তকে এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ গল্পাকারে দিয়েছি। নিম্নে তমলুক অঞ্চলে সেকালে কেমন অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন হোত তার একটি বিবরণ কবির কথাতেই বলি। ফাঁস্নুড়ে নন্দিনী ইচ্ছাবতি বা আহুতি বিদ্যাধরকে এমনি ভাবে ব্যঞ্জন রেঁধে খাইয়েছিল—

"প্রথমেতে সুরু চাউলের রান্ধিলেক ভাত।
কটু তৈলে ভাজি কৈল পুঁই সাগের পাত॥
বড় বড় তুলিয়া খাটিয়া সাগের পাতা।
ঘৃত দিয়া কৈল ভাজি বার্তাকু পলতা॥
মনেতে হরষ হৈয়া সদাগর খাউ।
করপুর এলাচ দিয়া দুধে রান্ধে জাউ॥
মুগ ডাল রাঁধে রামা দিয়া ডালচিনি।
অপূর্ব রন্ধন করে ফাঁস্নুড়ে নন্দিনী॥
খাউগে সাধুর পুত্র মনে কর্যা নিসা।
দুগ্ধে চাউলে গুড় দিয়া রান্ধিল খিরিসা॥
নট্যা সাগের নাফিরি পাড়িয়া সাতাল।
মদগুর মচ্ছের রসা মরিচের ঝাল॥
মানে ওলে কাঁচকলা করে রামা ভাজি।
বড়ির সহিত রান্ধে পুঠি মাছের কাজি॥

সেকালের বেশ-বাস আচার-ব্যবহার ও বিবাহ কেমনভাবে হোত কবি এ সকলি বিস্তৃতভাবে তাঁর কাব্য মধ্যে দিয়েছেন। কাব্যের ভাষা অতি সরল ও কবিত্বপূর্ণ।

দ্বিজ জগন্নাথ॥ কবি জগন্নাথ 'আক্ষটির পালা' কাব্যের রচয়িতা। মামুদপুরে কবি কুঞ্জবিহারী দাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পট্টনায়কের ভাংগা সিন্ধুক থেকে পুঁথিটি পাই। মাত্র ১৬ পাতা পাওয়া গেছে। তাই সমগ্র আখ্যায়িকাটি জানা জায়নি। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত নারান্দা গ্রাম থেকে আর একটি দ্বিজ জগন্নাথের "আক্ষটির পালা" পাই। দুইটির কাহিনী এক রূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতেও সম্পূর্ণ গল্পটি পাইনি। অর্থাৎ কাব্যের আসল জায়গায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কাব্যে এমনি ভাবে কবি নিজ পরিচয় দিয়ে বলছেন—

তমলোক মহাস্তান মহারাজা নরনারায়ণ
মহারাজ কমললোচন।
গায়ে কবি জগন্নাথে রাজার মঙ্গল অর্থে
গোপীচরণ রচিল কাল্যাম॥

১ম পুঁথি, পৃঃ ৭ (ক)

তমলুকের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৩৮—১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নরনারায়ণের দু'রাণীর গর্ভে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ছোট রাণীর গর্ভজাত পুত্র কৃপানারায়ণ জ্যেষ্ঠ, বড় রাণীর গর্ভজাত পুত্র কমলনারায়ণ কনিষ্ঠ। এঁরা দু'জনে উভয়ে ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃপানারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে কমলনারায়ণ সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। কাব্যটি কিন্তু রাজা নরনারায়ণ যখন রাজ্যের অধিপতি, মনে হয় সেই সময় রচিত হয়েছিল। কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আসল নায়ক পাখীটিকেই কবি মেরে ফেলেছেন। প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ বড় একটা দেখা যায় না। কাব্যে কোন কবিত্ব নেই। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর। প্রাচীন তুলোট কাগজে লেখা।

কাব্যের বিষয়বস্তু হোল হরিভক্তি। অবন্তী রাজ সন্দানন্দের পোষা পাখীকে রাজপুত্র কামদেব ছেড়ে দেয় পিঁজরা থেকে।

পাখীর বিশেষ গুণহলো সে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল। এর জন্য কামদেবকে সদানন্দ প্রানদণ্ডাজ্ঞা দেন। শেষে পাখী তাকে উদ্ধার করে। কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব আছে।

কবি দয়ারাম দাস ॥ দয়ারাম "সারদামঙ্গলে"র একক কবি। এই বিষয়ক একখানি মাত্র কাব্য এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। সারদা বা সরস্বতী বৈদিক দেবতা, তিনি বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই কাব্যে দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। সুরেশ্বর রাজ্যে সুবাহু নামে এক রাজা অপুত্রক ছিলেন। বহু সাধ্য সাধনার পর যদিও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলো কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি তার কিছুই হোল না। রাজা নির্বাসন দিলেন পুত্রকে। তারপর দেবী সরস্বতীর কৃপায় কেমন করে রাজপুত্র লক্ষধর বিদ্বান হলো এই কাব্যে সেই কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারদামঙ্গলের কবি দয়ারাম দাসের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া পরগণার কিশোরচক গ্রামে। কবি 'সারদামঙ্গল' ছাড়া আরো একটি বই রচনা করেছিলেন, তার নাম 'লক্ষ্মীচরিত্র'। "সারদামঙ্গলে"র রচনা পাঁচালির লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রায় কাব্যগুণ বিবর্জিত। তাই সারদা পাঁচালি নামই এর যথার্থ পরিচয়।

কবির যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা' এই। রমেন্দ্রজিৎ ছিলেন তাঁর পিতামহ। আর পিতা ছিলেন জগন্নাথ দাস। কবি কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। সে হোল ১৭৫৬—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অর্থাৎ আজ থেকে ২০৮ বছর আগে। দয়ারাম দাসের 'সারদামঙ্গল' সেকাল ধনী-জমিদারদের বাড়ীতে পুত্রের বা কন্যার বিদ্যারম্ভের সময় গাওয়া হোত। কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজা উপলক্ষেও চামর মন্দিরা সহযোগে শীতলামঙ্গলের মত এরও গীত হোত। ইহা মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৫টি পালায় বিভক্ত।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ॥ শীতলামঙ্গল ও কালুরায় মঙ্গলের রচয়িতা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে কবি বর্তমান ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর যে শাখা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণের সাথে মিশেছে তারি দক্ষিণ তীরে খয়রা কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ রায়ের সভাকবি ছিলেন কবি নিত্যানন্দ। তিনি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলামঙ্গল রচে পান সুধামত ॥

কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায় ১৭৫৬—১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময় কবিকে রাজা কিছু জমিও দান করেছিলেন। সে সনন্দ আজিও কবির বংশধরগণের নিকট রক্ষিত আছে। কবির আরাধ্য দেবী শীতলা আজিও কানাইচক গ্রামে নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। গেকুল পালায় নিত্যানন্দ নিজের আত্মপরিচয় এমনিভাবে দিয়েছেন—

সৌতিসম সর্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানী মিশ্র
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব কি গুণে তুলনা দিব
যার সখা প্রভু দামোদর ॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ শ্রীরাধাচরণাম্বুজ
চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাত নিত্যানন্দ নামযুত
গাহে ভেবে শীতলা চরণ ॥

নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল অতি বৃহৎ কাব্য। মোট আটটি পালায় বিভক্ত। ১ম স্থাপনা বা স্বর্গপালা, ২য় পাতালপালা, ৩য়

লঙ্কাপালা, ৪র্থ কিষ্কিন্ধ্যাপালা, ৫ম অযোধ্যাপালা, ৬ষ্ঠ মথুরা ও মগধপালা, ৭ম গোকুলপালা ও ৮ম বিরাটপালা। এই সকল পালার সবগুলিতে দেবী শীতলার পূজা প্রচার-এর জন্য মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাব্যের ৬৪ রকম বসন্তের নাম বেশ বিবেচনার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকার বসন্তের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য আছে।

নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গলের কেবল ৭ম ও ৮ম পালা বটতলায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংস্করণে নিত্যানন্দকে উড়িষ্যার লোক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। তবে কাশীজোড়া পরগণা যে এককালে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই বলে নিত্যানন্দ যখন শীতলামঙ্গল রচনা করেন, তখন কোশীজোড়া রাজ্য স্বয়ংশাসিত ছিল। তাই নিত্যানন্দকে উড়িয়া বানানো যায় না।

শীতলামঙ্গলের ভাষা সহজ সরল। এতে একটু আধুনিকতার ছাপ দেখা যায়। নিত্যানন্দ তাঁর কাব্যে সুমার্জিত ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন।

নিত্যানন্দের অপর কাব্য কালুরায় মঙ্গল। প্রসিদ্ধ গবেষক, পণ্ডিত অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় এই কাব্যটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৬৩ বর্ষ-এর ১ম ও ২য় সংখ্যায়) আলোচনা করেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন কিছুদিন তমলুক রাজবাড়ীতে বাস করেছিলেন—একথা মধুসূদনের জীবন চরিত থেকে জানা যায়।

তাম্রলিপ্ত প্রদেশের আর কোন প্রাচীন কবির নাম বা তাঁদের কবি কীর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। নিম্নে আমরা আধুনিক কবিগণের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করছি, 'তমোলুক ইতিহাস' পাঠে জানা যায় তৎকালে—"এখান হইতে বাঙ্গলা

১২৭৮ সালে বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজবালা নাটক, ১২৮০ সালে তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১২৯৪ সালে কালিকামঙ্গল ও নব্যবিলাস, এবং অনাথ বালক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮০ সালে 'তমোলুক পত্রিকা' নাম্নী একখানি মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ হইত; গ্রাহকগণের অসদ্ব্যবহারে তাহা ১৯ চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' পৃঃ ১২৪—১২৫।

তমলুক সহরে থেকে যাঁরা আজো সাহিত্য চর্চা করছেন, তাদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ জানার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রবি-তর্পণ, সাগরিকা, ১৫ই আগস্ট, বহ্নিপাষাণ ও কবি দীপিকা তার উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রবীন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী এই সহরের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর বহু স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং তা' সুনামের সংগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হয়ে আসছে। তিনি চয়নিকা নামে একটি শিশু মাসিক কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন। কয়েক বছর চলার পর বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেবাব্রতী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশ হোত কিছুদিন আগে তমলুক থেকে। অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন। এছাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুচরিতা দাস, অধ্যাপক বিষ্ণুহরি দত্ত, কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, অধ্যাপক বিবেকানন্দ দাশ, মালীবুড়ো ও অধ্যাপক প্রণব কুমার বাহুবলীন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। বিমল কুমার বসু "ছোটদের নেতাজী" নামক একটি কবিতা পুস্তক লিখেছেন। এছাড়া আরো বহু স্কুল শিক্ষক মহাশয়গণ বিভিন্ন পাঠ্য ও ধর্মপুস্তক লিখেছেন। সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নিম্নে তমলুক মহকুমার বিভিন্ন থানার লেখকগণের গ্রন্থসমূহ একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করলাম। অনঙ্গমোহন দাস—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ (থানা ময়না) আলোক চক্রবর্তী—আমাদের

বিদ্যাসাগর, ঘেটুর কথা প্রভৃতি বহু পুস্তক (থানা—তমলুক, বর্ত্তমানে কলকাতার বাসিন্দা) আশুতোষ জানা—আচার্য ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র জাতির ইতিহাস, ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র—শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ প্রদ্যোৎ, ভীমরুল প্রভৃতি (থানা—নন্দীগ্রাম, বর্ত্তমান মেদিনীপুরের বাসিন্দা) কুমার চন্দ্র জানা—গীতাবোধ (ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সহযোগে) থানা—সূতাহাটা অধ্যক্ষ জগদীশ চন্দ্র দাশ —মঞ্জরী (থানা—ময়না) ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত—তমোলুক ইতিহাস। প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক—কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা, চণ্ডীমঙ্গলের গল্প প্রভৃতি বহু পুস্তক। কলিকাতার ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী (থানা—তমলুক) যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)—বঙ্গসাহিত্যে অজানা কাহিনী, গল্প-মালঞ্চ, কাটা কাটা চাঁদ প্রভৃতি ১৪।১৫ খানি পুস্তক (থানা-মহিষাদল) রঘুনাথ মাইতি—গান্ধী কথা, শ্রীপতি বোয়াল—নবাব মীরকাশিম (থানা—মহিষাদল), সতীশচন্দ্র সামন্ত—মুক্তির গান (সংকলন) (মহিষাদল), সেবানন্দ ভারতী—তমোলুকের ইতিহাস, হরিসাধন গোস্বামী—শিক্ষা ও সমাজ প্রভৃতি কতকগুলি বই। ঋষি দাস—শেকস্‌পীয়ার, বার্ণাড্‌শ, পৃথিবীর ইতিহাস, সোভিয়েৎ দেশের ইতিহাস প্রভৃতি বহু পুস্তক, অনুবাদক হিসাবে এঁর নাম বিশেষ বিখ্যাত (থানা—মহিষাদল) অধ্যাপক নিরঞ্জন মিশ্র—কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। কল্যাণী প্রামাণিক—শিশুতরু, দুনিয়া দেখছি প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক (থানা—তমলুক) দীপ্তি ত্রিপাঠি—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (থানা—সূতাহাটা, বর্ত্তমানে কলিকাতার বাসিন্দা। ডাঃ প্রবোধ ভৌমিক—মেদিনীপুর কাহিনী, উপজাতির কথা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি ৭।৮ খানি পুস্তক। (থানা—নন্দীগ্রাম) বাসুদেব মাইতি—স্বয়ংবরা, রবীন্দ্র রচনা কোষ, মহানগরীর নারী প্রভৃতি পুস্তক (থানা পাঁশকুড়া) হরিপদ ঘোষাল—বিশ্ব সভ্যতার ধারা (থানা—ঐ) বিজন বিহারী ভট্টাচার্য—প্রভাতরবি, বাগার্থ, সমীক্ষা, কঙ্কাবতী,

চূড়ামণি প্রভৃতি বহু পুস্তক, ডাঃ মনোরঞ্জন জানা—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দর্শন, বাঙলার কবি-মনীষা, রবীন্দ্রনাথ—কবি ও কাব্য। (থানা—তমলুক), গোষ্ঠ বিহারী কুইলা—দেবধূপ (থানা—পাঁশকুড়া), অজয় মাইতি—মেঘের শিবিরে (থানা—ভগবানপুর) অমূল্য মাইতি—একটি কাব্য সংকলন) গোরাচাঁদ গিরি—মেদিনী-মঙ্গল, গানে মেদিনীমঙ্গল ও সমবায় প্রভৃতি পুস্তক।

হিন্দী সাহিত্যিক সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)—অনামিকা, পরিমল, অর্জুন, গীতিকা প্রভৃতি পুস্তক। মহিষাদলে বাস করেছিলেন। কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সূতাহাটা লোক ভারতীতে কর্ম)—নদীয়া মহাজীবন, জলধর সেন (মহিষাদল রাজস্কুলে শিক্ষকতা ১৮৯২)—হিমালয়, আত্মজীবনী, অভাগী, সম্পাদক-প্রবাসী, দীনেন্দ্র কুমার রায় (মহিষাদল রাজস্কুলের ছাত্র ১৮৮৮ পরে ঐ স্কুলে শিক্ষকতা)—টাকার কুমীর, রূপসীর শেষ শত্রু, অরবিন্দ প্রসঙ্গ, পল্লীচিত্র প্রভৃতি। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (অধ্যাপনা তাম্রলিপ্ত কলেজ ১৯৫০-৫৬) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সূতাহাটায় গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন)—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, West to day, সমর সোম (লোকভারতীর পরিচালনা)—যাদুকরী, সাধনা সোম—(লোকভারতীর পরিচালনা)—দেশান্তরের নারী, আজকে পশ্চিম (অনুবাদ)। সুধীর কুমার মল্লিক ও বেনু গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা সকলে অন্যদেশের অধিবাসী কিন্তু বিভিন্ন কর্মসূত্রে এই মহকুমায় বাস করেছিলেন ও করছেন।

তমলুক মহকুমা থেকে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হোত ও বর্তমানে হচ্ছে, সেগুলো হোল—গ্রামসেবা (সাপ্তাহিক, ১৯৪৭) —সচ্চিদানন্দ বেরা (অধুনা লুপ্ত) ডাক (মাসিক, ১৯৫৪)—ত্রিবঙ্কর রায় (লুপ্ত) তমালিকা (সাপ্তাহিক ; ১৯০৩—১৯০৮)—শ্রীধর অধিকারী, তমলুক বুলেটিন—(১৯৩২), তাম্রলিপ্ত উপাসনা পত্রিকা (ত্রৈমাসিক ; ১৩৬৫)—স্বপনবান্ধব, নবোদয় (বার্ষিক

১৩৬২)—যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো), পল্লীজীবন (সাপ্তাহিক, ১৯৪৮)—নলিনীরঞ্জন হোতা, পাঞ্চজন্য (মাসিক, ১৩৫৯)—পরেশনাথ চক্রবর্তী, প্রদীপ (সাপ্তাহিক, ১৯৪৪)—শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, প্রলাপ (সাপ্তাহিক, ১৩৬০)—হরেকৃষ্ণ পট্টনায়েক, মহিষাদল সমাচার (বুলেটিন, ১৯৩২), শীষ (ত্রৈমাসিক, ১৩৬১)—পুলক বেরা (পরে পীযুষ মহাপাত্র ও সত্যেন ষড়ঙ্গী), শোভনা (মাসিক, ১৩২৯)—পরেশনাথ চক্রবর্তী ও প্রজাপতি জানা (পরে শরৎচন্দ্র দাস ও পরেশনাথ চক্রবর্তী। অহল্যা (ত্রৈমাসিক, ১৯৬৩)—শ্রীহরি মাইতি, প্রবাল—(পাক্ষিক)—বলাই কুইলা, কিংবা —(মাসিক ১৩৭১)—চিররঞ্জন মাইতি। আশীষ বেরা, মৌসুমী (হাতলেখা মাসিক)—মেদিনীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার তমলুক।

এই অধ্যায় বিভিন্ন দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ থাকবে আমি গোড়াতেই বলেছি। যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে প্রকাশ করলাম। এই সংগ্রহের মধ্যে অনেকের নাম বাদ পড়েছে নিশ্চয়ই, তাই বলে স্বেচ্ছাকৃত বলে কেউ যেন না মনে করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তাম্রলিপ্তের অধিবাসী ও সামাজিক চিত্র

সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যে কারা বাস করত, তা' সঠিকভাবে নির্ণয় করা বড় কষ্টসাধ্য। রামায়ণ মহাভারতের যুগে এই রাজ্যে যারা বাস করতেন, তারা জাতিতে কি ছিলেন সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে তখন ক্ষত্রিয় ও নৌযুদ্ধবেত্তা জাতি যে অধিক পরিমাণে বসবাস করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁর The tamils eighteen hundred years ago নামক পুস্তকে লিখেছেন, মাদ্রাজের তামিল জাতি প্রাচীন "তাম্রলিপ্ত" জাতি হইতেই উদ্ভূত"—তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ থেকে এই তামিল শব্দ তথা জাতির উৎপত্তি হয়েছে। পিলে মহাশয়ের উক্তি থেকে মনে হয় তৎকালে "তাম্রলিপ্ত" বলে একটি পৃথক জাতি বাস করত এই রাজ্যে।

গৌড়রাজবালা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—"ডিওডোরস মেঘাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গানদী "গঙ্গারিডই" দেশের পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। 'গঙ্গারিডইগণে'র অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে।' এই গঙ্গারিডগণকে অনেকে অনুমান করেন তাম্রলিপ্ত প্রদেশের অধিবাসী বলে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি লিখে গিয়েছেন—"গঙ্গার মোহানা সমূহের সমীপ প্রদেশে "গঙ্গারিডিগণ" বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা "গঙ্গা" নগরে বাস করেন।' এই থেকে মনে হয় তৎকালে নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তিতে গঙ্গারিডিগণ বাস করতেন। কারণ, তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের সমীপবর্তী। অবশ্য গঙ্গানগর যে কোথায় ছিল তা' আজও নিশ্চিন্ত ভাবে স্থিরকৃত হয়নি। পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

মহাশয় অনুমান করেন ২৪ পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা গ্রামেই প্রাচীন গঙ্গানগরের রাজধানী "গঙ্গে" অবস্থিত ছিল। যাইহোক, এই গঙ্গাড়াহিগণের শৌর্য বীর্য যে তৎকালে সারা ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল, তা আলেকজাণ্ডারের দ্বিগ্বিজয় কাহিনী থেকে অবগত হওয়া যায়। মহাকবি ভার্জিল এই জাতির গুণকীর্তন করেছেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে গ্রীকরাজদূত মেঘাস্থিনিসের (খ্রীষ্ট ৩০২ বৎসর পূর্বে) অবস্থিতি কালীন তিনি 'গঙ্গার মোহানার নিকট তলুক্তি (Taluctae) নামে এক জাতির উল্লেখ করছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডেল সাহেবের মতে তা' পুরাতন বন্দর তাম্রলিপ্তবাসীর নির্দেশক।[১]

এই গেল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত অধিবাসীদের কথা। এছাড়া তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রোপকূলবর্তী হওয়ায় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় বহু বণিকও তথায় বাস করত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রমণ ব্যতীত অন্য বহু জাতিও তখন বাস করত তাম্রলিপ্ত বন্দরে।

বর্তমান তমলুকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করেন। কিন্তু প্রাচীনকালে অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালের পূর্বে এদেশে মুসলমান ছিলনা বললেই চলে। খোজা দিদার আলীবেগ যখন তমলুকে রাজত্ব করেন, তখন তিনি নিম্ন জাতীয় হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাঁশকুড়া, প্রতাপপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা বোধহয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কাশী-জোড়ার রাজা নিজে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১ Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian by I. W. Mc crindle, PP. 132—138.

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর অনেক হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাই তমলুকে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও নিতান্ত নগণ্য নয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ক্ষত্রিয় মাহিষ্য। এছাড়া গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-এর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ধীবর নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লোকও যথেষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেইসব জাতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো না। প্রধান প্রধান ২।৪টি জাতির কথাই উল্লেখ করে এই অধ্যায় অতি সংক্ষিপ্তাকারে শেষ করব। আজকাল ভিতরে ভিতরে জাত্যাভিমান থাকলেও বাহ্যিক জগতে এর কদর অনেক কমে গিয়েছে। যারা জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে চান, তাঁরা এইসব সম্পর্কিত বই পৃথক ভাবে পড়লে উপকৃত হবেন।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ॥ ইঁহারাই তাম্রলিপ্তের আদি বেদবিদ ব্রাহ্মণ। এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ মহর্ষি বোঢ়ু। ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ বেদমন্ত্র প্রণেতা। মহর্ষি বোঢ়ু ঋগ্বেদের একটি ঋক (১০।৯৬) প্রণয়ন করেছিলেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।২৫) সেই ঋক্‌টি সন্নিবিষ্ট আছে। এইজন্য তাঁদের নামে তর্পণের ব্যবস্থা হয়েছিল—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরি শৈচব বোঢ়ু-পঞ্চশিখ স্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দতেনাম্বুনা সদা॥"

—আহ্নিকাচারত্বম্

অর্থাৎ "সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, অসুরি, পঞ্চশিখ ও বোঢ়ু তাঁরা সকলেই আমার দ্বারা জলে তৃপ্তিলাভ করুন, এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দুই অঞ্জলি জল তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়। মহর্ষি বোঢ়ু অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছিলেন। এগুলি "বেদতত্ত্ব-ব্যাখ্যা" নামে পরিচিত। মহর্ষি বোঢ়ুর অষ্টাদশ পুরাণের কয়েক-খানি দ্বাপর যুগের আদিকালে রচিত হয়েছিল।" "অষ্টাদশ পুরান

রচনা সমাপ্ত হইলে দ্বাপরযুগে মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সহিত মহর্ষি বোঢ়ুর পুরাণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ষটশতোত্তর পঞ্চ সহস্র শ্লোকান্বিত বৃহদ্ব্যাস সংহিতায় তৃতীয় খণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে পুরাণ ও উপপুরাণের উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করলে মহর্ষি বোঢ়ু ও তদ্বংশজ ব্যাসোপাধিক বোঢ়ু ব্রাহ্মণগণের আদি ইতিহাস পাওয়া যাইবে।" বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস পৃঃ ২-৩।

এই বোঢ়ু ঋষির বংশধরগণ প্রথম যাজকতা গ্রহণ করেন মহাভারতীয় যুগে যুযুৎসু, বিদুর ও যদুবংশের। এই ঋষির বংশধরগণ "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই বোঢ়ু বংশধর ব্যাস-ব্রাহ্মণগণ কোশল দেশ (অযোধ্যা) ত্যাগ করতঃ যাজ্য সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় মাহিষ্য জাতি সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গদেশ এবং তাঁহাদের অপর এক শাখা মেদিনীপুর জেলা ও উড়িষ্যা প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, (বৃহদ্ব্যাস সংহিতা, ৩য় খণ্ড, ২০শ অধ্যায়, মাদ্রাজে প্রাপ্ত গদাধর ভট্টের কুলঞ্জী ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট)।

পঞ্চ গৌড়দেশে এঁদের আদি বাস ছিল। এক সময় এই জাতীয় ব্রাহ্মণগণকে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ না জেনে শুনে বড্ড নিন্দে করতেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের জন্ম ইতিহাস যেমন গৌরবপূর্ণ তেমনি এঁরাই আদিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের বহু পূর্বের একমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজ। সেবানন্দ ভারতী বলেন, "সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় যাজন করেন, ইঁহাদের বংশধরগণ তেমনই এক্ষণে কেবলমাত্র মাহিষ্য যাজন করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরই এক এক শাখা পূর্ববঙ্গে 'পরাশর' দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ 'দ্রাবিড়' ও 'ব্যাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" পৃঃ ১১৫

এই ব্রাহ্মণ জাতির বিস্তৃত বিবরণ জানতে হলে "ভ্রান্তিবিজয়", বঙ্গীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ পরিচয় প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

মধ্যশ্রেণী ॥ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, এঁরা বরাবরই স্বাধীনচেতা ও বিদ্যানুরাগী। "এতদ্দেশে যে মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ দৃষ্ট হন, তাঁহারা সামবেদ-সম্মত কার্য প্রণালীতেই সমুদয় ধর্মকার্য নির্বাহ করেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বল্লাল সেন যৎকালে তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্যাদা বন্ধন করিয়া দেন, সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণের কতিপয় মহাত্মা গৌড়ীয় আদি-বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের এবং প্রাচীন আর্য্য-প্রণালী বিসর্জ্জন দেওয়া অধর্মের কার্য ও অযৌক্তিক মনে করিয়া ছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করতঃ হেয় প্রতিপাদন করিলে, তাঁহারা বল্লালী ব্রাহ্মণ-বিহীন জনপদে গিয়া বাস করেন এবং দেশের নামানুসারে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। —কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন, রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি কোন কারণ বশতঃ মেদিনীপুর জেলায় গিয়া বাস করেন। কালসহকারে তাঁহারা উৎকল ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যশ্রেণী নামে অভিহিত হইয়াছেন—(মেদিনীপুর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)। যাহা হউক, বঙ্গ ও উৎকল দেশের মধ্যস্থলে মেদিনীপুর জেলায় বাস করা হেতু মধ্যশ্রেণী আখ্যা পাইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

মাহিষ্য ॥ বাঙ্গালী জাতি পরিচয়-এর লেখক মাহিষ্য জাতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন—"মাহিষ্য জাতি বাঙ্গালার অতি পুরাতন জাতি। প্রাচীনকালে এই জাতির বাহুবলে বাঙ্গালার সামরিক গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে কৃষি-বাণিজ্য এই জাতির প্রধান অবলম্বন, ক্ষত্রিয় বীর্যে ও বৈশ্য মাতার গর্ভে এই জাতির উদ্ভব। রাজ্যপালন, দেশরক্ষা, যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য ও পশু-পালন এই জাতির বৃত্তি। বাঙ্গালার নানাস্থানে নানাবিধ নামে এই জাতি পরিচিত। পশ্চিম বাঙ্গালায় কৃষাণ, চাষী, চাষীদল,

মাহিষ্য, চাষী কৈবর্ত, উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী কৈবর্ত, পূর্ব-বাঙ্গালায় পরাশর দাস, হানিফ দাস, দাস, মাহিষ্য দাস নামে পরিচিত। মূলতঃ বাঙ্গালায় ইহারা সকলেই মাহিষ্য জাতি। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, নর্মদা নদীর তীরভূমিতে এই জাতির প্রাথমিক আবাসভূমি ছিল। এই স্থান সম্ভবতঃ কিম্বর্ত দেশ, সরযূতট হইতে মাহিষ্য কৈবর্তগণ মধ্যভারতে আগমন করেন। মাহিষ্য জাতির একতম কেন্দ্রভূমি ছিল মাহিষ্মতী, নর্মদা ও সরযূতট হইতে মধ্য ভারতের অধিত্যকার মধ্য দিয়া ইঁহারা কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। পরবর্তীকালে ইঁহারা বাঙ্গালা দেশের সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়েন।

মাহিষ্যের অপর নাম-দাস। যাদবগণের বা যদুবংশের আদি-পুরুষ ছিলেন যদু বা তুর্বসু। এই যদু ও তুর্বসু জাতিতে "দাস" ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা দেবমীঢ়ের সুর ও পর্জন্য নামে দুই পুত্র হয়। সুরের পুত্র বসুদেব; ইনি কংসের ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করেন। সুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্জন্য। পর্জন্যের পুত্র নন্দ। নন্দ বসুদেবাদি যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় শাখায় এবং নন্দ যদুবংশীয় 'দাস' শাখায় উৎপন্ন। পর্জন্যের মাতা 'বৈশ্যা'। দেবমীঢ়ের বৈশ্যা ভার্যার সন্তান বলিয়া পর্জন্য মাহিষ্য। সুতরাং পর্জন্যের পুত্র নন্দও মাহিষ্য। এই বংশ 'দাস' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মাহিষ্যগণের মধ্যে 'দাস', 'হানিফ দাস', 'পরাশর দাস' প্রভৃতি নামও প্রচলিত দেখা যায়।" দৈনিক বসুমতি, মফঃস্বল, ২রা আষাঢ়, ১৩৬০।

প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুর জেলায় মাহিষ্যের সংখ্যাই অধিক। প্রায় দশ লক্ষ মাহিষ্য এই জেলায় বাস করে। বর্তমানে এই জাতি, শিক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও রাজনীতিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

এছাড়া তমলুকে কায়স্থ, বৈদ্য, নমঃশূদ্র, তেলি, রাজবংশী প্রভৃতি আরো বহু জাতি বাস করেন।